□ প্রথম প্রকাশ : বাংলা নববর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৭/এপ্রিল ১৯৬০

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ন কলাম ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
□ মুদ্রাকর : অসীম কুমার সাহা / দি প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী (ব্লক কে-১),
কলিকাতা-৭০০০০৬

পাঞ্জাবের অমর কবি
ওয়ারিশ শা'র
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম অমৃতা প্রীতম। সাহিত্যিক হিসেবে ঋজু বৈপ্লবিক চেতনা ও দৃঢ়তায় সমাজকে তিনি যতটা না শৃঙ্খল-মুক্ত করতে পেরেছেন, কিংবা সমৃদ্ধশালী করে তুলতে পেরেছেন ভারতীয় সাহিত্যকে, তার চাইতে সত্তার একক বিদ্রোহে নিজেই বিধ্বস্ত হয়েছেন অনেক বেশি। তবে কোনো কৃত্রিমতা বা আড়াল দিয়ে তিনি নিজেকে কখনও ঢেকে রাখেন নি, রাখার চেষ্টাও করেন নি এবং তার এই অকপট স্বীকারুক্তিই অমৃতা প্রীতমের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট, সম্ভবত এরই জন্যে বিতর্কিত হয়েও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি আজ অসম্ভব জনপ্রিয়।

অবিভক্ত পাঞ্জাবের মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে অমৃতা প্রীতমের জন্ম ১৯১৯ সালে। বাবা ছিলেন সাহিত্যিক। কৈশোরে, মার আকস্মিক মৃত্যুর পর, নিঃসঙ্গতার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই অমৃতা প্রীতম প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'থানডিয়ান কিরনান' বা 'হিমেল রশ্মি' যখন প্রকাশিত হয়, কবির বয়স তখন মাত্র সতেরো। এর পর থেকে তিনি অজস্র কবিতা লিখেছেন। সঠিক সমাজচেতনার ভাস্বর কোনো পৃথিবীর স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলতে না পারলেও, ছন্দ, ভাষা, চিত্রকল্প আর আঙ্গিকের অনন্যতায় কবিতার শরীরে তিনি আনতে পেরেছিলেন মাধুর্যের স্বাদ। আত্মঅহমিকা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতাকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়ে যতই বলুন না কেন: "পৃথিবীর কথা আমি কখনও ভাবিনি এবং এখনও ভাবি না। আমি লিখি কেবলমাত্র আমার অন্তর্নিহিত সত্তার শান্তির জন্যে..." কথাটা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়, তা যদি হতো তাহলে ধর্মান্ধতা, অবক্ষয়ী মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের কদর্য দিকগুলোর ওপর তিনি কখনও এমন নির্মমভাবে চাবুক হানতে পারতেন না। পালিন লুমুম্বা তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের, বিশেষ করে স্বাধীনতার ঠিক পরেই—ছিন্নমূল, বঞ্চিত, রিক্ত মানুষের আশা-আকাঙ্খা, বেদনা কোনোদিনই রূপ পেতো না তাঁর অজস্র কবিতায়।

সাহিত্যের সব শাখায় অবাধ বিচরণ সত্ত্বেও, কবিতাই অমৃতা প্রীতমকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে সব চাইতে বেশি। আজ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। 'শুনেহুরে' বা 'সংবেদন' কাব্যগ্রন্থের জন্যে তিনি ১৯৫৬ সালে আকাদামি পুরস্কার পান। ১৯৫৭ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান 'কাগজতে ক্যানভাস' বা 'কাগজ ও ক্যানভাস' কাব্যগ্রন্থের জন্যে! এছাড়াও তিনি যেসব আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, তা প্রায় সবই কবিতার জন্যে।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয় অমৃতা প্রীতমের প্রথম উপন্যাস 'ডাক্তার দেব'। সামাজিক প্রথায় দেহমিলনের চাইতে সত্তার মিলকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে 'ডাক্তার দেব' সেই সময়ে বিতর্কের ঝড় তোলে। প্রকৃত প্রেম বা ভালোবাসার সংজ্ঞা নিরূপন করতে গিয়ে প্রায় অনুরূপ ভাবনাকেই অমৃতা প্রীতম অনুসরণ করেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। তাই এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কঙ্কাল', 'নীড়' 'ইভের দুটি মুখ', 'একটি প্রশ্ন' সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী পর্যায়ের উপন্যাস 'বন্ধ দরজা', 'একদিন অনীতা নামে কেউ ছিলো' 'ছত্রিশ নম্বর গ্রাম', 'তুরুপের তাস' 'পৃথিবী সমুদ্র ঝিনুক' ব্যাপ্তি ও আঙ্গিকের দিক থেকে অনেক বেশি পরিণত। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো—তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনা 'দি রেভিনিউ স্ট্যাম্প' নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, উপন্যাসের চাইতে অমৃত প্রীতমের ছোট গল্প অনেক বেশি শক্তিশালী, বিশেষ করে তাঁর রূপকাশ্রয়ী গল্পগুলো সত্যিই তুলনাবিহীন। 'ছাব্বিশ বছর পরে', 'আখিরী খৎ', 'গোজার দিয়াঁ পরিয়াঁ', 'চানন দা হোকা', 'জঙ্গলী বুটী', 'একটি শহরের মৃত্যু' তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন।

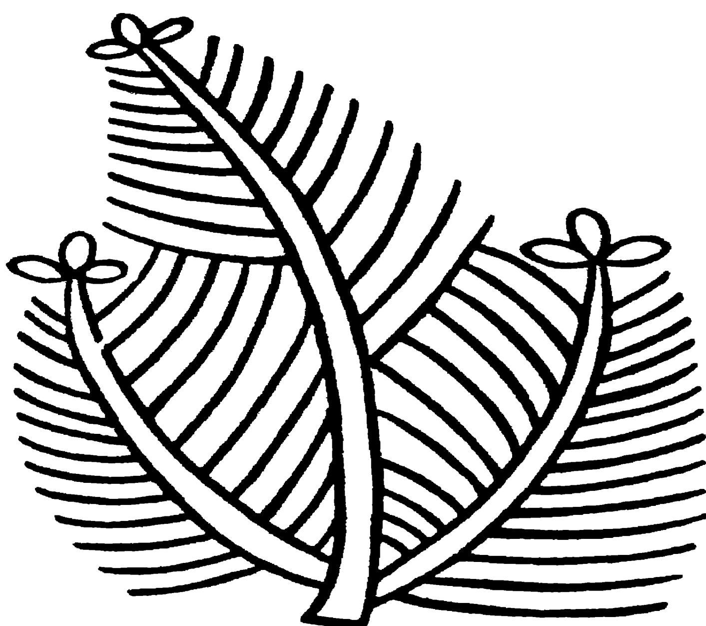
গল্প কবিতা উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ সমালোচনা নিয়ে অমৃতা প্রীতমের গ্রন্থের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। এর থেকেই নির্বাচন করে ইচ্ছে আছে কয়েকটি খণ্ডে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্ভারকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরার। অমৃতা প্রীতম নিজেও এই পরিকল্পনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। একটা উপন্যাস, পনেরোটা গল্প এবং কিছু কবিতা নিয়ে নমুনা হিসেবে প্রথম খণ্ডটি পাঠকের কাছে উপস্থিত করলাম, জানি না কতটা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারবে। তবে শুধু এইটুকু বলতে পারি—আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন একজনকে নির্বাচন করতে পেরেছি, যিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন: "খ্যাতি ও সম্পদের ধুলোয় আমি আবৃতা হতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয়ের রক্তের রঙ চিরকালই রক্তিম রয়ে যাবে।"

অসিত সরকার

উপন্যাস

গল্পগুচ্ছ

কবিতাগুচ্ছ



উপন্যাস

অনুবাদ / অসিত সরকার

ডাক্তার দেব

আকাশ-নীল, স্বচ্ছ এক শীতের দিন। বাতাসে হিমের স্পর্শ। বেলাশেষের ম্লান সূর্যটা তখন প্রায় ঢলে পড়েছে দিগন্তের গায়ে। তারই ক্ষীণ আলোর রেখা কেঁপে ওঠা পরদার নিচে দিয়ে ক্লান্ত ভাবে চ্‌ঁইয়ে চ্‌ঁইয়ে এসে পড়েছে মেঝের আরক্তিম গালচেতে। অদ্ভুত একটা লালচে আভায় ভরে উঠেছে সারা ঘর।

জানলার সামনে মমতা দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে সাদা শাড়ী, সুন্দর মুখখানা বেদনায় ম্লান। স্বপ্ন-জাগর বিষণ্ণ একটা ভাবনার গভীরে তলিয়ে গিয়ে ও বাইরের বিশীর্ণ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

জগদ্দীশ কখন ভেতরে প্রবেশ করেছে মমতা জানতে পারেনি। পাথরের প্রতিমূর্তির মতো ও তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'মমতা!' উদ্বিগ্ন-ব্যাকুল স্বরে জগদ্দীশ ডাকলো।

'উঁ!' মমতা ভীষণ ভাবে চমকে ঘুরে দাঁড়ালো, স্বপ্নে হাঁটা মানুষের মতো এগিয়ে গেলো স্বামীর দিকে। কিন্তু একটাও কথা না বলে বা তার দিকে না তাকিয়ে জগদ্দীশের সামনের একটা কুর্সিতে ধপ্ করে বসে পড়লো। ওর চোখদুটো মনে হচ্ছে অচেনা আর যেন অনেক দূরের।

'কি হয়েছে, মমতা?'

'কই, কিছু হয়নি তো!'

'তোমার চোখদুটোকে কেমন যেন মনে হচ্ছে?' কিছুটা অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতেই জগদ্দীশ প্রশ্ন করলো।

'কেন, আমার এই চোখদুটোকে কি তুমি প্রথম দেখছো?' বিদ্রূপে বেঁধা, নিরুত্তাপ মমতার কণ্ঠস্বর।

'না, আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু আজ কেমন যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে…' জগদ্দীশ মনে মনে ব্যথা পেলো।

'সেটা কি ভালো না খারাপ?'

'কেমন যেন অদ্ভুত!'

'তার মানে তুমি ভয় পেয়েছো, জগদ্দীশ।'

'না, আমাকে তুমি বলো মমতা, কি হয়েছে?'

'একটা ছায়া।'

'কার ছায়া?'

'আমার নিজেরই জীবনের ছায়া।'

'মমতা, তুমি তো জানো, আমি হেঁয়ালি পছন্দ করি না। আমি অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ, কেন তুমি আমার সঙ্গে সহজ সরল ভাবে কথা কইতে পারো না?'

'কিন্তু জীবন যে অত সহজ সরল নয়, জগ্‌দীশ। জীবনই এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় অমীমাংসীত ধাঁধা। এর জন্যে কি আমরা ভাগ্যের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারি, বলো?'

হঠাৎ অদ্ভুত একটা আবেগে মমতার মুখখানা ম্লান হয়ে উঠলো।

অপ্রীতিকর বিতর্ক এড়াবার জন্যেই জগ্‌দীশ বললো:

'আচ্ছা মমতা, বলতে পারো তোমার হাত কি ভাবে আমার ভাগ্যরেখাটাকে আঁকবে— সোজা, না বাঁকা?'

'না জগ্‌দীশ, আমার এই হাতদুটো তোমার সৌভাগ্যকে যেমন গড়তে পারে না, তেমনি আবার ভাঙতেও পারে না।'

'মমতা, তুমি বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছো যে মানুষ যেভাবে চায় সেভাবে তার জীবনকে সাজাতে পারে, ইচ্ছে করলে সমাজের ভুল-ত্রুটি আর অন্যায়গুলোকে সে পালটাতে পারে। কিন্তু আজ তুমি কোনো কিছু প্রশ্ন না করে, সবকিছু ঈশ্বরের ইচ্ছে বলে অন্ধের মতো মেনে নিতে চাইছো। তোমার এই পরস্পর বিরোধী আর বিভ্রান্তিকর যুক্তি আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'জগ্‌দীশ, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো আমার মতিভ্রম ঘটেছে, আমি পাগল হয়ে গেছি। তোমার অবাক লাগছে, যেহেতু তুমি জানো না আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে। কিন্তু আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, জগ্‌দীশ। তোমাকে আমি সব সত্যিটাই বলতে চাই।'

'সত্যি! এ তুমি কি বলছো, মমতা?'

'হ্যাঁ জগ্‌দীশ, আমি যখন তোমাকে বিয়ে করেছিলাম, তখন আমি কুমারী ছিলাম না। আমি যে শুধু স্ত্রীই ছিলাম তাই নয়, অন্য একজনের সন্তানের মাও ছিলাম।'

বিস্ময়ে একেবার স্তম্ভিত হয়ে গেলো জগ্‌দীশ। আঘাতে, বেদনায়. মুহূর্তের জন্যে সে কোনো কথা কইতে পারলো না। তারপর এক সময়ে আধো-ভাষে সে কোনো রকমে জিগেস করলো:

'তোমার স্বামী কি এখনও বেঁচে আছে?'

'হ্যাঁ, ওর নাম দেব রাজ। আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় ও ডাক্তারি পড়ছিলো। বাবা-মাকে না জানিয়ে, ওঁদের অনুমতি ছাড়াই আমি ওকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলাম।'

দীর্ঘ নীরবতার পর মমতা আবার বলতে শুরু করলো:

'আমি সন্তান-সম্ভবা হলাম। কিন্তু বাবা-মা আমার কাকুতি-মিনতিতে কোনো কানই দিলেন না, ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ করে রেখে দিলেন। তারপর থেকে আমাকে আর কখনও ওর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্ছাটাকেও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিলো।'

সবাই নিয়তির হাতের পুতুল। আমরা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি বটে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। তাই আমাদের কাজের জন্যে, তা সে ভালো হোক বা মন্দই হোক, আমাদের দায়ী করা যায় না।'

'কিন্তু এসব কথা তুমি আমাকে আগে বলোনি কেন ?' জগদীশের বিহ্বল-বিস্মিত কণ্ঠস্বর চকিতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

'প্রয়োজন বোধ করিনি।'

'সত্যিটা বলার প্রয়োজন বোধ করোনি ?'

'হ্যাঁ, ওই ঘটনার পর থেকে আমার বুকের ভেতরটা অনেক আগেই জমে পাথর হয়ে গিয়েছিলো। এখন আমি আর সত্যি মিথ্যের মধ্যে কোনো তফাতই খুঁজে পাই না।'

'তাহলে আজই বা তোমার মনের এই হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলো কেন ?'

'যখন সত্যি আর মিথ্যেকে আলাদা করে চেনা যায় না, তখন কি বলছি তাতেও কিছু এসে যায় না। তবে একটা কথা বলতে পারি—তোমার কাছে আমি কখনও মিথ্যে বলিনি, কখনও বলিনি যে তোমাকে ভালোবাসি।'

'কিন্তু কি বলছো তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না, মমতা। তুমি···তুমি সংসারটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছো।'

'আমি ?'

সহসা উৎচকিত, কৃত্রিম হাসিতে মমতা ফেটে পড়লো।

'তার মানে তুমি কি বুঝতে পারছো না, কোলের বাচ্ছাটার কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আমার ছেলেটাই যখন চলে গ্যাছে, তখন মেয়েটাকেও যদি হারাতে হয় তাতে আমার কিছু এসে যায় না, জগদীশ।'

'বাচ্ছাটাকে তুমি ভালোবাসো না, মমতা ?'

''না' বলতে পারলেই আমি সব চাইতে খুশি হতাম। ছেলেটাই ছিলো আমার প্রকৃত ভালোবাসার জীবন্ত প্রতীক। আর মেয়েটা আমার বিরুদ্ধ কামনার ফলশ্রুতি, জোর কোরে যাকে বহন করতে হয়েছে আমার সত্তায়।'

'কিন্তু আমি তো তোমাকে কখনও জোর করিনি···'

'জগদীশ, তুমি ক্রীড়নক মাত্র। যাকিছু অনিষ্ট করার করেছে এই সমাজ, নিষ্ঠুর এই সমাজই আমার ভালোবাসাকে দু পায়ে দলে গ্যাছে।'

'তুমি কি সেই সমাজেরই বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাইছো ?'

'আমি কোনোদিনই অন্য কোনো স্বামী বা সন্তান চাইনি। ওরা দুজনেই আমাকে বিশ্বাস করতো।' স্বামীর প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়েই মমতা বললো।

'কিন্তু সমাজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে তুমি কোনো চেষ্টা করোনি কেন ?'

'মমতা, আমার মনে হয় তোমার জীবনে আদৌ না এলে বোধ হয় ভালো হতো।'

'প্রচণ্ড ঘূর্ণীঝড় যখন আছড়ে পড়ে, তখন কেউই রেহাই পায় না, জগদীশ। তার চলার পথে যাকিছু পায় তাকেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে যায়।'

'বর্তমানে তোমার স্বামী কোথায় তুমি কিছু জানো ?'

'না।'

'তুমি আর ওকে ভালোবাসো না ?'

'আমি শুধু ওকেই ভালোবাসতাম, আর কাউকে নয়।'

'এখন হয়তো ও আবার বিয়ে করেছে।'

'হতে পারে।'

'একদিন যে প্রতিমূর্তিকে তুমি পুজো করতে, আজ হয়তো তা দীর্ণ, ম্লান হয়ে গ্যাছে।'

'ম্লান হোক বা না হোক, আমার আর কোনো প্রতিমুর্তিরই প্রয়োজন নেই। ওর অস্তিত্ব রয়েছে আমার রক্তে, আমার শিরায়, আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে।'

'তার মানে তুমি এখনও ওকে ভালোবাসো।'

'সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও মরে না।'

'মমতা, তুমি যদি চাও ওকে খুঁজতে পারো, আমি তোমার পথ আগলে রাখবো না।'

'আমি ওকে খুঁজতে চাই না। শুনেছি আমাকে নাকি ওর আর কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমিও চাই না কখনও কারুর বোঝা হয়ে থাকতে। পরস্পরে বন্ধুর মতোই পাশাপাশি চলতে চেয়েছিলাম। একবার হোঁচট খেলাম, তারপর সেই একজন অন্যজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম, কেউ আর কাউকে খুঁজে পেলাম না।'

'মমতা !'

'হ্যাঁ, আমি জানি আমি কি বলছি।'

'আর তোমার ছেলে ?'

'জানি না। ওকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলো। মহিলা ডাক্তারটি আমাকে বলেছিলেন দিন দশেকের জন্যে বাচ্চাটার যত্ন নিতে, নইলে নাকি ওকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু তারপর যে ওর কি হলো আমি কিছুই জানি না।'

'মমতা, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু তোমাকে বাচ্ছাটার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে।'

'সে তোমার যা ইচ্ছে।'

'তোমার যা প্রয়োজন আমি সবই দেবো, কিন্তু রঞ্জুকে জানতে দিতে চাই না তুমি ওর মা।'

'আমি কিছু চাই না, জগদীশ।'

'আমার মনে হয় নৈনিতালের বাংলোটা তোমার খারাপ লাগবে না।'

মুখে বললেও, জগদ্দীশের মনে হলো লাহোর ছেড়ে তার বাবা-মা, মেয়ে সবকিছুকে পেছনে ফেলে, মমতাকে নিয়ে সে এমন একটা অজানা জায়গায় পালিয়ে যায়, যেখানে মমতা তার প্রথম প্রেমের কথা ভুলে যাবে, যেখানে তাকে এই বিবেক-দংশন অনুভব করতে হবে না, যেখানে তারা চিরদিনের জন্যে একসঙ্গে আনন্দে বাস করতে পারবে।

'জগদ্দীশ, আমি কিছু নিতে চাই না। স্ত্রী হিসেবে আমিও তোমাকে কিছু দিতে পারিনি। এমন কি যদি আমার কিছু থাকতো, তবুও বিয়ের নামে দাক্ষিণ্যকে আমি কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারতাম না।'

মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বলে মমতা কুর্সি ছেড়ে উঠে পড়লো, বেদনার্ত চোখে তাকালো জগদ্দীশের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

জগদীশের ইচ্ছে হলো মমতার হাতদুটো আঁকড়ে ওকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে ওঠে :

'মমতা, মমতা তুমি যেও না! তোমাকে আমার প্রয়োজন। আমাদের পথ, আমাদের লক্ষ্য যে এক!'

কিন্তু সে নড়তে পারলো না, পাথরের প্রতিমূর্তির মতো চুপচাপ বসে রইলো। মমতা চলে গেছে, চলে গেছে তার দৃষ্টি-সীমার বাইরে থেকে, তার জীবনের বৃত্ত থেকে।

২

স্থবির, বিহ্বল-বিস্ময়ে জগদ্দীশ কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলো। অতীত ঘটনাগুলো একে একে আছড়ে পড়তে লাগলো তার স্মৃতিপটে। এখন সে অনেক কিছুই দেখতে পেলো যা সে আগে দেখেনি। অনেক বিস্ময়ের আজ সমাধান ঘটলো, অনেক রহস্য আজ পরিষ্কার হয়ে গেলো। মমতা এখন আর তার কাছে কোনো প্রহেলিকা নয়।

রঞ্জুর জন্মের সময়কার মর্মান্তিক ঘটনাটা তার মনে পড়লো। মমতাকে উৎসাহ দেবার জন্যে ধাত্রী বলেছিলো :

'বাঃ, মেয়েটাকে ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে তো, ঠিক যেন রেশমী সুতো!'

মমতা কিছুটা অস্বাভাবিক ভাবেই নিশ্চুপ ছিলো, সদ্যজাত শিশুটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলো নির্নিমেষ চোখে। তারপর অস্ফুট স্বরে ও শুধু বলেছিল, 'ছেলেটা সত্যিই সুন্দর!'

ধাত্রী অবাক হয়ে গিয়েছিলো। ও ভেবেছিলো মমতার ধারণা ও বোধ হয় পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে, মেয়ে নয়। সদ্য প্রসব-উত্তীর্ণ সেই সংকটের মুহূর্তে ধাত্রী মমতাকে আর হতাশ করতে চায়নি, রীতিমতো বুদ্ধিমতীর মতোই ও বলেছিলো :

'হ্যাঁ, শিশুটা সত্যিই সুন্দর! ছোট্ট হলে কি হবে, অসম্ভব চালাক।'

কিন্তু ও যখন মমতার পাশ থেকে ঘুমন্ত বাচ্ছাটাকে তুলে নিতে গিয়েছিলো, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মমতা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো।

জগদ্দীশ তখন হাসপাতালের বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলো, মমতার আর্তচিৎকার শুনেই সে দৌড়ে ভেতরে গেলো। ডাক্তার মমতাকে একটা ইনজেকশন দিলেন, বললেন অত্যাধিক দুর্বলতার জন্যেই এমনটা ঘটেছে। এতে তেমন ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

মমতা যখন চোখ মেললো, দেখে মনে হলো ও যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে। জগদ্দীশ আলতো করে ওর আলুথালু চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো আর নিজের মনেই অবাক হয়ে ভাবছিলো কেন এমনটা হলো। ও কি সত্যিই কোনো কিছুতে ভয় পেয়েছে ?

দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর মমতা ক্লান্তস্বরে থেমে থেমে বলেছিলো ধাত্রী ওর ছেলেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলো। জগদ্দীশ হো হো করে হেসে উঠেছিলো, হেসে ছিলেন ডাক্তারও।

শিশুটাকে মার পাশে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তার বলেছিলেন, 'এই নিন আপনার ছেলে।'

জগদ্দীশ কিন্তু মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলো। মমতার মতো লেখাপড়া জানা বাস্তববাদী কোনো মহিলা মেয়ে হওয়ার জন্যে এত মুষড়ে পড়বে সে কল্পনাই করতে পারেনি। মমতা রীতিমতো বিদুষী, যার রূপ লাবণ্য আর মিষ্টি স্বভাবের কাছে সে বরাবরই বিনীত হয়েছে। সে নিজে প্রায়ই বলতো—সারা পরিবারে মমতার মতো আর কেউ নেই।

ডাক্তার তাকে বুঝিয়ে বলতেন—এই ধরনের প্রতিক্রিয়া যে প্রাচীনপন্থী ভাবনারই ফলশ্রুতি, তেমন ভাবার যথেষ্ট কোনো কারণ নেই! মেয়েরা সাধারণত পুত্র-সন্তান প্রসবেই বেশি গর্ব আর তৃপ্তি অনুভব করে।

তাই ডাক্তার জগদ্দীশকে উপদেশ দিয়েছিলেন—অন্তত কিছু দিনের জন্যে মমতাকে ভাববার অবকাশ দেওয়া হোক যে ও পুত্রসন্তান প্রসব করেছে, কন্যা নয়।

মমতা কখনও, এমন কি মুহূর্তের জন্যেও বাচ্ছাটাকে ওর চোখের আড়াল করতো না। ধাইকে বাচ্ছাটার ধোয়া-মোছা, খাওয়ানো, আদর করা, সবই মমতার সামনে করতে হতো।

একদিন মমতা প্যারামবুলেটারে বাচ্ছাটাকে চাপিয়ে বাগানে ঘুরছিলো, জগদ্দীশও তখন ওর সঙ্গে ছিলো। পেছন থেকে আয়া এসে হঠাৎ প্যারামবুলেটার থেকে বাচ্ছাটাকে তুলে নিলো, বললো ওকে খাওয়ানোর সময় হয়ে গেছে।

আয়া পেছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মমতা হঠাৎ চেঁচাতে শুরু করলো। ও এমন অসুস্থ বোধ করলো যেন ওর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, বাগানের একটা বেঞ্চিতে ও বসে পড়লো। জগদ্দীশ ওকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো, মমতা বললো :

'ধরো, ওকে ধরো, ও আমার ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে!'

ডাক্তার জগদ্দীশকে বোঝালেন মমতার কেনই যেন মাথায় ঢুকেছে ও, বাচ্ছাটা বাঁচবে না। তিনি অবশ্য আশ্বাস দিলেন যে এই ভয় একটু একটু করে মিলিয়ে যাবে এবং অচিরেই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।

জগদ্দীশ কিন্তু উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনি। আয়ার মুখটা মমতার মনে ভয় জাগাতে পারে

ভেবে জগদ্দীশ ওকে বদলে দিলো। নতুন আয়াটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। যেমন সুন্দর দেখতে, ফর্সা, তেমনি মিষ্টি ব্যবহার।

মমতার কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না, ও প্রায় সারাক্ষণই বাচ্ছাটার কাছাকাছি থাকতো, আদর করে 'রঞ্জু' বলে ডাকতো।

৩

সময় এগিয়ে চললো। যদিও জগদ্দীশ মমতাকে ভুলতে পারলো না, তবু ওকে ছাড়া বাঁচার চেষ্টা করতে লাগলো। একদিন সে তার ঘরে বসে রয়েছে, জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। রঞ্জু বাগানে আয়ার সঙ্গে খেলছে। রঞ্জু তখন সবে হাঁটতে শিখেছে। টলমলে পায়ে একটু একটু করে হাঁটছে, তারপরেই ধুপ করে পড়ছে। তবে নিজের এই প্রচেষ্টাতে ও যে আনন্দ পাচ্ছে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। আয়া ছোট্ট একটা গোলাপের কুঁড়ি তুলে রঞ্জুর চুলে আটকে দিলো। তারপর দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করলো।

একটু পরে আয়া ঘড়ির দিকে তাকালো এবং রঞ্জুকে খাওয়াবার জন্যে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু ও যেতে চাইছিলো না, ওর ইচ্ছে তখনও খ্যালে। কিন্তু আয়া পালিয়ে-যেতে চাওয়া বাচ্ছাটাকে জোর করে কোলে তুলে নিয়ে ওর ঘরে চলে গেলো।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগদ্দীশ মনে মনে ভাবলো, 'আয়া ঠিক যন্ত্রের মতন। ওর যাকিছু কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে। খাওয়া ঘুমনো ওঠা খেলা—সব কিছুর জন্যে সময় একেবারে বাঁধা। বাচ্ছাটা আর একটু বেশি খেলতে চায় কিংবা কম খেতে চায় কিনা তা নিয়ে ওর তেমন কোনো মাথা ব্যথা নেই।'

রঞ্জুর জন্যে জগদ্দীশের মায়া হয়, কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা, যত্ন থেকে বঞ্চিত করে তাকে মার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তার কিছু করার নেই, সত্যিই কিছু করার নেই।

হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে জগদ্দীশ মমতার ছবিটার দিকে তাকালো। বহুবার সে ভেবেছে দেওয়াল থেকে ছবিটাকে সরিয়ে ফেলবে, কিন্তু কোনোবারেই সে মনের দিক থেকে সায় পায়নি। চাকর-বাকররা প্রতিদিন সকালে যখন ঝাড়-মোছ করে তখন ওদের চোখে জল এসে যায়।

এবং জগদ্দীশও কোনোদিন মনে প্রাণে ছবিটাকে সরিয়ে ফেলতে চায়নি। যখনই সে ঘরে ঢুকতো, অতি অবশ্যই তার প্রাথমিক কাজ ছিলো মমতার বিরাট প্রতিকৃতিটার দিকে তাকিয়ে থাকা। কখনও কখনও তার এমনও মনে হতো যেন মমতা তখন ঘরে উপস্থিত রয়েছে।

জগদ্দীশ কখনও কখনও বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতো—কখনও মমতার ওপর, কখনও বা তার নিজের ওপর। দুঃখ বা ক্রুদ্ধতার সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছে হতো প্রতিকৃতিটাকে অন্য

কোথাও সরিয়ে ফ্যালে, ঠিক যেমন মমতা নিজে থেকেই কাউকে কিছু না জানিয়ে নিঃশব্দে সরে গেছে তার জীবন থেকে।

সেদিনও জগদীশ কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দেওয়াল থেকে বড় প্রতিকৃতিটা নামিয়ে ফেললো। শুধু তাই নয়, একে একে যেখানে যত ছবি ছিলো সবগুলোকে সরিয়ে ফেললো। রাগে তখন সে সত্যিই একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার মনে হলো এই সব ছবি এখানে থাকলে সে তার অস্বস্তিকর অতীতকে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। অব্যবহারিত একটা আলমারির অন্ধকার টানার মধ্যে ছবিগুলোকে সে চালান করে দিলো।

৪

জগদীশকে ছেড়ে আসার পর মমতা সরকারী একটা স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছে। সেখানকার শিক্ষক-আবাসনেই সে থাকে। ক্লাসে পড়ানো আর গ্রন্থাগারে পড়াশোনা করা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই ওর কোনো উৎসাহ নেই। স্কুলের সীমানার বাইরে ও পা দেয় না বললেই চলে এবং প্রায় সংসারত্যাগী মানুষের মতোই জীবন যাপন করে।

একদিন দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ও বিছানায় বসে রয়েছে। জানলার আধখানা পরদার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতরে। আলোর সুইচটা বন্ধই করা ছিলো।

ফিকে নীল দেওয়ালের দিকে মমতা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে রঙটাকে আরও কোমল, আরও মিষ্টি মনে হচ্ছে। হঠাৎ এক সময়ে দেওয়ালগুলো ওর চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেলো, তার পরিবর্তে দেখতে পেলো সীমাহীন, বিস্তীর্ণ, নীল জলরাশি। ওর মনে হলো খাটিয়াটা যেন নৌকার মতো ভেসে চলেছে কোন দূর দূরান্তে।

একটু পরেই মমতা দেখতে পেলো দূরের বেলাভূমিতে নক্ষত্রখচিত কয়েকটা মূর্তি নড়াচড়া করছে। একটু একটু করে কুয়াশা সরে যেতেই ও একটা মুখ স্পষ্ট চিনতে পারলো। মুখটা দেবের।

দেবের মুখে স্বচ্ছ, আশ্চর্য উজ্জ্বল একটা দীপ্তি। বিচ্ছেদে, কষ্টে, তার দীর্ঘ, পৌরুষদীপ্ত সুন্দর দেহখানা কেমন যেন শীর্ণ আর দুর্বল হয়ে পড়েছে।

তখনও ভালোবাসায় উদ্দীপ্ত দেবের মুখখানার দিকে মমতা অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চিবুক বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। মৃদু ভাষে ও বললো, 'বিদায়, প্রিয়তম আমার, বিদায়! আমার ইচ্ছে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। কিন্তু আমার সে শক্তি নেই। ঢেউগুলো যে ক্রুদ্ধ আর নির্মম, বেলাভূমিটাও অনেক দূরে। বিদায়, প্রিয়তম আমার, বিদায়!'

মমতার চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে এলো। একটু পরে ও দেখতে পেলো অন্য একটা মূর্তি—সেটা জগদীশের। তার চওড়া কপালে বলীরেখাগুলো আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

ঠোঁটদুটো বিবর্ণ। যদিও বসে গেছে, তবু তার চোখদুটো সমবেদনা আর ভালোবাসায়, দুঃখ আর ভর্ৎসনায়, কামনা আর অনুনয়ে পরিপূর্ণ।

তার করুণ চোখের দৃষ্টি মমতা সহ্য করতে পরলো না, নামিয়ে নিলো চোখের পাতা। অস্ফুট স্বরে বললো :

'তোমাকে কি দিতে পারি বলো ? আমার যে কিছু নেই। দুটো হাতই আমার রিক্ত। যাকিছু ছিলো সবই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো জগ্‌দীশ।'

লজ্জায় নত করলো মাথা। সরাসরি জগ্‌দীশের মুখের দিকে ও তাকাতে পারলো না।

নৌকাটা তখনও ভেসে চলেছে। মমতা আবার যখন চোখ তুলে তাকালো, ও দেখলো একটা ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিক্ত বালুবেলায়। ছেলেটা এমন ভাবে মমতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ওকে চেনার চেষ্টা করছে। মমতা মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

আর ঠিক তখন, একটু দূরে, ও শুনতে পেলো সৈকত থেকে ভেসে আসা একটা শিশুর কান্না। শিশুটা একটা ছোট মেয়ে। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বালির ওপর দিয়ে টলমলে পায়ে হেঁটে চলেছে। মাতৃত্বের দুর্বার একটা আবেগে মমতার সমস্ত সত্তা কেমন বিবশ হয়ে উঠলো, ওর মনে হলো শিশুর পায়ের নিচের মাটিটা যেমন হিমেল, তেমনি কঠিন। ও ব্যথা অনুভব করলো। ভয় পেলো বাচ্ছাটা হয়তো জলে পড়ে যেতে পারে। হারিয়ে যাওয়া বাচ্ছাটাকে যেন তুলে নেবার জন্যে. তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবার জন্যে ও হাতদুটো বাড়িয়ে দিলো।

কিন্তু বেলাভূমি আর শিশু, দুটোই অনেক দূরে। নদীটা চওড়া, আর নৌকাটা তখন দ্রুত ভেসে চলেছে। মমতা বার বার বাচ্ছাটার দিকে ফিরে তাকাতে লাগলো। নিজেকে ওর কেমন যেন অসহায় আর করুণ মনে হলো।

মমতা যখন সামনের দিকে তাকালো, দেখলো নদীবেলায় অনেক লোকজন। ওর বাবা-মা, ভাই-বোন, সবাই মাটিতে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে। তাদের পেছনে ওর অন্যসব আত্মীয়-স্বজন। তাদের সবার মুখেই বয়েস আর উদ্বিগ্নতার ছাপ, লজ্জায় ম্লান। তারা কাঁদছে। মমতা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

তারপর হঠাৎ ও শুনতে পেলো তীর থেকে ভেসে আসছে কান্নার রোল, অশ্রুতে ভেজা আবেগে রুদ্ধ সে কান্না। ওরা বলছে 'মমতা, আমাদের ক্ষমা কর। আমরা পাপী। আমরা খুনী। দোহাই তুই আমাদের ক্ষমা কর!'

মমতার মনে হলো সমস্ত স্নায়ুপুঞ্জ যেন নিখিল হয়ে আসছে। ডান হাতে কপালটা টিপে ধরে ও গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, 'কেবল ঈশ্বরই তোমাদের ক্ষমা করতে পারেন।'

নৌকাটা তখন অসম্ভব দ্রুত গতিতে চলেছে। মমতা আর তীরের দিকে তাকাতে সাহস পেলো না। সামনে মাইলের পর মাইল কেবল ধূ ধূ বিস্তীর্ণতা। সবকিছুই নির্জন আর

নিষ্প্রাণ। জীবনের কোথাও কোনো চিহ্ন নেই—না পশুপাখি, না মানুষের। সে এক ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য।

তারপর আবার তীর থেকে হঠাৎ লোকজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। তাহলে ও কি অন্য কোনো লোকালয়ে এসে পৌঁচেছে? মমতা অবাক হয়ে গেলো। দু হাতে কানদুটো চেপে ধরে ও নিজের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। তারপর এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

দুই

কৃষাণ লাল ধনী ব্যবসায়ী। সে আর তার স্ত্রী সরলা দুজনেই খুব সুখী। বিয়ের বারো বছর পর ওদের একটা ছেলে হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরে কৃষাণ দেখলো তার স্ত্রী রুপোর বোতলে বাচ্চাটার জন্যে দুধ ভরছে। কৃষাণ হাসতে হাসতেই জিগেস করলো :

'আচ্ছা সরলা, তুমি ওকে রোজ রুপোর বোতলে দুধ খাওয়াও কেন বলো তো? কতটা দুধ ধরে তুমি কেমন করে বুঝতে পারবে? কিন্তু কাঁচের বোতল হলে কতটা দুধ আছে তুমি স্পষ্টই দেখতে পেতে।'

'এসব তুমি কিছু বোঝো না। কাঁচের বোতলে দুধ খাওয়ালে সবাই দেখতে পায়। এত বড় একটা বাড়িতে কত রকমের লোক যাওয়া-আসা করে, কে কখন নজর দেবে কেউ বলতে পারে।'

সরলার মেয়েলি সংস্কারকে উপেক্ষা করেই কৃষাণ বললো :

'শুনলুম দেব নাকি দু একদিন হলো দিল্লিতে ফিরে এসেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে তো এলো না একবারও! শরীরটরির আবার খারাপ হলো কি না কে জানে...'

ডাক্তার দেব কৃষাণ লালের চাইতে বয়েসে অনেক ছোট হলেও দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওদের গলায় গলায় ভাব দেখে সরলা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলতো—ওদের একজন কেউ মহিলা হলে, দুজনে সত্যিই খুব আদর্শ দম্পতি হতে পারতো।

স্বামীর কথা শেষ হবার আগেই সরলা হাসতে হাসতে বললো :

'না না, দ্যাখো গে যাও বাবু হয়তো কোথাও বসে বসে নতুন কবিতা আওড়াচ্ছেন!'

'কিংবা এমনও হতে পারে, হয়তো অপারেশনের জন্যেই সময় করে উঠতে পারেনি।'

'তবে মানুষটা সত্যিই খুব ভালো।'

'আমার চাইতেও ভালো?' কৃষাণ সরলাকে রাগাবার চেষ্টা করলো।

'আমরা মানুষ। ও দেবদূত।'

সরলার কথা সবে শেষ হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় বাইরে থেকে 'বৌদি! বৌদি!' শব্দে চেঁচাতে চেঁচাতে দেব ঘরে ঢুকলো।

'আরে, দেবজি!' দেবকে দেখে সরলা খুশিতে চলকে উঠলো। 'এসো, এসো। এ কদিন আমরা শুধু তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

'আচ্ছা দেব, তুমি যখনই আমাদের বাড়িতে আসো, সব সময় বৌদিকে ডাকো কেন বলো তো? আমার কথাও তো তোমার কখনও কখনও মনে পড়া উচিত!' কৃত্রিম স্বরে কৃষাণ গম্ভীর হবার ভান করলো।

'এ কথাটা তুমি কেন বুঝতে পারো না কৃষাণ—বাড়িটা বৌদির সাম্রাজ্য, আর অফিসটা তোমার। তোমার অফিসে গিয়ে কখনও আমাকে বৌদি বলে ডাকতে শুনেছো?' কথা বলতে বলতেই দেব হাসিখুশিতে উচ্ছল স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানের সোফাটায় গিয়ে বসলো।

সরলা বললো, 'তুমি জানো, এক্ষুনি আমরা তোমার সম্পর্কে বলাবলি করছিলুম?'

দেব অবাক চোখে তাকালো, কিন্তু কোনো জবাব দেবার আগেই কৃষাণ বলে উঠলো, 'তোমার বৌদির ধারণা তুমি খুব ভালো লোক, এমন কি আমার চাইতে অনেক ভালো।'

'আমি মোটেই বলিনি ও তোমার চাইতে ভালো।' সরলা প্রতিবাদ করলো, 'আমি বলেছি আমরা পাপী মানুষ, ও দেবদূতের মতো পবিত্র।'

'আমি কিন্তু আদৌ তা নই, বৌদি। আমি ঠিক তোমাদেরই মতো হাসি, কাঁদি, ব্যথা পাই···' মুখে বললেও দেব তখন নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে ছিলো উলটো দিকের দেওয়ালে টাঙানো কৃষাণের ছেলের আলোকচিত্রটার দিকে।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সরলাও তাকালো ছবিটার দিকে, বললো, 'অনেক কিছুর জন্যে আমরা সত্যিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, দেবজি!'

'না না, ও কথা বোলো না বৌদি। বরং এসো আমরা অন্য কিছু বলি।'

প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই কৃষাণ মন্তব্য করলো, 'সরলা বলছিলো তুমি নাকি এ কদিন আমাদের বাড়িতে না এসে কবিতা শুনিয়ে স্বর্গের অপ্সরীদের বশ করাচ্ছিলে।'

'আমি যখন মর্তের কাউকেই বশ করতে পারি না, তখন স্বর্গের কাউকে কেমন করে বশ করবো বলো?' বিষণ্ণতায় কেমন যেন করুণ হয়ে উঠলো দেবের কণ্ঠস্বর।

'একজন কবি আর একজন ডাক্তারের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য! একজন অপার সৌন্দর্যের পূজারী, অন্যজনকে ঘিরে থাকে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা! আচ্ছা দেব, এই যে তুমি সব সময় রোগ-ভোগ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো, এতে কাব্যিক পরিবেশ গড়ে তুলতে তোমার কোনো অসুবিধে হয় না?'

'না, কৃষাণ। মানুষের হৃদয়ের পাশাপাশি ভিন্ন আবেগের সহবস্থান ঘটাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তুমি কি ভাবো কোনো ডাক্তার যখন কোনো ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, তখন তার হৃদয়ে দয়া, মায়া বা করুণার কোনো স্পর্শ থাকে না?' দেব ম্লান ঠোঁটে

হাসলো। 'আর কবিতার কথা যদি বলো, তহলে বলবো বন্ধু, কবিতার জন্ম শুধু সৌন্দর্যের মধ্যেই নয়, শারীরিক ক্ষতের চাইতেও যা বেদনাদায়ক—মানুষের সেই তীব্র কামনা আর যন্ত্রণার মধ্যেও তা জন্ম নিতে পারে।'

এমন সময় আয়া বাচ্ছাটাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাচ্ছাটা সঙ্গে সঙ্গেই দেবকে চিনতে পেরে দুহাত বাড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেলো। দেব যখন বাচ্ছাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করতে ব্যস্ত, খুদে শয়তানটার চোখ গিয়ে পড়লো দেবের কোটের পকেটে থাকা ঝরনা-কলমটার ওপর। এক সময়ে ছোট্ট নরম একটা হাত দিয়ে দেবের চিবুক স্পর্শ করে অন্য হাত দিয়ে কলমটা দেখিয়ে ও বললো :

'আমাকে দাও।'

'ও, কলমটা তোমার চাই! কেন, আমার মতো কবিতা লিখবে?' দেব হাসতে হাসতে কলমটা ওকে দিলো।

'বাচ্ছারা জীবনের আনন্দকেই উপভোগ করতে চায়, কবিতা লিখতে নয়, বুঝলে?' উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে কৃষাণ বললো। 'দেখে মনে হচ্ছে আজ তোমার মেজাজটা বেশ ভালো আছে, নতুন কি কবিতা আছে শোনাও।'

দেবের কবিতার বরাবরই যে ভক্ত, সেই সরলাও স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়ে কবিতা শোনানোর জন্যে জেদ ধরলো।

বেশ খানিকটা সাধাসাধির পর দেব যে কবিতাটা আবৃত্তি করলো তার অর্থ হলো :

"গোধূলি কিংবা নিশান্তিকা, অনুক্ষণই আমি অনুভব করি একজোড়া চোখ অপলক তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমি যেখানেই যাই, ওদুটো আমাকে অনুসরণ করে। যখনই আমি কোনো ফুলের দিকে তাকাই, ওদুটো সেখানে। তখন কাঁটা বা ফুল, আমি কোনোটাকেই দেখতে পাই না। কেবল দেখতে পাই আশ্চর্য সুন্দর সেই চোখদুটো। এমন কি রাতের অন্ধকারেও ওদুটো মুহূর্তের জন্যে কোথাও সরে যায় না, উপস্থিত থাকে সবখানেই—জলে স্থলে আকাশে, এমন কি আমার সমস্ত সত্তায়।"

২

'কে, কৃষাণ?' বাইরে পয়ের শব্দ শুনে সরলা জিগেস করলো।

'না বৌদি, আমি, দেব।'

দেব ঘরের ভেতরে ঢুকে জিগেস করলো, 'মানু কোথায়?'

'আয়ার জন্যে কেঁদে কেঁদে এই একটু আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। কয়েকদিন ধরেই আয়ার শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না, তাই ছুটি নিয়ে ও দেশে গ্যাছে।'

'ও!'

'আয়া চলে যাবার পর থেকে এই দু দিন বেচারি ঘরের বাইরে পা দিতে পারেনি।'

'তা আমাকে রাখলেই তো পারো। আয়ার চেয়ে আমি অনেক বেশি মানুর যত্ন নিতে পারবো।'

'থাক্, খুব হয়েছে। তোমাকে আর…'

সরলার কথা শেষ হবার আগেই চাকর এসে জানালো যে সে একটা নতুন আয়া খুঁজে পেয়েছে এবং ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে।

'কই, কোথায় ?' সরলার আর তর সইলো না, চাকরকে বললো ওকে এখানেই নিয়ে আসতে। আয়াকে দেখে জিগেস করলো, 'আমার একটা ছোট বাচ্ছা আছে, তুমি তার দেখাশোনা করতে পারবে ?'

'কেন পারবো না, মেমসাহেব ? এই করেই তো আমার জীবনটা কেটে গেলো। আপনার কোনো ভয় নেই। আমি জোর করে বলতে পারি, আমার কাজে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।' নিজের ওপর আস্থা রেখেই আয়া জবাব দিলো। মাঝামাঝি বয়েসের বেশ স্বাস্থবতী মহিলা। হাবভাবে বোঝা গেলো শুধু বুদ্ধিমতী নয়, একাজে ওর যথেষ্ট দক্ষতাও আছে।

'এর আগে তুমি কোথায় কাজ করতে ?' স্বাভাবিক ভাবেই সরলা জানতে চাইলো।

'লাহোরে, রায় সাহেবের ছেলের বাড়িতে…কি যেন নাম, আমি খালি ভুলে যাই… ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—জগদীশ চন্দর। ওদের ওখানে আমি চার মাস ছিলুম। তারপর আবার গ্রামে ফিরে আসি।'

আয়ার মুখে জগদীশ চন্দরের নামটা শুনে দেবের চোখে মুখে ফুটে উঠলো স্তব্ধ বিস্ময়। সরলা সে সব কিছু লক্ষ্য না করে আয়াকে জিগেস করলো, 'ওখান থেকে অত তাড়াতাড়ি চলে এলে কেন ?'

'আমি নিজে ওখান থেকে চলে আসিনি। আমি ওদের ছেড়ে কোনোদিন চলে আসতুমও না। ওরা আমাকে সত্যিই খুব ভালোবাসতো…'কান্নার মতো ভারি হয়ে ওঠা স্বরে আয়া কোনো রকমে বললো।

'তারপর, কি হলো ?' অধৈর্য হয়ে দেব জানতে চাইলো।

'আমারই কপাল খারাপ। আমি ভেবেছিলুম জীবনের বাকি কটা দিন ওই বাড়িতেই কাটিয়ে দেবো। কিন্তু ভাগ্যের ইচ্ছে অন্য রকম। মেয়েটা জন্মাবার পর থেকেই মার অদ্ভুত একটা রোগ দেখা দিলো। প্রায়ই চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হয়ে যেতো, কখনও আবার চিৎকার করে উঠতো, 'ওরা আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে! ধরো, ধরো…ওরা আমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে!' একটু নীরবতার পর আয়া আবার বলতে শুরু করলো, 'ওরা বড় লোক। ডাক্তার যেই বললেন, ওরা অমনি রাতারাতি আমাকে পালটে আবার একটা নতুন আয়া রাখলো।'

দেবের দিকে তাকিয়ে ও বললো, 'এতে কি রোগ সারবে. আপনি বলুন ?' আয়া ভেবেছিলো দেব ওকে সমর্থন করবে, হয়তো বলবে ওর মুখটা এমন কুৎসিত নয় যে কেউ

ভয় পেতে পারে। কিন্তু দেব কিছুই বললো না। এমন কি সে আয়ার দিকে ফিরেও তাকায়নি, জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে কেবল চুপচাপ বসেছিলো।

মাইনেপত্তর ঠিকঠাক করে তখনই আয়াকে নিয়োগ করা হলো। ইতিমধ্যে কিষাণও এসে পৌঁছলো। গভীর বেদনায় ম্লান হয়ে ওঠা দেবের মুখখানা কৃষাণ বা সরলার কারুরই নজর এড়িয়ে গেলো না। কৃষাণ নানান কিছুর মধ্যে দিয়ে দেবকে উৎফুল্ল করে তোলার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

দেব যখন বিদায় নিয়ে সবে ফিরতে যাবে, দেখলো সামনের লনটায় আয়া আর মানু খেলা করছে। সেও ওদের সঙ্গে খেলার ছল করে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো এবং এর ফাঁকেই এক সময়ে সে আয়াকে জিগেস করলো :

'আগে তুমি যেখানে কাজ করতে, তাদের বাড়ির বাচ্ছাটার কি নাম ছিলো ?'

'রঞ্জু।'

'রঞ্জু !' দেব চমকে উঠলো, বিস্ময়ে তখন সে প্রায় স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, বাবুজি, মেয়েটা খুব সুন্দর, দেখতেও ঠিক ওর মায়ের মতো। বাচ্ছাটা হয়তো এখন অনেক বড় হয়ে গ্যাছে।'

পুরনো দিনের স্মৃতিতে আয়া যে বিচলিত হয়ে উঠেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেলো।

দুহাতে দেব মানুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো। সারা শরীর তার থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে নিজেকে সে বুঝি আর কিছুতেই সুস্থির রাখতে পারবে না।

৩

জন্মদিনে মানু সুন্দর কারুকার্য করা সাদা রেশমী কামিজ আর তার সঙ্গে মিলিয়ে পায়জামা পরেছে। এমনিতেই তাকে সুন্দর দেখতে, আজ আবার তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। অতিথিদের ভিড়ে গমগম করছে সারা বাড়ি। সবাই তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, উপহার দিচ্ছে। সরলা যখন অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কৃষাণ তখন ব্যস্ত রয়েছে মানুর পাওয়া উপহারগুলোর একটা তালিকা করে সেগুলোকে গুছিয়ে রাখতে। মানু দেবের হাত ধরে খাবার-সাজানো টেবিলগুলোর চারপাশে ঘুরছে।

কৃষাণের বন্ধুদের একজন দেবকে বললো, 'ডাক্তার সাহেব, বিয়ে করার ইচ্ছে বা অনিচ্ছে অনেকেরই থাকতে পারে, কিন্তু সন্তানের মুখ চেয়ে বিয়ে করাটা সত্যিই বিশেষ প্রয়োজন।' দেব হাসলো।

'আচ্ছা, মানুর মতো সুন্দর কোনো ছেলের সঙ্গে আপনার কখনও খেলতে ইচ্ছে করে না ?' অন্য আর একজন জিগেস করলো। এবারেও কোনো জবাব না দিয়ে দেব শুধু মুচকি মুচকি হাসলো।

বন্ধুকে উদ্ধার করার জন্যেই কৃষাণ বললো, 'কেন, ও তো একজনের সঙ্গে খেলছে ? সেটা ওর নিজের হোক বা আমাদেরই হোক, তাতে কি এসে যায় ? কেন তোমরা মিছিমিছি

আমার সাত্ত্বিক বন্ধুটিকে খোঁচাচ্ছো বলো তো?' কৃষাণের বলার ভঙ্গিতে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

দেবকে যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তার বনেদি চেহারা। 'পাত্র' হিসেবে বলা যায় সে সর্বদিক থেকেই যোগ্য। যে যখনই তার সংস্পর্শে আসে, মনে মনে ভাবে ওর মেয়ে বা বোনের সঙ্গে তাকে মানায় বেশ ভালো। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে কেউ কোনোদিনই মুখ-ফুটে তাকে কিছু বলতে ঠিক সাহস পায়নি।

উৎসব শেষ হবার পরেও সরলা, কৃষাণ আর দেব অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে গল্পগুজব করছিলো আর উপহার প্রসঙ্গে মানুকে রাগাবার চেষ্টা করছিলো।

এক সময়ে ফেরার জন্যে দেব উঠে পড়লো। সরলা জিগেস করলো, 'আবার কবে আসছো শুনি?'

হাসতে হাসতে দেব জবাব দিলো, 'এর জন্যে এত ভাবার কি আছে? আমি তো একদিন দুদিন ছাড়াই তোমাদের বাড়িতে আসি।'

'না, আজকাল তুমি আর আগের মতো ঘনঘন আসো না। এই তো, গতকালই এ সম্পর্কে কৃষাণকে বলছিলুম, ও বললো আজকাল তুমি নাকি বেশির ভাগ সময়ই ডাক্তার রবি শঙ্করদের বাড়িতে কাটাও।'

'বৌদি, তুমি তো জানো, ডাক্তার শঙ্করই আমাকে লাহোর থেকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। উনি আমাকে সত্যিই খুব স্নেহ করেন। প্রতিদিনই সন্ধ্যেবেলায় গাড়িতে করে ওঁনার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে এমন জেদ ধরেন যে আমি কিছুতেই না-করতে পারি না।'

'সেই জন্যেই তো বলছিলুম…'

'না, সত্যিই বিশ্বাস করো, আমি নিজে থেকে ওখানে যেতে চাই না, কিন্তু…' দেব ইতস্তত করলো।

'কেন, ওখানে যাওয়াটা বিপজ্জনক কিছু নাকি?'

'বিপজ্জনক! না, বৌদি, বিপদকে আমি ভয় করি না। ভয় আমার অন্য আর একজনের জন্যে।'

সরলা অবাক চোখে তাকালো। কৃষাণ রসিয়ে রসিয়ে বললো,—'ডাক্তার শঙ্কর আজকাল দেবকে কেন এত স্নেহ করছেন বুঝতে পারছো না?'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে সরলা দুষ্টুমির ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলো। 'খুব বেশি স্নেহ আবার কখনও কখনও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে! আশা করি ডাক্তার শঙ্করের নিশ্চয়ই কোনো বয়স্থা মেয়ে আছে?'

সরলাকে রাগানোর জন্যেই কৃষাণ বললো, 'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছো তাহলে!'

সরলা হাসি চাপার চেষ্টা করলো। 'বৌদি এলে আমি কিন্তু সত্যিই খুব খুশি হবো।'

'তার কোনো সম্ভাবনা নেই, বৌদি।' দেবের ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো কৃত্রিম একটা

হাসির রেখা। 'আমার হাতের রেখাগুলো টানার সময় বিধাতাপুরুষের [illegible] [illegible] গিয়েছিলো শুকিয়ে, ফলে আমার ভালোবাসার রেখাটার কোনো আঁচড়ই পড়েনি।'

৪

ডাক্তার রবি শঙ্করের মেয়ে রাজকুমারী সত্যিই আশ্চর্য রূপসী। যেমন শোভন, তেমনি সূক্ষ্ম ওর রুচিবোধ। ছবি আঁকা শিখেছে একজন নামকরা শিল্পীর কাছে, ওর গানের গলাটাও ভারি মিষ্ঠি। বাপের অঢেল প্রাচুর্য ওর এই শিল্পীক পরিবেশকে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

দেবের প্রতি কুমারীর মনোভাব ডাক্তার শঙ্করের অজানা নয়। তিনি এটাও ভালো করে জানেন যে নৈতিক দিক থেকে দেব অত্যন্ত ঋজু, উন্নত চরিত্রের মানুষ। এর জন্যে তিনি দেবকে যতটা মর্যাদা দেন, কুমারীর জন্যে ঠিক ততটাই গর্ব অনুভব করেন।

যেহেতু কুমারীর অন্যসব বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং অধিকাংশ সময়ে বাড়িতে ওকে একা থাকতে হয়, তাই ও প্রায়ই নিঃসঙ্গ আর ক্লান্তি অনুভব করে। ফলে একটু একটু করে দেবের সঙ্গ ওর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠলো। ওর বাবা যে শুধু দেবকে স্নেহ করেন তাই-ই নয়, তার অবকাশের অধিকাংশ সময়টুকুতে দেবকে ওদের বাড়িতে ধরে রাখারও চেষ্টা করেন।

ডাক্তার শঙ্কর দীর্ঘদিন ধরেই বাতের যন্ত্রণায় ভুগছেন। যথেষ্ট ভালোভাবে চিকিৎসা করানো সত্ত্বেও কোনো লাভ হয়নি। বিশেষ করে তাঁর হাঁটুদুটো এমনই দুর্বল যে দিনের বেশির ভাগ সময় হয় বাড়ির বাগানে, নয়তো বারান্দায় বসেই কাটিয়ে দিতে হয়।

একদিন কুমারী আর ওর বাবা খাবার টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে বসেছে, সঙ্গে রয়েছে ওদের সবচেয়ে প্রিয় জলখাবার—ডিম দেওয়া মিষ্ঠি রুটি। দুজনে নিশ্চুপ, দুজনেই কি যেন ভাবছে। দুজনেরই মনে হচ্ছে দেবকে ভীষণ ভাবে হারিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ওদের এই অনুতাপ বেশিক্ষণের জন্যে স্থায়ী হলো না। একটু পরেই দেব এসে পৌঁছলো। কুমারী এবং ডাক্তার শঙ্কর—দুজনেই আপ্লুত খুশি চলকে উঠলো। জমাটি হয়ে উঠলো চায়ের আসর।

দেব বললো হাসপাতালে অত্যন্ত জটিল ধরনের একটা রোগ-সমস্যায় সে আটকে পড়েছিলো। সদ্য-বিবাহিতা একটি তরুণীর কাতর মিনতিতে বাধ্য হয়েই সে কি ভাবে ওর স্বামীর ওপর অসম্ভব কঠিণ ও সূক্ষ্ম ধরণের অস্ত্রোপচার করেছে, সে কাহিনীও ওদের সবিস্তারে বর্ণনা করলো। অত্যন্ত গরীব আর সাধারণ ঘরের মেয়েদের প্রতি তার সহানুভূতি সত্যিই খুব সংবেদনশীল। 'ওদের জীবন স্বামীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—স্বামী হাসলে ওরা হাসে, স্বামী কাঁদলে ওরা কাঁদে, স্বামী মরলে ওরাও মরে।'

দেবের এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কুমারী একমত হতে পারলো না, মৃদু উষ্মার সঙ্গেই ও বললো :

তার মানে আপনি কি বলতে চান উচু-ঘরের মেয়েদের তাদের স্বামীর প্রতি কোনো সহানুভূতি, কোনো ভালোবাসা নেই ? জানবেন মেয়েদের মন সব সময়েই নিষ্পাপ আর কোমল। প্রিয়জনদের জন্যেই ওরা বাঁচে আর মরে।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো', দেব বললো, 'কিন্তু আমি বলতে চাইছি, ধনী মহিলাদের জীবন বাড়ির বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান কিছুর সঙ্গে জড়িত থাকে। কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ গরীব মেয়েদের জীবনে সেসব কিছু নেই বললেই চলে।'

দেবের যুক্তিকে উপেক্ষা করেই কুমারী মন্তব্য করলো, 'নিঃসঙ্গ, বেদনাহত কোনো মেয়ে, হয়তো সে সম্পন্ন পরিবারেরই কেউ, সামাজিক আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজতে গিয়ে হয়তো সে কখনও সুখীও হলো – কিন্তু তার মানে কি এই যে তার জীবনে কোনো দুঃখ বা বেদনা নেই ?'

অস্বস্তিকর বিতর্ক এড়াবার জন্যেই ডাক্তার শঙ্কর অত্যন্ত শোভন ভাবে জানালেন এখন তাঁর বৈকালিক পড়াশোনা করার সময়। সুতরাং কুমারী এবং দেব দুজনেই ভেতরের ঘরে চলে এলো। যথারীতি দেব তার কবিতা শোনাতে রাজি হলো, যাতে ইচ্ছে হলে কুমারী পরে সেটাতে সুরারোপ করতে পারে।

প্রথম গানটা এই রকম :

দূরের আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ আর উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা।
আমন্ত্রণ জানাচ্ছে রাত্রি।
তুমি কি আসবে ?
সদ্য ফোটা ফুলের গন্ধ।
তুমি কি আসবে ?
ঋতুটা বদলে গেছে, অথচ এখনও সবুজ
　　আমার দুঃখ, এখনও রিক্ত আমার জীবন।
তুমি কি আসবে ?
এমন একটা সময় ছিলো যখন আমি ছিলাম তোমার
আর তুমি ছিলে আমার।
কোথায় উধাও হয়ে গেছে সে দিনগুলো ?
আজ আবার আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ আর উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা,
তুমি কি আসবে ?

দেব কবিতাটা শেষ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুমারী তানপুরায় সুর তুলতে শুরু করলো। ওর মৃদু হাতের স্পর্শে আশ্চর্য কোমল আর মিষ্টি সুরের প্রভাবে দেব মুগ্ধ হয়ে গেলো। হঠাৎ তীব্র একটা ব্যথায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। অন্য কারুর জন্যে লেখা তারই শব্দগুলোর মাধ্যমে কুমারী কি ওর প্রেমকে উজাড় করে দিচ্ছে তার কাছে ?

কুমারীর রূপ-লাবণ্যের প্রতি দেব উদাসীন নয়। তার প্রতি কুমারীর গভীর প্রীতিও

দেবের অজানা নয়। কুমারীকে তার সত্যিই খুব ভালো লাগে, কিন্তু ওকে সে ভালোবাসতে পারে না। তার কেবলই মনে হয় যে-পথে সে নিজে যেতে পারে না, সে-পথে ওকে যেতে বলার কোনো অধিকারও তার নেই। কিন্তু কেমন করে সে কুমারীকে এসব কথা বলবে ?

মাঝে মাঝে তার মনে হয়—দিল্লীর এই সবকিছু থেকে পালিয়ে গিয়ে দূরের কোনো নির্জন জায়গায় ডাক্তারি শুরু করে। কিন্তু কুমারীর বাবা, যে মানুষটা তার এত করেছেন, তিনি কি ভাববেন ?

তাছাড়াও রয়েছে কৃষাণ, তার একমাত্র বন্ধু, আর সরলা—যে তাকে নিজের ছেলেরই মতো দ্যাখে। তার ওপর—মানু। মানুকে সে কেমন করে ভুলে যাবে ? নিজেকে তার মাঝে মাঝে সত্যিই ফাঁদে-পড়া অসহায় মানুষের মতো মনে হয়।

পরের দিন কুমারী তাকে চায়ের আসরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। ওর নিজের ছাড়া ডাক্তার শঙ্করেরও কয়েকজন বন্ধু সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। ওঁদের অনেকেরই সঙ্গে দেবের আগে থেকে পরিচয় ছিলো।

চায়ের আসরের পরিবেশ ছিলো খুবই ছিমছাম আর শোভন. আকাশে বিশেষ একটি নক্ষত্রের মতো সবার দৃষ্টি ছিলো দেবের ওপর। ডাক্তার হিসেবে তার নিপুন দক্ষতা এবং কবি প্রতিভাকে সবাই উষ্ণ আন্তরিকতার সঙ্গেই গ্রহণ করতো।

যদিও দেবের গায়ের রঙ একেবারে ধবধবে পরিষ্কার নয়, তবু লম্বার ওপর তার ছিপছিপে গড়ন ছিলো দুর্লভ আকর্ষণীয়। তার সুন্দর মুখ, কচিৎ চাপা হাসি, প্রায়ই মগ্নবিষণ্ণতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। কুমারীর সব বান্ধবীরাই তাকে অসম্ভব পছন্দ করতো. কিন্তু তার উপস্থিতিতে কেউই বেশি দূর এগোবার সাহস পেতো না।

কিন্তু সেদিন লজ্জা আর সংকোচের গণ্ডীকে অতিক্রম করেই ওরা দেবকে উচ্ছল আন্তরিকতায় সংবর্ধনা জানালো। দেব অবাক হয়ে গেলো, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণের জন্যে নয়। অচিরেই সে আবিষ্কার করতে পারলো আজ তার জন্মদিন এবং এই ঘরোয়া উৎসবের উপলক্ষ্য সে। এতে দেব যেমন বিস্মিত হলো, অপ্রস্তুত হলো তার চাইতেও বেশি। ডাক্তার শঙ্কর, যিনি তাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করতেন. এই উপলক্ষ্যে 'শুভ জন্মদিন'-এর প্রীতি আর পশমের একটা স্যুট উপহার দিলেন।

উৎসব শেষ হবার পর. দেব কুমারীর সঙ্গে ওর ঘরে এসে বললো :

'আজ কিন্তু আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'যদি আমার অনুমতি চান. তাহলে বলবো আপনার যাওয়া হবে না।'

'কারুর অনুরোধের যদি কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে বিনা অনুমতিতে তার চলে যাবারও যথেষ্ট অধিকার আছে।'

'এটা কিন্তু অন্যায়।'

'আমাকে না যেতে দেওয়াটাও কি অন্যায় নয় ?'

'তাহলে নাই বা গেলেন ?'

অতে যদি কুমারী খুশি হয়, তাহলে যাবো না।

'আমি সত্যিই খুব খুশি হবো।'

'বেশ তোমারই জয় হলো।'

কুমারী তখন দেবকে পোশাক রাখার বড় আলমারিটার সামনে নিয়ে গেলো। আলমারি খুলে জলরঙে আঁকা দেবের বেশ বড় একটা প্রতিকৃতি নির্দেশ করে বললো, 'জন্মদিনে আমার এই উপহারটা আপনি নেবেন না ?'

ছবিটা এমনই সুন্দর যে দেবের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যকেও মুহূর্তের জন্যে ভুলিয়ে দিলো। আঁকার প্রতি কুমারী যে একটা আর্তি অনুভব করে সেটা দেব জানে, কিন্তু ওর আঁকার হাত যে এত ভালো সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিলো না। যদিও তার মনে হলো, প্রকৃত মুখটার তুলনায় ছবির মুখখানাকে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ আর বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলা হয়েছে, তবু তার মুখটাকে মনের কল্পনায় স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কুমারীকে কত দিন ধরেই না পরিশ্রম করতে হয়েছে ভেবে দেব মনে মনে সত্যিই অবাক না হয়ে পারলো না।

কিন্তু যে জিনিসটা তাকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে তুলছে, তা হলো প্রতিকৃতিতে ঝোলানো গোলাপের মালাটা। তবু সে-মনোভাবকে গোপন রেখেই দেব মৃদু ভাষে বললো :

'সত্যিই কুমারী, তোমার ছবিটা এমন সুন্দর হয়েছে যে আমি প্রশংসার কোনো ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না!'

'তার কিন্তু কোনো দরকার নেই।'

'তোমার এই প্রীতির প্রতিদানে কি দেবো বলো ? দেবার মতো আমার যে কিছুই নেই।'

'এ যে উপহার, এটা তো বিক্রির জন্যে নয়।'

'কিন্তু এই মালাটা কেন ?'

'বারে, আজ যে আপনার জন্মদিন! ভেবেছিলাম এই মালাটা আজ আমি নিজে হাতে আপনার গলায় পরিয়ে দেবো, কিন্তু ঠিক সাহস পাইনি।' নত চোখে কুমারী অস্ফুটে বললো।

দেব আরও বেশি বিব্রত বোধ করলো, ইচ্ছে হলো ওকে বলে, 'না না, ও কাজ তুমি কখনও কোরো না।' কিন্তু মুখে সে কথা বলতে পারলো না, বরং ঘুরিয়ে বললো :

'কুমারী, তুমি হয়তো জানো, কিছু দিন ধরে আমার শরীর খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। মনে হয় বায়ু পরিবর্তন করা দরকার। তাই ভাবছি অন্য কোনো শহরে একটা ডাক্তারখানা খুলবো, অবশ্য বাবুজী যদি অনুমতি দেন।' কুমারীর মতো দেবও ডাক্তার শঙ্করকে বরাবর বাবুজী বলেই ডাকে।

কুমারীর মনে হলো ওর পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে! টেবিলে ভর রেখে অসহায়ের মতো ও দেবের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো। কুমারীর সেই মর্ম-

ভেলা, গভীর দৃষ্টির সামনে নিজেকে তার অপরাধীর মতো মনে হলো, তাই ঢাকতে নামিয়ে নিলো চোখের পাতা। মেয়েদের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই কুমারী বুঝতে পারলো ও হেরে গেছে। ও জানে অত সহজে দেবের মনকে ফেরানো যাবে না। নিঃসীম হাতাশাকে চেপে রেখেই ও প্রশ্ন করলো :

'আপনার শরীর ভালো নেই ?'

'কখনও কখনও সত্যিই খুব অসুস্থ বোধ করি।'

'কোথায় যাবেন বলে ঠিক করেছেন ?'

'বলতে পারছি না। এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারিনি।'

'কবে আবার ফিরে আসবেন ?'

'তোমার বিয়েতে যেদিন আমাকে নেমতন্ন করবে।'

এমনি ভাবে কিছু দিন কাটার পর কুমারীর স্বাস্থ্য ক্রমশই ভেঙে পড়তে লাগলো। ডাক্তার শঙ্কর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, উনি স্থির করলেন পাহাড়ী কোনো জায়গায় বায়ু পরিবর্তনের জন্যে মেয়েকে নিয়ে যাবেন। তাই একদিন দেবকে ডেকে উনি বললেন :

'দেব, তুমি হয়তো জানো, কিছু দিন হলো কুমারীর স্বাস্থ্য একদম ভেঙে পড়েছে।'

'হাঁ, খুব সম্প্রতি আমি সেটা লক্ষ্য করেছি।'

'আমার মনে হয় কিছু দিনের জন্যে ওকে পাহাড়ী কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারলে হয়তো সেরে উঠবে।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'কিন্তু দেব, আমার হাঁটুর অবস্থা তুমি তো জানো··· তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমি আদৌ ওর দেখাশোনা করতে পারবো না।'

'কিন্তু, এখানে আমার এত কাজ রয়েছে ···' কিছুটা ইতস্তত করেই দেব মৃদু প্রতিবাদ করলো।

'নিশ্চয়ই, কিন্তু কুমারীর জীবন তোমার যে কোনো কাজের চাইতে বেশি মূল্যবান, দেব।'

ডাক্তার শঙ্কর এমন ভাবে কথাটা বললেন যার ওপর আর কোনো প্রতিবাদই চলে না।

সুতরাং অচিরেই যাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিতে হলো। এবারে সব চাইতে খুশি হলো কুমারী। দিনের অধিকাংশ সময় যাকে হাসপাতালের কাজে কাটাতে হবে না, সেই দেবের সঙ্গে ও সারাক্ষণই কাটাতে পারবে, একই বাড়িতে বাস করতে পারবে। কুমারীর মনে হলো এই অসুস্থতা ওর জীবনে আত্মগোপন করে থাকা এক ধরনের আর্শিবাদ।

৫

মুসৌরির বাংলো-বাড়িটা বেশ বড়। ডাক্তার শঙ্কর, কুমারী আর দেব—প্রত্যেকেরই জন্যে আলাদা আলাদা প্রশস্ত ঘর। ডাক্তার শঙ্কর অধিকাংশ সময়েই বাইরের বারন্দাটায় শুয়ে বসে

কাটিয়ে দেন। কুমারী আর দেবের প্রায় সারাটা দিনই কেটে যায় বাইরে হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়িয়ে। তারপর ওরা যখন আবার ফিরে আসে, সারাক্ষণ ডাক্তার শঙ্করের সঙ্গেই গল্প-গুজব করে।

একদিন কয়েকজন বন্ধু ওদের বাসায় এসে প্রস্তাব দিলো দূরে কোথাও বেড়াতে যাবার জন্যে। থেকে থেকে প্রায়ই ঝেঁকে বৃষ্টি আসার জন্যে কুমারীর ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু দেব নিঃশব্দে ওর হাতে একটা ছাতা গছিয়ে দিলো, তারপর সবাই হৈ-হুল্লোড় করতে করতে বেরিয়ে পড়লো।

হঠাৎ এক সময়ে বৃষ্টি থেমে যায়। কুমারী ওর হাতের ছাতাটা দেবকে দেখিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি মিছিমিছি এই বোঝাটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।'

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কুমারীর হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে দেব বললো, 'ঠিক আছে, আমরা দুজনে বরং এটাকে ভাগাভাগি করে নিই। যখন বৃষ্টি পড়বে তখন তুমি নেবে, আর যখন পড়বে না তখন আমি নেবো।'

দেবের কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। একটু পরেই আবার ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নামে। দেব ছাতাটা খুলে কুমারীর দিকে এগিয়ে দেয়। কুমারী আপত্তি জানায় :

'আমি বইতে পারবো না। ওটা আপনার কাছেই থাক. আমি বরং আপনার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাই।'

জবাবের অপেক্ষা না রেখেই কুমারী দেবের ছাতার নিচে আশ্রয় নিলো।

এক সময়ে বউ-নাচুনী বৃষ্টি থেমে গেলো। এবার কিন্তু দেব ছাতাটা নিজের কাছেই রেখে দিলো।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে, দুষ্টুমির ভঙ্গিতে কুমারী ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমার তো এখন থেকেই ভয় হচ্ছে, এই বোঝাটা না আবার আপনাকে চিরকাল ধরে বইতে হয়।'

ঠাট্টার ছলে বলা হলেও, এর গভীর তাৎপর্যটুকু উপলব্ধি করতে পেরে দেব মনে মনে স্থির করলো ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাবে। কুমারী অনুসন্ধিৎসু চোখে দেবের মুখের দিকে তাকালো, উন্মুখ হয়ে রইলো কোনো ইঙ্গিতের প্রত্যাশায়। কিন্তু দেব নিশ্চুপ, অর্থহীন সান্ত্বনায় কাউকে প্রলুব্ধ করার মানুষ সে নয়।

পরবর্তী বাঁকের মুখ থেকে সংকীর্ণ একটা পথ চলে গেছে গ্রামের দিকে। অদূরে কিছু ঘরবাড়ি। সম্ভবত সেখানে কোনো বিয়ের উৎসব চলছে। গাঁয়ের মেয়েরা নতুন কোরা কাপড় পরেছে, ঝুমঝুমিয়ে বাজছে তাদের পায়ের রূপোর মল।

কুমারী আর ওর কৌতূহলী বন্ধুরা ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে এগিয়ে গেলো। দেখলো নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী প্রাণোচ্ছল কয়েকজন গ্রাম্য তরুণী দল বেধে নাচছে আর সুরেলা গলায় গান গাইছে।

ওরা যখন আবার পাহাড়ী বাঁকটায় ফিরে এলো, কুমারীর মুখখানা তখন কেমন যেন মগ্ন আর বিষণ্ণতায় থমথম করছে। দেব ওকে রাগাবার জন্যেই বললো :

'বাবাঃ, বিয়ে দেখে ফিরে এলে কারুর মুখের চেহারা বুঝি এ রকম হয় ?'

'বিয়ে ! কোথায় বিয়ে ?' বিক্ষুব্ধ স্বরে, কিছুটা উপেক্ষার ভঙ্গিতেই কুমারী প্রশ্ন করলো।

'কেন, ওখানে ? ওদের গান-বাজনা শুনে আমার তো মনে হচ্ছিলো বোধহয় কোনো বিয়েই হচ্ছে।' বিস্ময়ের সুরে দেব বললো।

'ওটা বিয়ে নয়। ওখানে একটা বলি দেওয়া হচ্ছে। আর গ্রামের লোকেরা সবাই জড়ো হয়েছে সেই বলি দেখার জন্যে।'

'সত্যি, পাহাড়ী লোকেদের সংস্কারের আর অন্ত নেই। সামান্য একটা কিছু হলেই ওরা বলি দেয়—কখনও বৃষ্টি হলে, কখনও আবার না-হলে।'

সবাই খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

'এটা সে বলি নয়। আজ ওরা একটা মানুষ বলি দিচ্ছে। হতভাগ্য নিষ্পাপ একটা মেয়েকে বলি দেওয়া হচ্ছে একটা বুড়ো লোকের কাছে—যার অনেক টাকা আছে, যে এর আগেও বিয়ে করেছে, কিন্তু কোনো ছেলে নেই। হাতুড়ে বদ্যি ওকে বলেছে ছেলে পেতে গেলে কোনো কুমারী মেয়েকে ওর কাছে বলি দিতে হবে।' ক্ষুব্ধ, বেদনাহত সুরে কুমারী বললো। কোনো রকমে ও সামলে রেখেছে চোখের জল।

কুমারীর এক বান্ধবী বললো কনেকে ও নাকি দেখেছে—খুব সুন্দর দেখতে আর অল্প বয়েসী।

সবাইকেই কেমন যেন নিরুৎসাহ আর বিষণ্ন মনে হলো।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে কুমারী বললো, 'বুড়োটার আরও তিনটে বউ আছে।'

বন্ধুদের একজন বললো, 'কনে হয়তো সে কথা জানে না। জানলে ওকে অমন হাসি-খুশি দেখাতো না, নিশ্চয়ই মনমরা হয়ে থাকতো।'

'আর জানলেই বা ও কি করতে পারতো ?' দেব বললো।

'আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে ও বাঁচবে কেমন করে ? মরতে বসা একটা বুড়োর সঙ্গে হেসে খেয়ে কাজ করে ও সারাটা জীবন কাটাবেই বা কেমন করে !' কণ্ঠস্বরে কুমারী নিজেরই বুকের অতল থেকে উঠে আসা আর্তিকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলো না।

কুমারীকে উৎসাহ দেবার জন্যেই দেব বললো, 'আমি তো এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এই ধরণের অসম-বিবাহ সব সময় সব জায়গাতেই ঘটছে।'

'কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—যাকে ভালোবাসে না, সে রকম একটা মানুষের সঙ্গে সারাটা জীবন ও কাটাবে কেমন করে ?' গলার মধ্যে থেকে ঠেলে ওঠা কান্নার আবেগকে চেপে রেখে কুমারী আর্দ্র স্বরে বললো।

'কুমারী, প্রতিদিনই অজস্র লোক বিয়ে করছে। তুমি কি মনে করো প্রত্যেকেই পরস্পরকে ভালোবাসে ?'

'যদি ভালো না-ই বাসে, তাহলে বিয়ে করতে যায় কেন ?' এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো কুমারীর কণ্ঠস্বর।

'প্রতিবাদ না করে অধিকাংশ মানুষই তাদের ভাগ্যকে মেনে নেয়।' বন্ধুদেরই কে একজন বললো। 'এমন একটা ভাব দেখায় যেন কত খুশি।'

'হ্যাঁ, কথাটা একদিক থেকে ঠিক। যেসব জিনিস আমাদের কাছে অন্যায় বলে মনে হয়, ওরা সেটাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে মেনে নেয়। ফলে নিতান্তই একটা অভ্যেসের বশে সেটা হয়ে ওঠে ওদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একত্রে বাস করে, সন্তান হয়, হয়তো কেউ কারুর প্রতি অবিশ্বস্তও নয়। তবু ওরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে আবার নাও পারে।' কিছুটা দ্বিধা নিয়েই দেব প্রশ্ন করলো, 'এটাকে তুমি কি বলবে, কুমারী? আনুগত্য? দাম্পত্য-জীবনে বিশ্বস্ততা? কিন্তু সেটা আর যাই হোক ভালোবাসা নয়। হাসা কাঁদা, বাঁচার মতো এটাও একটা অভ্যেস।'

দেবের মুখখানা তখন লাল আর চোখদুটো সজল হয়ে উঠেছে।

গভীর, আগ্রহ আর শ্রদ্ধায় কুমারী দেবের মুখের দিকে তাকালো। অন্যেরাও বিচলিত হয়েছে, কেননা জীবনের এই কুৎসিত দিকটা কারুরই অজানা নয়, কিন্তু দেব এমন ভাবে বললো, যেন প্রকৃত সত্যটা জীবনে ওরা প্রথম শুনছে।

৬

কুমারীর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। একদিন খুব ভোরে, রাতের পোশাক পরেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সদ্য ভোরের আলো ফুটে ওঠা নিশান্তিকাটা সত্যিই ভারি সুন্দর, কিন্তু কুমারীর স্বপ্ন-জড়িমা মুখখানা শিশির-ভেজা ভোরের চাইতে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাড়িটা দীঘল পাইনের সারি দিয়ে ঘেরা, তার এপারে ছোট ছোট করমচার ঝোপ। কুমারী নিচু একটা গাছের ডাল ধরে দোল খেতে শুরু করলো। ওর সারাটা অবয়ব আশ্চর্য সজীব হয়ে উঠেছে। দোল খেতে খেতেই ও গান গাইছে। মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠস্বর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ভোরের নিস্তব্ধতায়।

কুমারীর গান দেব শুনতে পেয়েছিলো। তার সত্তার গহন থেকে কে যেন বলে উঠলো, 'আর কতদিন তুমি ওকে অন্ধকারে রেখে দেবে? ওর সুন্দর স্বপ্নগুলো একদিন না একদিন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে তো পড়বেই। তখন ওর জীবনটা হয়ে উঠবে নিঃস্ব, রিক্ত! তার চাইতে বরং ওকে সত্যিকারের পৃথিবীটাকে দেখার সুযোগ দাও। যা সত্যি ওকে তাই বলো।'

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে দেব ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু গান গাইতে গাইতে কুমারীকে ওই ভাবে দোল খেতে দেখে সে থমকে গেলো, নিমেষে উধাও হয়ে গেলো তার মানসিক দৃঢ়তা।

এমন সুন্দর একটা স্বপ্নকে সে কেমন করে হত্যা করবে? ওর স্বাস্থ্য অনেক ভালো হয়েছে, ফিরে এসেছে যত স্বপ্নিল কামনা। কেমন করে ওর হৃদয়কে সে ছিন্নভিন্ন করে দেবে? ডাক্তার শঙ্করের নিঃসঙ্গ অবহেলিত জীবনে কুমারীই একমাত্র আশা। ওর জীবনের নির্জনতম ক্ষীণ সেই আলোর শিখাটাকে নিভিয়ে দিতে তার সাহস হলো না।

কুমারী তখনও দোল খেয়ে চলেছে। এক সময়ে মুখ ফেরাতেই ও দেখতে পেলো অদূরে দেব দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন আর ফিরে যাওয়াটা শোভন হবে না। তাই কিছুটা অপ্রতিভ ভঙ্গিতেই সে কুমারীর দিকে এগিয়ে গেলো।

'দেব ?'

'বলো।'

'তুমি আমার মতো সুখী নও ?'

'আমি কেমন করে তোমার মতো সুখী হবো বলো ? তুমি যে রাজকুমারী।'

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, তুমি সত্যিকারের রাজকুমারী। আর আমি একটা পথের ভিখিরি।'

'বাঃ, চমৎকার!'

'সত্যিই আমি ঠাট্টা করছি না, কুমারী।'

'তাহলে তুমি এখন একজন যুবরাণীর কাছে ভিখিরির মতো এসেছো ? বেশ, তোমাকে কি দেবো বলো ?'

'আমি কিছু চাইতে আসিনি।'

'তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ওকে কিছু দেবে বলে এসেছো। বেশ, তাই দাও।'

'না, কুমারী, দেবার মতোও আমার কিছু নেই।'

'তাহলে ?'

'আমি তাকে বলতে এসেছি রাজকুমারীর পথ আর ভিখিরর পথ ভিন্ন।'

'কিন্তু ভিখিরি যদি রাজকুমারীর পথ অনুসরণ করেত অস্বীকার করে, তাহলে রাজকুমারীকেই বা ভিখিরির পথ অনুসরণ করতে দেবে না কেন ?'

'ওটা রাজকুমারীজনোচিত কোনো আচরণ নয়, কুমারী।'

মেলে দেওয়া হাতটা এগিয়ে দিয়ে কুমারী বললো, 'হাতটা একটু দ্যাখো না দেব, আমার হাতে কি লেখা আছে ?'

'আমি হৃদয়ের অন্তর্স্থল থেকে কামনা করি জীবনে তুমি সুখী হও।'

'না, তুমি তা চাও না।'

'ও কথা আর কখনও বোলো না, কুমারী।'

'ভিখিরি যদি অন্য পথে যায়ও, তবু তাকে ছাড়া রাজকুমারী কোনো দিনও সুখী হতে পারবে না, দেব।'

বিহ্বলের মতো দেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, নিজেকে তার অপরাধী অপরাধী মনে হলো। সে ভেবেই পেলো না কুমারীকে কেমন করে বলবে যে সে ওকে ভালোবাসতে পারে না, সে ভালোবাসে অন্য আর একজনকে।

৭

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কুমারী ওর বন্ধুদের সঙ্গে চা খাচ্ছে আর দেব তার সদ্য শেষ করা কবিতাটা ডাক্তার শঙ্করকে আবৃত্তি করে শোনাচ্ছে।

'সত্যিই তুমি খুব সুন্দর কবিতা লেখো, দেব। আমার ইচ্ছে প্রতিদিন, বাকি জীবনের শেষ কটা দিন, তোমার কবিতা শুনেই কাটিয়ে দিই।'

'বাবুজী।'

তুমি যখন আমাকে বাবুজী বলে ডাকো দেব, গর্বে আমার বুকখানা ফুলে ওঠে। তোমার মতো ছেলে আর কুমারীর মতো মেয়ে পাওয়ার জন্যে সত্যিই আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হয়।'

একটু নীরবতার পর ডাক্তার শঙ্করই বললেন, 'দেব, তুমি হয়তো জানো, তোমাকে ছাড়া কুমারীর পক্ষে বাঁচা কিছুতেই সম্ভব নয়।'

দেব মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। এই ধরনের সরাসরি কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না।

'হ্যাঁ দেব, এর জন্যে তুমি মিছিমিছি ওকে দোষ দিও না। কেননা তোমাকে ছাড়া আমি নিজেও বাঁচতে পারবো না।' স্নেহ ভরা চোখে দেবের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার শঙ্কর হাসলেন। দেব আনত চোখে তাকিয়ে রইলো মাটির দিকে।

নীরবতা ভেঙে ডাক্তার শঙ্করই প্রথম প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে দেব, বিয়েটা কবে সেরে ফেলছো বলো?'

'বিয়ে? আমি, মানে…'

'কুমারী কোনো দিক থেকেই তোমার অযোগ্য নয়।' গর্বিত স্বরে ডাক্তার শঙ্কর বললেন।

'কিন্তু আমি নিজেকে ওর যোগ্য ভাবতে পারছি না, বাবুজী!'

'ওটা তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।' ডাক্তার হাসলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণতায় ভারি হয়ে উঠলো ওঁর কণ্ঠস্বর। 'তুমি জানো না দেব, কুমারীর জীবনে সুখের মূল্য আমার কাছে কতখানি! ও যে আমার কত প্রিয়, সে তোমাকে আমি কোনো দিনও বোঝাতে পারবো না।'

'কুমারী সবার কাছেই প্রিয়, বাবুজী।'

'তাহলে আমি মিনতি করছি তুমি আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করো, দেব। এতে তুমি না কোরো না, তাহলে আমার বুক সত্যিই ভেঙে যাবে।'

তার সবচেয়ে হিতাকাঙ্খী, সবচেয়ে সুহৃদ যে পরম শ্রদ্ধেয় মানুষটি, তাকে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে দেখে দেব মনে মনে সত্যিই সংকুচিত হয়ে উঠলো।

'বেশ, আপনি যা চান তাই হবে।'

কথাটা বলেই দেব নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

সেই মুহূর্তে ডাক্তার শঙ্করকে দেখে মনে হলো সব চাইতে পরিতৃপ্ত আর সুখী মানুষ।

একটু পরে কুমারী এলো। উনি ওকে বললেন, 'কুমারী, তোমার মা অনেক দিন গত হয়েছেন। এখন তোমার যাকিছু দায়িত্ব ভার সব আমারই! এতদিন পর ঈশ্বর আজ মুখ তুলে চেয়েছেন। আমি তোমার জন্যে খুব ভালো একটা বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। সত্যিই তুমি ভাগ্যবতী কুমারী।'

'বাবুজী!'

'হ্যাঁ কুমারী, আমি সম্বন্ধটা এখুনি পাকা করে ফেলতে চাই। দেব ইতিমধ্যেই তার সম্মতি জানিয়েছে।' অহংকার আর আত্মপরিতৃপ্তিতে মেশা অদ্ভুত একটা প্রত্যাশার দৃষ্টিতে উনি মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, ভাবলেন ওর হাসি হাসি লাজুক মুখখানা বুঝি এখুনি উচ্ছল খুশিতে ভরে উঠবে।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। কুমারী কাঠের পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

'দেব কি বললো?' কোনো রকম ভনিতা না করে কুমারী সরাসরিই জিগেস করলো।

'না, তেমন কিছু নয়…বললো আমি যা বলবো ও তাই করবে।'

'তুমি ঠিক কাজ করোনি, বাবুজী।' কান্না-চাপা থমথমে গলায় কথাটা বলেই কুমারী মাথা নিচু করে রইলো।

কিছু বুঝতে না পেরে ডাক্তার শঙ্কর বিহ্বল-বিস্ময়ে মেয়ের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

'তুমি দেবকে একটুও বুঝতে পারোনি, বাবুজী।' উত্তরের অপেক্ষা না রেখে, কথাটা বলেই কুমারী দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

ডাক্তার শঙ্করের কাছ থেকে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেব বিছানায় আছড়ে পড়লো। অনেকক্ষণ সেখানে নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে সে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলো। তারপর একসময়ে আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললো:

'সমাজ ওকে নির্মম ভাবে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবু আমি তো ওর স্মৃতিকে নিয়েই খুশি ছিলাম। আজ নিষ্ঠুর পৃথিবী আমার কাছ থেকে সেই স্মৃতিটাকেও ছিনিয়ে নিতে চাইছে!'

'না, দেব; কেউ তোমার কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নিতে পারবে না।' চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে কুমারী প্রতিটা শব্দ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো।

'কে! ও, কুমারী, তুমি?'

চমকে উঠে দেব পরক্ষণেই লজ্জা পেলো। বিস্ময়ভরা অশ্রুসজল মুখখানা চকিতে ফিরিয়ে নিলো একপাশে।

'আমাকে তুমি ক্ষমা করো, দেব ?'

'না না, ও কথা বোলো না, কুমারী ! আগে তোমাকে আমি এতটুকুও সুখ দিতে পারিনি। এখন আমি তা সংশোধন করার চেষ্টা করবো।'

'না দেব, অন্য কারুর জায়গা অধিকার করার যোগ্যতা আমার নেই।'

'ব্যাপারটা তা নয়, কুমারী।'

'তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসো, দেব ?'

'হ্যাঁ, কুমারী।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিছুদিন ধরেই ভাবনাটা আমার মাথায় এসেছে।'

'সত্যিই তুমি আগে জানতে ?'

'হ্যাঁ, আর সেই জন্যেই আমি অন্য কারুর জায়গা অধিকার করার চেষ্টা করিনি।'

'কিন্তু…'

'বাবুজী ভুল বলেছে যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। সে সম্ভাবনার কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'কিন্তু কয়েকদিন আগেই তুমি আমাকে বলেছো যে রাজকুমারী আর ভিখিরির একটাই পথ অনুসরণ করা উচিত।'

'হ্যাঁ, তা বলেছি ; কিন্তু বিয়ের কথা কখনও ভাবিনি।'

'সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী যারা, বিয়ে ছাড়া কিভাবে তাদের একই পথে চলা সম্ভব ?'

'সত্যিকারের স্বামী-স্ত্রী হতে গেলে একমাত্র বিয়েটাই কি সব ?'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে বলো ?'

'আগে তুমি ছিলে দেব, এখন হলে গুরুদেব।' কুমারী হাসতে হাসতে বললো। 'প্রিয়তমের সুখের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায় সত্যিকারের ভালোবাসাকে। কোনো কিছু ছিনিয়ে নেওয়া বা কারুর স্থান অধিকার করে রাখাটা সত্যিকারের ভালোবাসা নয়। কোনো পাখিকে খাঁচার মধ্যে বন্দী রেখে তুমি তাকে সুখী করতে পারো না।'

'কুমারী !'

'হ্যাঁ দেব, সত্যিই এটা আমার অন্তরের কথা।'

'আজ তুমি অনেক পালটে গ্যাছো, কুমারী !'

'হ্যাঁ, পুরনো কুমারী ছিলো দেবের বন্ধু, দেবের সাথী। নতুন কুমারী হয়েছে দেবের শিষ্যা।'

একটু চুপ করে থাকার পর কুমারীই প্রশ্ন করলো, 'তুমি যাকে ভালোবাসো, সে নিশ্চয়ই খুব রূপসী, তাই না দেব ?'

'তুমিও কি ওকে ভালোবাসো, কুমারী ?'

'আমার প্রিয়তমের যা প্রিয়, তা আমারও প্রিয়। এ শিক্ষা আমি তোমারই কাছ থেকে পেয়েছি, দেব।'

'আর কি কি তুমি আমার কাছ থেকে শিখেছো ?'

('সত্যিকারের প্রেমের পথ কোনোদিনই কঠিন নয়। প্রকৃত প্রেমে দুঃখ, ভয় বা বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। ওগুলো কামনা-বাসনারই এক একটা অভিব্যক্তি।')

কুমারীকে দেখে মনে হলো ওর অসুস্থতা যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে, অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে ঝলমল করছে সারা মুখ।

'কুমারী,' দেব বললো, 'আজ তোমাকে অন্য দিনের চাইতে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'হবে না কেন বলো—পুরনো কুমারী যে ছিলো বোকা ভীরু, হারাবার ভয়েই সারাক্ষণ অস্থির।'

সম্ভ্রম মেশানো একটা প্রীতি নিয়ে দেব কুমারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কুমারী জিগেস করলো, 'আজ আমাকে সত্যিই ভালো দেখাচ্ছে, দেব ?'

'হ্যাঁ, দুর্লভ সুন্দর !'

'আমাকে যে তোমার ভালো লাগে এতেই আমার সুখ। এর বেশি কিছু আমার আর চাই না।'

'তোমাকে আমার বরাবরই ভালো লাগে, কুমারী। কিন্তু আমি যে অন্য কারুর।'

'কিন্তু আমার সবচেয়ে অবাক লাগছে—তুমি বাবুজীকে কেন 'হ্যাঁ' বললে। তোমার এটা বলা উচিত হয়নি।'

'আমি ওঁকে আঘাত করতে চাইনি, কুমারী।'

'তোমার এই হ্যাঁ বলাটা যে কত বড় আত্মত্যাগ।'

'না না, এটা আত্মত্যাগ নয়।'

'দেব, লক্ষ্মীটি ; তোমার ভালোবাসার কথা আমাকে বলো।'

'আলোয়, অন্ধকারে, সবখানেই দুটো চোখ কেবল সবসময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যখনই আমি যা-ই করি না কেন, অপলক চোখদুটো আমাকে সারাক্ষণই অনুসরণ করে।'

'আঃ, ভাবনাটা কি সুন্দর !' ততক্ষণে কুমারীর মসৃণ চিবুক বেয়ে নেমে এসেছে দুটি অশ্রুধারা।

একটু নীরবতার পর কুমারী বললো, 'তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওই সুন্দর চোখদুটোকে আমিও দেখতে পাই, দেব।'

'কুমারী, তুমি যে আমাকে বুঝতে পেরেছো এর জন্যে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। তোমার বাবার জন্যেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে ছোট্ট একটা মিনতি করবো—আগের মতো তুমি শুধু আমাকে চোখদুটো দেখতে দিও, সুন্দর স্বপ্নটাকে তুমি কখনও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।'

'না দেব, তুমি ইতিমধ্যেই কাউকে যা দিয়েছো, কেমন করে আমি আবার তা চাইতে পারি বলো ?'

আমার বাকি আর যাকিছু আছে, তুমি সবই নিতে পারো।'

'আমার যা চাওয়ার ছিলো, আমি সবই পেয়ে গেছি, দেব। এখন আর কেউ তা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না. এমন কি তুমিও না। তাই আমার আর বিয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'কিন্তু কুমারী, আমি যে তোমার বাবাকে কথা দিয়েছি।'

'না দেব, বিয়ের চাইতে যা বড়, যা সুন্দর—আমি তাকেই খুঁজে পেয়েছি। এখন আমি সত্যিই সুখী।'

'আমাকে কথা দাও, তুমি আর অসুস্থ হয়ে পড়বে না। আমার দিকে তাকিয়ে দ্যাখো—স্বাভাবিক মানুষের মতো আমি হাসি, খাই, কাজ করি। আমি কাউকে ভালোবাসি, বিচ্ছেদের জন্যে কখনও কখনও ব্যথাও অনুভব করি, তবু সমস্ত দুঃখকে আমি নিঃশব্দে বয়ে বেড়াই!'

আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো দেবের কণ্ঠস্বর। কুমারী মিনতি করলো :

'থেমো না দেব, বলো, আমি তোমার কথা শুনতে চাই। তুমি আমার উপাস্য। আমি তোমার মতো করেই বাঁচতে চাই।'

'কুমারী, গত কাল রাত্রে আমি একটা কবিতায় লিখেছিলাম : হে ঈশ্বর, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি তুমি আমাকে কখনও দিও না। হতাশার মধ্যেও যে আশ্চর্য আনন্দ রয়েছে, তুমি আমাকে তাই দাও। বাতাসের মতো আমি কেবল সারাক্ষণই বয়ে যেতে চাই, খুঁজে পেতে চাই কাউকে।'

'তোমার প্রিয়তমার নাম কি. দেব ?'

'মমতা।'

'কেন ঈশ্বর ওকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন ?'

'ঈশ্বর নেননি. নিয়েছে এই নিষ্ঠুর সমাজ।'

'ও এখন কোথায় ?'

'জানি না। সত্যি বলতে কি, আমি কখনও খোঁজার চেষ্টা করিনি।'

কুমারী আর কোনো প্রশ্ন করলো না। দেবের মুখে মানসিক যন্ত্রণার গভীর একটা ছায়াকে ঘনিয়ে উঠতে দেখে ও মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

'আচ্ছা কুমারী' ওকে নিশ্চুপ দেখে দেবই জানতে চাইলো. 'কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে কার যেন বিয়ের কথা হয়েছিলো না ?'

'হাঁ, তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন।'

'তুমি তাকে বিয়ে করোনি কেন ?'

'যেহেতু আমি ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িয়ে রয়েছে।'

কুমারীর কণ্ঠস্বরে লজ্জা বা দ্বিধার কোথাও কোনো চিহ্ন নেই। আজ কুমারী আর দেব উপলব্ধির এমন একটা উত্তুঙ্গ স্তরে গিয়ে পৌচেছে, যেখানে নিজেদের তুচ্ছ অস্তিত্বের কোনো মুল্য নেই।

'কিন্তু তোমার সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি, কুমারী।'

'আমার তা মনে হয় না। এখন আমার নিজেকে সম্পূর্ণ সুখী আর পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে।'

'এটা কিন্তু সত্যিই শুভ। আচ্ছা, তোমার এই সুখকে বাবুজীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারো না ?'

'কেমন করে ?' কুমারী কিছুটা অবাক হয়েই তাকালো।

'যদি ওঁকে বলো যে তুমি ওই ভদ্রলোককে বিয়ে করতে রাজি আছো।'

'কিন্তু আমি এখন বিয়ের কোনো প্রয়োজনই দেখছি না।'

'শোনো কুমারী, তোমার পরিতৃপ্তি, তোমার এই যে সম্পূর্ণতা বোধ—এর সঙ্গে বিয়ের সত্যিই কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সামাজিক জীবনে বিয়ের নিজস্ব একটা স্থান আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসা এবং আনুগত্য—দুই দিতে পারবে, যেহেতু আমাদের দুজনের সম্পর্কের মধ্যে এ দুটোর কোনো স্থান নেই।'

'দেব, আমাদের দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক, তার মধ্যে ভালোবাসার কি কোনো স্থান থাকতে পারে না ?'

'না কুমারী, অন্তত দাম্পত্য-প্রেমের কোনো স্থান নেই। বলো তো তুমি কখনও আমাকে স্বামী হিসেবে কল্পনা করেছো ?'

'না।'

'তাহলে কেন তুমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে আপত্তি করছো ?'

'যেহেতু ব্যর্থতার পরেও তুমি আর কখনও বিয়ে করোনি।'

'আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা, কুমারী।'

'কেমন করে ?' নিতান্ত সরল বিশ্বাসেই কুমারী প্রশ্ন করলো।

কোনো কথা না বলে দেব মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো। পরক্ষণেই তার মনে হলো কুমারীর কাছে গোপন রাখার চাইতে ওকে বুঝিয়ে বলাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে বললো :

'আমাদের সম্পর্কটা ছিলো আত্মার, দেহগত কোনো মিলন নয়, কুমারী। আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম সারাটা জীবন আমরা পরস্পরে একত্রে থাকবো। কিন্তু সমাজ আমাদের এই সম্পর্ককে স্বীকার করে নেয়নি, তাই আমাদের দুজনকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তবু আজও আমার কাছে অক্ষুন্ন রয়েছে ওর অভিজ্ঞান।'

'অভিজ্ঞান ! সেটা কি, দেব ?'

'ওর স্মৃতি।'

কুমারীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি থেকে নিজেকে লুকোবার জন্যে দেব মুখ নিচু করলো।

কুমারীও বিচলিত না হয়ে পারলো না। 'দেব, তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি জীবনকে উৎসর্গ করতে পারি।'

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই দেব জিগেস করলো, 'তোমার জন্যে বাবুজী যাকে পছন্দ করেছিলেন ছেলেটি কেমন?'

'ভালো। আমি অনেক দিন ধরেই ওকে চিনি। আমাদের সঙ্গে ওর কোথায় যেন একটা আত্মীয়তাও আছে। ছেলে হিসেবে ও সত্যিই খুব ভালো, কিন্তু তোমার সঙ্গে তুলনার কোনো প্রশ্নই আসে না।'

'কুমারী, তুমি ওকেই বিয়ে করো।'

'তুমি যদি চাও, আমি করবো।'

'সেটাই ঠিক কাজ হবে, কুমারী।'

'কিন্তু ধরো, বিয়ের পর ও যদি আমায় তোমাকে না দেখতে দেয়?'

'কুমারী, নিজের ওপর তোমার আস্থা রাখা উচিত। তোমার ইচ্ছে যদি আন্তরিক আর পবিত্র হয়, কোনো বাধাই তোমার পথ আগলে রাখতে পারে না।'

'কিন্তু কখনও কখনও বাধা-নিষেধ, অবিশ্বাস, সন্দেহ একটা কদর্য পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।'

'এসব তুচ্ছ জিনিসগুলো নিয়ে মাথা ঘামায় তারাই, যারা দুর্বল চরিত্রের মানুষ। তোমার মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা যাদের আছে, তাদের এসব কোনো ব্যাপারই নয়।'

কুমারী মাথা নত করে চুপচাপ বসে রইলো। অদ্ভুত একটা পরিতৃপ্তি, নিঃসীম একটা প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে ওর সারা বুক। দেব ওর হাতদুটো ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে অস্ফুট স্বরে বললো :

'নিজের ওপর বিশ্বাস কখনও হারিও না।'

৯

কিছুদিন পরেই ডাক্তার শঙ্কর, কুমারী আর দেব দিল্লীতে ফিরে এলো। আগে যার সঙ্গে কুমারীর বিয়ের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিলো, সেই সোমনাথের সঙ্গেই ডাক্তার শঙ্কর মেয়ের বিয়ে স্থির করলেন।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিনটাও এসে গেলো। জরির কাজ করা ফিঁকে বাসন্তী আর আবিররাঙা রেশমী পোশাকে কুমারীকে এমন আশ্চর্য রূপসী দেখাচ্ছে, ঠিক যেন ডানা-কাটা পরী। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে মাথা-সমান উঁচু আয়নার সামনে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাজ-গোজের টেবিলের ওপর রয়েছে ওর প্রিয়তম, সোমনাথের একটা আলোক-চিত্র। বারবারই ওর নম্র লাজুক দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ছবিটার ওপর, যেন মন্দিরে প্রতিমূর্তির সামনে মগ্ন কোনো দেবদাসী।

বিয়ের উৎসবও এক সময় শেষ হলো, এলো বিদায় নেবার সেই মুহূর্তটি। অশ্রু-সজল চোখে ডাক্তার শঙ্কর মেয়েকে আলিঙ্গন করলেন। কিন্তু কুমারীর না চোখের জল, না হাসি, কোথাও কোনো ভাবান্তর নেই। মগ্ন, বিষণ্ণ চোখে ও কেবল মাথা নিচু করে রয়েছে। এক

সময়ে ও নিঃশব্দে দেবের সামনে এসে দাঁড়ালো—হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করা, চোখ দুটো অর্ধনিমীলিত। কুমারী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো কথা বললো না। দেব শুনতে পেলো সত্তার অতল গহন থেকে উঠে আসা একটা কণ্ঠস্বর: 'বিদায়, দেব ; তুমি চেয়েছিলে, তাই আমি চলে যাচ্ছি।'

১০

দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী আর দেবের মাঝে সংকোচ আর উদাসীনতার অদৃশ্য একটা দেওয়াল ঘনিয়ে উঠেছে। বেশ কয়েক মাস ওদের দুজনের মধ্যে আর দেখা হয়নি।

কুমারী আর সোমনাথদের বাড়িটা খুব সুন্দর—যে ধরনের প্রাচুর্যের প্রয়োজন, তার কোনোটারই অভাব নেই। কুমারী শান্ত আর পরিতৃপ্ত, সোমনাথ সুখী আর গর্বিত। সোমনাথের জন্মদিনে কুমারী কাছের যে কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলো, দেব তাদের মধ্যে একজন। সেই প্রথম দেব বেশ কয়েক মাস পরে কুমারীকে দেখলো। বেশ হাসিখুশি আর ওর চেহারাতেও রীতিমতো একটা ভারিক্কি ভাব এসেছে। ওকে দেখে দেব সত্যিই খুব খুশি হলো।

দেবকে সোমনাথ বিয়ের সময় দেখেছিলো বটে, কিন্তু সেদিন তেমন আলাপ হয়নি। আজ খুব কাছ থেকে সে দেবকে দেখার অবকাশ পেলো, পাশে বসে গল্প করলো এবং বলতে গেলে এক রকম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুগ্ধ হয়ে গেলো। তাই অতিথিরা সব বিদায় নেবার পর সে দেবকে অনুরোধ করলো আরও খানিকক্ষণ থেকে যাওয়ার জন্যে।

সারাটা সন্ধ্যে ওরা একত্রে কাটালো, মাঝে মাঝেই কুমারী এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে।

সন্ধ্যে উতরে যাবার পর দেব এক সময় বিদায় নিতে চাইলো, কুমারী হাসতে হাসতে বললো রাতটা ওদের বাড়িতে কাটিয়ে যেতে হবে। দেব রীতিমতো অবাক হয়েই দুজনের মুখের দিকে তাকালো, কুমারীর চাইতে সোমনাথকে তার মনে হলো আরও আন্তরিক, আরও বেশি দৃঢ় সংকল্প। দেবকে বাধ্য হয়েই রাজি হতে হলো।

সেদিন রাত্তিরে ওরা তিনজনে কেউই ঘুমলো না, গল্প-গুজব আর হাসি-ঠাট্টাতেই সময়টা কোথা দিয়ে কেটে গেলে।

পরের দিন ভোরে কুমারী নিজে হাতে জল খাবার বানালো। অন্যান্য খাবারের মধ্যে ছিলো মটরশুঁটির সিঙাড়া। মুসৌরীতে থাকার সময়েই দেব প্রথম কুমারীর হাতে তৈরি মটরশুঁটির সিঙাড়া খেয়েছিলো। কুমারী জানতো ওটা তার প্রিয় খাবার। এখন অন্যান্য খাবারের মধ্যে মটরশুঁটির সিঙাড়া দেখে দেব মনে মনে সংকিত হয়ে উঠলো। আজ ও কেন এই খাবারটাই বানালো? ও কি তাহলে এখনও তাকে ভালোবাসে? ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে না পেরে দেব কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই সিঙাড়ার প্লেটটার দিকে হাত বাড়ালো।

'কুমারীজী, এটা কি তুমি নিজেই বানিয়েছো?' দেব স্বাভাবিক গলায় কথাটা বললেও তার মুখ থেকে উদ্বিগ্নতার ছায়াটা তখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

ব্যাপারটা কুমারীরও দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না, মনে মনে ও অবাক হয়ে ভাবলো—দেবের জন্যে কি আমার সামান্য এই মটরশুঁটির সিঙাড়াও বানাবার অধিকার নেই।

প্রাতরাশের পর দেব এবং সোমনাথ দুজনেই কাজে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হলো। কুমারী বললো আজ সন্ধ্যেবেলায় ও আর সোমনাথ সিনেমায় যাবে, দেব যেন অতি অবশ্যই ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

দেবের ফিরে যাওয়ারই ইচ্ছে ছিলো, মনে মনে যথেষ্ট দ্বিধা সত্ত্বেও, কুমারীর মিনতি এবং সোমনাথের সানির্বন্ধ অনুরোধের কাছে তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কোনো অজুহাতই টিঁকলো না।

সিনেমা দেখার পর রাত্তিরে থাকার জন্যে দেবকে কুমারী আর সোমনাথের সঙ্গে ওদের বাড়িতেই ফিরে যেতে হলো।

পরের দিনটা রোববার, সুতরাং দেবের বাড়ি ফেরার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সোমবার সকালে, দেব আর সোমনাথ সবে যখন কাজে বেরুতে যাবে, কুমারী এসে দুষ্টুমি করে হাসতে হাসতে বললো, 'কি, সন্ধ্যেবেলায় এখানে আসবেন, না সোজা বাড়ি ফিরে যাবেন ?'

ওর বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। দেব প্রতিশ্রুতি দিলো প্রতি সপ্তায় এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে যাবে।

১১

কুমারীর একটা মেয়ে হয়েছে। দেব যখন এসে পৌঁছলো, ও তখন বিছানায় শুয়ে রয়েছে। সোমনাথ বসে রয়েছে কাছের একটা কুর্সিতে। দেব বাচ্ছাকে দেখে বললো : 'ঈশ্, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে !'

যদিও কুমারী তখন অসম্ভব দুর্বল আর ক্লান্ত, তবু দেবের মন্তব্য শুনে ওর মুখখানা খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলো। দেবকে বললো বাচ্ছাটার একটা নাম ঠিক করে দিতে।

'মাধু !' এতটুকুও দ্বিধা না করে দেব বললো, যেন এই প্রশ্নের জন্যে সে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলো।

এবং বাচ্ছাটা সবার কাছে মাধুই হয়ে উঠলো।

দেব আরও ঘন ঘন কুমারীদের বাড়ীতে যেতে শুরু করলো। প্রথম প্রথম সে একাই যেতো, পরে কৃষাণের ছেলে মানুও তার সঙ্গে থাকতো।

যদিও মানু মাধুর চেয়ে অনেক বড়, তবু সে ওর সঙ্গে খেলতে ভালোবাসতো। যেহেতু মানুর আর ভাই-বোন ছিলো না এবং সারাক্ষণ বাড়িতে সে একা একা বিষণ্ণতা বোধ করতো, তাই যখনই সে বুঝতে পারতো যে দেব কুমারীদের বাড়ি যাচ্ছে, সে কিছুতেই দেবের সঙ্গ ছাড়তো না।

মানু খুব দ্রুতই বেড়ে উঠছিলো। ইতিমধ্যেই সে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। দেব নিজে

থেকেই বাড়ির নানান ব্যাপারে মানুকে সাহায্য করতো। দেব একাধারে তার কাকা, বন্ধু আর পরামর্শদাতা। দেবের সান্নিধ্যে সে বরাবরই উচ্ছল খুশিতে ভরে ওঠতো।

মানু যখনই কুমারীদের বাসায় আসতো, ও সারাক্ষণই স্নেহভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতো। যেহেতু সে দেবের প্রিয়, তাই মানু কুমারীর কাছে সমান ভাবেই প্রিয়।

তিন

বছর ছয়েক হলো জগদ্দীশ আবার বিয়ে করেছে। মমতা চলে যাবার পর থেকেই সে কেমন যেন মনমরা, খিটখিটে আর বিষণ্ণ হয়ে উঠছিলো। তার মা ছেলের জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। উনি আগে থেকেই বেশ সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিলেন এবং বিয়ের জন্যে জেদাজেদি শুরু করেছিলেন।

এ পক্ষে জগদ্দীশের কোনো সন্তান ছিলো না। তাই তার স্ত্রী প্রস্তাব করেছিলো ভাইয়ের একটা ছেলেকে দত্তক নেবার জন্যে, কিন্তু জগদ্দীশ তাতে রাজি হয়নি। তাই তার স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে।

রঞ্জু এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। ওকে যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। এখন ও কলেজে পড়ে।

প্রতি গ্রীষ্মের ছুটিতে রঞ্জু সিমলায় গিয়ে ওর বাবা আর সৎমার কাছে থাকে। জগদ্দীশ ঘোড়ায় চড়তে অসম্ভব ভালোবাসে। উত্তরাধিকার সূত্রে এই স্বভাবটা সে পেয়েছিলো তার বাবার কাছ থেকে, যিনি খেলাধুলো আর শিকার ভালোবাসতেন।

একদিন জগদ্দীশের স্ত্রীর খুব ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছিলো, ও আর বাইরে বেরুতে চায়নি। মার দেখাশোনার জন্যে রঞ্জু ঠিক করেছিলো ও-ও বাড়িতে থাকবে। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার দুর্বার নেশায় জগদ্দীশ একাই ঘর থেকে বেরিয়ে একটা ঘোড়া ভাড়া করলো।

শরিফ মেজাজেই জগদ্দীশ মাসোবরা রোড ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, হঠাৎ পেছন থেকে একটা যাত্রীবাহী বাস এসে এমন বিশ্রী ভাবে হর্ন দিলো যে ঘোড়াটা অসম্ভব ভয় পেয়ে তীরের বেগে ছুটতে গিয়ে পা পিছলে সওয়ারিসমেত আছড়ে পড়লো গভীর একটা গিরিখাদে।

বাসযাত্রীরা স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও কোনো রকমে সেই খাদের নিচে গিয়ে পৌঁছলো। ঘোড়াটা ততক্ষণে মারা গেছে আর রক্তের থৈ থৈ বন্যায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে জগদ্দীশ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে রয়েছে।

জগদ্দীশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পকেটে পাওয়া সামান্য কয়েকটা কাগজপত্র থেকে তার যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেলো, তারই ভিত্তিতে খোঁজ-খবর নিয়ে তার বাড়িতেও এই দুর্ঘটনার খবর জানানো হলো।

ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করে জগদীশকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও, তার দুটো পা-ই একেবারে চলশক্তিহীন হয়ে গেলো। অংশিকভাবে চলাফেরা করার জন্যে হাতে চালানো বিশেষ একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবনটা তার নষ্টই হয়ে গেলো। বাড়িতে বসে অফিসের সহকারীদের সাহয্যেই সে কোনো রকমে ব্যবসটা চালু রাখার চেষ্টা করলো।

জগদীশের বিষন্নতা আরও গভীর হয়ে উঠলো। তার স্ত্রী তাকে সতর্ক করে দিলো যে তার জীবন এখন অনিশ্চিত, রঞ্জুও আর কয়েকদিন পরে বিয়ে হয়ে গেলে শশুরবাড়িতে চলে যাবে, তখন দূরের আত্মীয়-স্বজনরাই তাদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবে। সুতরাং সে যেন অতি অবশ্যই স্ত্রীর ভাইপোকে দত্তক হিসেবে নেয়। নিজের মর্মান্তিক অক্ষমতার কথা ভেবে এবার হয়তো স্বামী রাজি হবে, সেই আশা নিয়েই ও বারবার জগদীশকে মিনতি করতে লাগলো।

জগদীশ কিন্তু আগেরই মতো নিজের গোঁ ধরে বসে রইলো। এই অপমান ও ব্যর্থতায় স্ত্রী রীতিমতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো, এমন কি জগদীশের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করতে শুরু করলো। কিছুদিন পরে স্ত্রী আবার বাপের বাড়ি চলে গেলো।

রঞ্জু অধিকাংশ সময় জগদীশের সঙ্গেই কাটাতো। যাতে একটা মিনিটের জন্যে তার কাছ-ছাড়া না হতে হয় সে জন্যে ও পড়াশোনাও ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু জগদীশ রাজি হয়নি।

তাই ছুটিতে রঞ্জু যখনই বাড়িতে আসতো, জগদীশের জীবনকে ও যতটা সম্ভব সুন্দর আর আনন্দোচ্ছল করে তোলার চেষ্টা করতো, বাপিকে ও খবরের কাগজ পড়ে আর গান গেয়ে শোনাতো, গাড়িটা বাগানে নিয়ে গিয়ে ঘোরাতো, ফুল তুলতো, নিজে হাতে মাটি ঠিক করে নতুন ফুলগাছের চারা লাগাতো। ওরা দুজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানেই কাটিয়ে দিতো।

রঞ্জু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলো বাপিকে মুহূর্তের জন্যেও নিঃসঙ্গ আর বিষন্নতা অনুভব করতে দেবে না, এমন কি স্বামী যদি ওকে বাপির কাছে থাকতে দিতে রাজি হয় ও কেবল তবেই বিয়ে করবে।

একদিন রঞ্জু আর জগদীশ বাগানে বসে রয়েছে। আগের দিন আনা বাগান পরিচর্যা সম্পর্কিত একটা নতুন বই ও বাপিকে দেখাচ্ছে। কিন্তু জগদীশ কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলো না। কেমন যেন একটা মগ্ন উদাসীনতায় তাকে মনে হচ্ছে অনেক দূরের মানুষ।

শেষ পর্যন্ত স্বআরোপিত নীরবতা ভেঙে জগদীশই একসময়ে বললো, 'আচ্ছা রঞ্জু, তোর সত্যিকারের মার সম্পর্কে কখনও কিছু জানতে ইচ্ছে করে না?'

রঞ্জু সংকুচিত হয়ে উঠলো। বাপির কাছ থেকে এমন সরাসরি প্রশ্ন ও আশা করেনি, যদিও ঠিক এই প্রশ্নটাই করার কথা ও বহুবার অনুভব করেছে। তাই কিছুটা বিহ্বলতায় ও নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

রঞ্জু শুধু অস্পষ্ট ভাবে এইটুকু জানে ওর মা এখনও বেঁচে আছে এবং বাপি কখনও ওর সামনে মার নাম ভুলেও উচ্চারণ করে না। ফলে এই নিষিদ্ধ ব্যাপারটাকে ও কোনো-দিন নিজে থেকে স্পর্শ করতে চায়নি। বাপিকে ও অসম্ভব ভালোবাসে, কোনোদিন মুহূর্তের জন্যেও ও কল্পনা করেনি—এমন জ্ঞানী, ধর্মভীরু, কোমল হৃদয় মানুষটা নিজের স্ত্রী তো দূরের কথা, কখনও কারুর প্রতি অন্যায় করতে পারে।

'কিরে রঞ্জু, বল না, তোর কখনও জানতে ইচ্ছে করে না ?' জগদ্দীশ আবার জিগেস করলো।

'আজ তুমি এভাবে কথা বলছো কেন, বাপি ?'

'না রঞ্জু, লক্ষ্মীটি আমায় বল।'

'আমি শুধু তোমাকে জানি···আমি জানি তুমি খুব ভালো। ব্যাস, আমি আর কিচ্ছু জানতে চাই না।' ছোট্ট মেয়ের মতো জগদ্দীশের গলা জড়িয়ে আদর করে রঞ্জু বললো।

'আমি ভালো, তুই ভালো। আর তোর মতো সুন্দর মেয়েকে যে জন্ম দিয়েছে, সেও যে ভালো হবে—সে কথা কি তোর কখনও মনে হয়নি, রঞ্জু ?'

কেমন করে রঞ্জু বলবে যে সে কথা ওর মনে হয় নি ? পাছে বাপি মনে মনে আঘাত পায় সেই ভয়ে ও কখনও একটা কথাও বলেনি।

'আচ্ছা, তুমি কি আমার নতুন বইটা দেখবে না ? ও নিয়ে তো আমরা পরেও কোনো এক সময়ে কথা বলতে পারি।' রঞ্জু উঠে গিয়ে একটা সাদা গোলাপ তুলে বাপির হাতে দিলো।

জগদ্দীশ ফুলটা নিয়ে শুকলো, চুমু দিলো। তার কেমনই যেন মনে হলো রঞ্জু ওর মার সম্পর্কে সত্যিই কিছু জানতে চায়। তাই বললো ঃ

'রঞ্জু, তোর মা সত্যিই মহৎ আর উদার প্রকৃতির। তুই যে ওর স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিস, এর জন্যে সত্যিই আমার দুঃখ হয় রে।'

'কিন্তু কেন এমন হলো, বাপি ?' রঞ্জু আর কিছুতেই নিজের কৌতূহলকে ধরে রাখতে পারলো না।

চুপ করে থেকে জগদ্দীশ যেন শব্দগুলোকে হাতড়ে ফিরতে লাগলো। অবশেষে সে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কোনো কথা বললো না। বিমূঢ়ের মতো রঞ্জু চুপচাপ বসে রইলো। ওর মনে হলো বাবা-মা দুজনেই যদি ভালো হয়, তাহলে কার দোষ ? নিয়তি কেন ওদের বিরুদ্ধে এমন ষড়যন্ত্র করলো ? কেন ওরা বিচ্ছিন্ন হলো ? অবাক হয়ে এইসব ভাবতে ভাবতেই ও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করে রইলো।

'এতোদিন যা অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, আজ তার একটা কিছু করার কথাই আমার সবচেয়ে বেশি করে মনে হচ্ছে রে রঞ্জু।'

'তুমি কি বললে, বাপি ?' জগদ্দীশের কথা সবটুকু স্পষ্ট শুনতে না পেয়ে রঞ্জু জিগেস করলো।

জগদীশ আবার চুপ করে রইলো। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেলো বিদায়বেলার মমতার শেষ কথাগুলো : 'আমাদের লক্ষ্য ভিন্ন! তোমার পথে আমি কোনোদিনই চলতে পারবো না। কোনোকিছুই আমার মনকে আর টলাতে পারবে না।'

চুপচাপ বসে জগদীশ তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলো, 'ওকে ফিরে আসতে বলার আমার কি অধিকার আছে? সুদীর্ঘ আঠারোটা বছর কেটে গেছে। আমার যৌবনও গেছে শেষ হয়ে, দেহ পড়েছে ভেঙে।' রঞ্জুর উপস্থিতির কথা প্রায় ভুলে গিয়েই জগদীশ ভেবে চললো। 'আমি জানি এই আঠারোটা বছর মমতা একটা স্কুলে কাজ করে আসছে। ওর বাবা-মা বা আমার কাছেও কখনও সাহায্য চায়নি, কিংবা ওর প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করেনি। ওর মতো মহিলা সত্যিই দুর্লভ।'

নিজেকে তার সবচাইতে বেশি অপরাধী মনে হলো, যেহেতু মমতা যখন নিরাশা আর দুঃখের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তখন সে নিজে আর একটি মহিলাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু প্রকৃতি তাকে যোগ্য শাস্তিই দিয়েছে—দ্বিতীয় পক্ষের তার কোনো সন্তান নেই!

হঠাৎ যেন নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে, রঞ্জুর দিকে ফিরে সে বললো, 'বলছিলাম—আজ মনে হচ্ছে অসম্ভব একটা কিছু করি।'

'সেটা কি বাপি?'

'আচ্ছা রঞ্জু, তুই যদি তোর মাকে ফিরে পাস তাহলে তোর কেমন লাগবে?'

'কিন্তু আমি তোমাকে হারাতে চাই না, বাপি।'

'বোকা মেয়ে, হারাবার কথা তোকে কে বলছে?'

'কিন্তু...'

'আমি বলছি, যদি সম্ভব হয়, তখন তোর কেমন লাগবে?'

'আমি জানি না।'

'প্রথমে ভেবেছিলাম ওকে না দেখে আমি বাঁচতে পারবো না, এখন মনে হচ্ছে ওকে না দেখে আমি বোধহয় মরতেও পারবো না', বুজে আসা গলায় জগদীশ বললো।

রঞ্জু নিশ্চুপ।

আগেরই মতো ধরে-আসা গলায় জগদীশ বলে চললো, 'তোর সৎমা আমাকে কোনোদিনই বোঝার চেষ্টা করেনি, আর মনের দিক থেকে আমিও ওকে কখনও গ্রহণ করতে পারিনি। মমতার মতো মহিলাকে যে ভালোবেসেছে, অন্য কোনো মহিলাকে পেয়ে সে কখনও সুখী হতে পারে না।'

রঞ্জু সস্নেহে বাবার চুলের মধ্যে আলতো করে হাত বুলিয়ে চলেছে। ও জানে কারুর একটু ভালোবাসার জন্যে বাবা কাঙালের মতো মুখ চেয়ে বসে রয়েছে। মেয়ের কাছ থেকে যতটুকু ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব, জগদীশ তার সবটুকুই পেয়েছে, কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। সে চায় মমতা ফিরে আসুক, জীবনের শেষ দিনকটাতে তাকে শক্তি আর উৎসাহ দিক।

জগদ্দীশ আবার তার ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছে। রঞ্জু তাকে আস্তে আস্তে নাড়িয়ে, জাগিয়ে, জিগেস করলো, 'মা এখন কোথায় ?'

'একটা স্কুলে শিক্ষকতা করে। ও যে ওখানে রয়েছে সেটা আমি জানতাম, কিন্তু ওর সঙ্গে কখনও দেখা করার চেষ্টা করিনি।'

'তুমি যদি কিছু করতে বলো আমি করে দিতে পারি।'

'হয়তো আমরা ওকে একটা চিঠি দিতে পারি।'

'তুমি যদি চাও, মাকে আনার জন্যে আমি কাউকে পাঠাতে পারি।'

'না রঞ্জু, না ; এতে হয়তো ও অসন্তুষ্ট হতে পারে।'

'যেহেতু তুমি নিজে যেতে পারো না, দরকার হলে আমি যেতে পারি।'

'তোর জন্যে, কিংবা তোর হয়ে ওকে এখানে আসার কথা বলতে আমি চাই না। আমি শুধু বলবো—ওকে আমার প্রয়োজন।'

রঞ্জু কাগজ কলম নিয়ে এলো। জগদীশ চিঠিটা লিখে ওর হাতে দিলো। কি লেখা আছে না জেনে, জানার চেষ্টা না করেই ও চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিলো।

তৃতীয় দিনে, জগদ্দীশ বাগানে বসে রয়েছে, রঞ্জু বাড়ির ভেতরে গেছে তার জন্যে চা আনতে। হঠাৎ জগদ্দীশের নজরে পড়লো বাগানের ফটক খুলে একজন মহিলা ভেতরে প্রবেশ করলো। কে ও ? দ্রুত হয়ে উঠলো তার স্পন্দন।

একটু ভালো করে তাকাতেই সে বুঝতে পারলো, মহিলাটি—মমতা ! সেই একই মমতা—পুরনো দিনের মতো তেমনই শান্ত, সুন্দর, সহজ আর পবিত্র। ধীরে অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে ও এগিয়ে আসছে। অধীর উত্তেজনা আর আনন্দে জগদ্দীশ একেবারে চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার ইচ্ছে হলো দৌড়ে গিয়ে ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়, কিন্তু সে উঠতেই পারলো না।

কোনো কথা না বলে, নিঃশব্দে, মমতা জগদ্দীশের পেছনে এসে দাঁড়ালো, হাত রাখলো তার কাঁধে।

কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো জগদ্দীশের চিবুক বেয়ে মমতা যে তাকে কাঁদতে দ্যাখেনি, এর জন্যে মনে মনে সে খুশিই হলো।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জগদ্দীশ বললো, 'আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না, মমতা।'

'আমাকে তোমার যখন প্রয়োজন তখন কি আমি দূরে থাকতে পারি ?'

'আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে…'

'কিন্তু তুমি আমাকে কোনোদিন বলোনি যে আমাকে তোমার প্রয়োজন।'

'মমতা, তুমি হয়তো ভাবছো আমি যখন তরুণ আর বলিষ্ঠ ছিলাম, তখন তোমাকে পরিত্যাগ করে অন্য একজন মহিলাকে বিয়ে করেছি। আর আজ, যখন আমার যৌবন

শেষ হয়ে গ্যাছে, তার সঙ্গে পাদুটোকেও খুইয়েছি, তখন তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।'

'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার আমার কোনো অধিকারই নেই, জগদ্দীশ।'

'তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি একটা দিনের জন্যেও সুখী হতে পারেনি, মমতা।'

'আমি জানি।'

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে জগদ্দীশ কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, 'আমার ভয় ছিলো, তোমার আত্ম-সম্মানে হয়তো বাধবে।'

'আমার আত্ম-সম্মান অত ভঙ্গুর নয়।'

'আমার জীবনটা মজা ডোবার মতো একেবারে শান্ত হয়ে গ্যাছে। তোমার আমার চাইতে রঞ্জুর প্রয়োজনই বেশি। তোমার আর তোমার মেয়ের মাঝখানে আমিই একটা অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছি।'

মমতার চোখদুটো রঞ্জুকে খুঁজছে। মানসচক্ষে ও মেয়ের ছবিটাকে স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো।

জগদ্দীশ বললো, 'আমার শুধু একটাই মাত্র ভয়, আমি চলে গেলে রঞ্জুকে আর দেখার কেউ থাকবে না। যদি আমার জন্যে নাও হয়, অন্তত রঞ্জুর জন্যে, মা হিসেবে ওর কাছে তোমার ফিরে আসা উচিত।'

দুদিন আগেও জগদ্দীশ বলেছিলো মেয়ের নামে মমতাকে কখনও এখানে আসার জন্যে মিনতি করবে না। অথচ:আজ জগদীশ তার মত পালটেছে, আজ সে চায় যেকোনো মূল্যে মমতাকে এখানে ধরে রাখতে।

'আমার যাকিছু আছে রঞ্জুকে যদি সব দিতে পারি আর তোমার জন্যে যদি কিছু করতে পারি, তাহলে আমি সত্যিই খুব খুশি হবো।' মমতা বললো।

হঠাৎ জগদ্দীশ মমতার হাতটা তুলে নিয়ে চুমু দিলো, তার ইচ্ছে হলো দু বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনে ওকে জড়িয়ে ধরে।

রঞ্জু যখন চা নিয়ে ফিরে এলো, ও মমতার পিঠটা দেখতে পেলো। অদ্ভুত একটা শিহরণ ঢেউ খেলে গেলো ওর প্রতিটি শিরা-উপশিরায়। ওর হাতদুটো কাঁপতে লাগলো, অশ্রু সজল হয়ে উঠলো চোখদুটো। ট্রেটা তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপর রেখে, হারানো শিশুর মতো ও দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরলো।

মমতার উষ্ণ, স্নিগ্ধগন্ধ, নরম শরীরে মুখ গুঁজে রঞ্জু অস্ফুটে বলে উঠলো, 'মা, মা গো!'

ততক্ষণে মমতারও দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা, নিজের স্পন্দিত বুকে রঞ্জুকে চেপে ধরেছে সমস্ত শক্তি দিয়ে।

সেদিন জগদ্দীশকে সবচেয়ে খুশী মনে হলো। যদিও সে পা দুটো খুইয়েছে, তবু ফিরে পেয়েছে তার মমতাকে।

ইতিমধ্যে জগ্‌দীশের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আলাদা ভাবে থাকার জন্যে খোর-পোষ আর সম্পত্তির ভাগ পাবার জন্যে আদালতে অভিযুক্ত করার ভয় দেখাতে শুরু করেছে। ও যা চেয়েছিলো. এমন কি তার চাইতেও বেশি জগ্‌দীশ ওকে দিয়ে দিলো।

প্রয়োজনের কথা ভেবে এবং যতটা সম্ভব স্বাস্থ্য দেবার অভিলাষেই মমতা প্রায় সারাক্ষণই জগ্‌দীশের সঙ্গে কাটাতে লাগলো। জগ্‌দীশের এই প্রতিবন্ধকতা তার কাছে আশীর্বাদেরই মতো মনে হলো। সে মমতার ওপর নির্ভর করতেই বেশি ভালোবাসলো।

রঞ্জুই সুখী হয়েছে সব চাইতে বেশি। বেলাশেষে যখনই ও কলেজ থেকে ফিরে আসতো, দেখতো মমতা আর জগ্‌দীশ বাগানে বসে রয়েছে। দুজনে হয় বই পড়ছে, নয়তো তাস খেলছে। পেছন থেকে এসে দুজনকেই জড়িয়ে ধরে ও চুমু দিতো।

বাবা মা দুজনেরই স্নেহ ভালোবাসা ছাড়া একটা শিশুর জীবন যে কি ভীষণ ফাঁকা আর অসম্পূর্ণ হতে পারে জগ্‌দীশ সেই প্রথম বুঝতে পারলো।

২

মাধু এখন কলেজে পড়ছে। একদিন বিকেলবেলায় ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে চায়ের আসরে যোগ দেবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। মুখ হাত-পা ধুয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও চুল আঁচড়াচ্ছে। একরাশ ঘন, কোঁকড়ানো, কালো চুল আর ভরাট, গোলগাল মুখে ওকে সত্যিই আশ্চর্য রূপসী দেখাচ্ছে। ওর শরীরের ত্বক মসৃণ আর ফিকে গোলাপী রঙের।

আড়াল থেকে মাধুকে দেখে কুমারী মুচকি মুচকি হাসলো। মাধুকে খুব সুন্দর দেখতে. ওর মার চাইতেও সুন্দরী। সামনের টেবিলটার ওপর রাখা ছবিগুলোর দিকে মাধু প্রায়ই তাকাচ্ছে। আলোক চিত্রগুলোর মধ্যে মানুরও একটা ছবি রয়েছে—যাকে বলা যায় তারুণ্য আর সৌন্দর্যের এক বাস্তব আদর্শ। মাধু একবার ছবি আর একবার আয়নাটার দিকে তাকাচ্ছে—যেন দুজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।

মাধুর অলক্ষ্যেই কুমারী মন্ত্রমুগ্ধের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও জানে, দেবকাকুর আদর্শ প্রতিচ্ছবি হিসেবে মানুকে মাধু পছন্দই করে।

কোন্ শাড়ীটা পরবে পছন্দ করতে না পেরে মাধু চেঁচিয়ে মাকে ডাকলো। কুমারী এসে সুন্দর জরির পাড় বসানো একটা শাড়ী বেছে দিলো। মানাতে পারে এমন একজোড়া চপ্পল বেছে নিয়ে মাধু শাড়ী পরতে শুরু করলো। ঘুরতে ঘুরতে প্রায়ই ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে মানুর ছবিটার ওপর। এক সময়ে হঠাৎই ও দুহাত দিয়ে মার গলাটা জড়িয়ে ধরলো। কুমারী চাপা ঠোঁটে হাসতে হাসতেই ওর মসৃণ কাঁধে চুমু দিলো। মাধুকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন কোনো উর্বশী।

'বুঝলি মাধু, আমাদের একটা চোরের খোঁজ করতে হবে।'

'চোর!'

'হ্যাঁরে, একটা চোর—যে এসে আমার সবচেয়ে মূল্যবান যে সম্পদ, এই মাধুকে নিয়ে যাবে।'

উচ্ছল খুশিতে মাধু রাঙা হয়ে উঠলো। ইচ্ছে হলো ওর নিজের অতীত, এমন কি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মাকে কিছু জিগেস করে।

'আচ্ছা মামণি, তুমি বাপিকে কেমন করে পছন্দ করেছিলে ?'

কুমারী স্তম্ভিত হয়ে গেলো। এমন সরাসরি ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন যে মাধু করতে পারে ও আশা করেনি। ঠিক সেই মুহূর্তে ও কিছু বলতে পারলো না, অথচ মেয়ে বড় হয়েছে, তার প্রশ্নকেও এভাবে এড়িয়ে যাওয়াটা ওর উচিত নয়।

'আমার ব্যাপারটা ছিলো অন্য রকম। প্রতিটা যুগের প্রতিটা কালের তার নিজস্ব এক একটা ধ্যান-ধারণা থাকে, যা আগের যুগ বা কালের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রাচীন কালে এমন একটা সময় ছিলো যখন সয়ম্বর সভায় মেয়েরা তাদের স্বামীদের পছন্দ করে নিতে পারতো। তারপর সমাজের রীতি পালটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মনে করা হতো নিষ্প্রাণ এক একটা আসবাবপত্রের মতো। সে রীতিও আবার আজকাল অনেক পালটে গেছে। কয়েক বছর আগেও মেয়েদের স্বামী পছন্দের যে সুযোগ ছিলো না, এখন তোদের নিশ্চয়ই সে অধিকার আছে।'

কুমারী যে বিচলিত হয়েছে সেটা ওর ধরে আসা কণ্ঠস্বর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেলো। মাধুকে ও যখন এইসব কথা বলছিলো, ওর সমস্ত অতীত মুহূর্তের জন্যে ভিড় করে এসেছিলো মানসপটে। স্বামী হিসেবে সোমনাথ নিঃসন্দেহে ভালো। কুমারী স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করে নিয়েছে, তাকে দিয়েছে ওর উষ্ণ আর বিশ্বস্ত ভালোবাসা। আদর্শ স্ত্রী হিসেবে ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই অন্য দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো ওর চোখের সামনে। কুয়াশার ঘন সমুদ্রের মধ্যে থেকে অস্পষ্ট একটা মূর্তি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছে। মূর্তিটা দেবের। মনে মনে কুমারী অস্বস্তি বোধ করে। স্বামী হিসেবে দেবকে ও কোনোদিনই কল্পনা করেনি। অথচ কেনই জানি ওর বুকের অতল থেকে উঠে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস।

ভাবাবেশ কাটিয়ে কুমারী যখন নিজেকে ফিরে পেলো, দেখলো মাধু নির্নিমেষ চোখে মানুর ছবিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তখনই মানুর প্রতি মেয়ের মনোভাব বুঝতে ওর কোনো অসুবিধে হলো না।

'মানু সত্যিই খুব ভালো ছেলে, তাই কিনা বল্ ?' হাসতে হাসতে কুমারী জিগেস করলো।

'বারে, আমি কেমন করে জানবো ?' মুখে প্রতিবাদ করলেও, সদ্য যৌবন-প্রস্ফুটিত হৃদয়ে প্রথম প্রেমের স্পর্শে মাধু রাঙিয়ে উঠে মার বুকের মধ্যে মুখ লুকলো।

৩

১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জীতে একটি অবিস্মরণীয় বছর। দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিভাগের ফলে সারাটা উপমহাদেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। অধিকাংশ শহরই ছটফট করছে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার শিকারী থাবার মধ্যে. ঘর-বাড়ি সব জ্বলছে, হত্যা করা হচ্ছে নিরীহ মানুষদের।

সরলা জানলার সামনে বসে রয়েছে। ওর উদ্বিগ্ন-কাতর মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। বারে বারেই ও চোখ তুলে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ দেবকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেখে ও কিছুটা স্বস্তি আর সান্ত্বনা পেলো।

'কি ব্যাপার বৌদি. এই অসময়ে হঠাৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো ? কোনো খারাপ কিছু খবর নয় তো ?'

'তোমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলুম অনেকক্ষণ আগেই। আসতে এত দেরি করলে কেন ?'

'বৌদি. একজন রুগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিলো. ওকে না দেখে আসার আমার কোনো উপায় ছিলো না।'

'থাক, থাক : তোমাদের ওই হাসপাতাল আর রুগী—ওসব কথা আমাকে আর কিচ্ছু বোলো না।'

'কি ব্যাপার বৌদি, তোমাকে উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ? কৃষাণ কোথায় ?'

'ও কার সঙ্গে যেন দেখা করতে গ্যাছে। এখন তুমি আমাকে বলো তো. মানু কত রাত পর্যন্ত হাসপাতালে কাজ করে ?'

'মানু ! কেন. কি হয়েছে ওর ? ও রোজই হাসপাতালে আসে. হাতে-কলমে শেখা এবং গবেষণার জন্যে ওর হাসপাতালে আসাটাও প্রয়োজন ··কিন্তু তা বলে ওকে আমি কোনো-দিন বেশি রাত পর্যন্ত থাকতে বলিনি···'

'সন্ধ্যেবেলায় কারফিউ হবার ঠিক একটু আগে ছাড়া ও কোনোদিনই ঘরে ফেরে না।'

'কিন্তু হাসপাতাল থেকে তো তার অনেক আগেই বেরিয়ে যায়। এসব কথা তুমি আগে আমাকে বলোনি কেন ?'

'আমার বরাবরই ধারণা—পড়াশোনার জন্যে ওকে ওই সময় পর্যন্ত বুঝি হাসপাতালে থাকতে হয়। কিন্তু আজ···'

'কোথায় সে ?'

'বাড়িতে নেই। বলেছে আজ রাতটা ওর এক বন্ধুর বাড়িতে কাটাবে। ও বেরিয়ে যাবার পর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বইয়ের মধ্যে থেকে এই চিঠিটা পাই। চিঠিটা যেমন অদ্ভুত. তেমনি রহস্যময়। এই নাও, তুমি নিজে পড়ে দ্যাখো।'

দেব চিরকুটটা পড়লো : 'লাল কুচা···আজ ..সব ঠিক আছে।'

ভেঙে পড়া গলায় সরলা বললো, 'লাল কুচা তো মুসলমানপ্রধান জায়গা। সময়টা খারাপ বলেই আমি এত ভাবছি। উঃ, যা মারামারি কাটাকাটি হচ্ছে। মানু হয়তো সেখানেই তার বন্ধুর বাড়িতে গ্যাছে। হয়তো তার বন্ধুই মুসলমান। এ রকম একটা ভয়ংকর সময়ে কাউকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও বৌদি, আমাকে এক মিনিট একটু চিন্তা করতে দাও।'

কান্নার রুদ্ধ আবেগে সরলার গলা তখন বুজে গেছে, অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে চোখদুটো।

'আমি যাচ্ছি বৌদি। দেখি যদি ওকে খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু দেব, তুমি এখন কোথায় যাবে? আর কারফিউ-এর রাতে ফিরবেই বা কেমন করে?'

'তুমি কিছু ভেবো না, বৌদি। দেখো আমি ঠিক ব্যবস্থা করে নেবো।'

'না দেব, আমার জন্যে এখন তোমাকে লাল কুচায় যেতে হবে না। বিশেষ করে এ সময়ে ও রকম একটা জায়গায় যাওয়াটা ঠিক হবে না।' দুহাত দিয়ে দেবের কোটটা আঁকড়ে ধরে সরলা আপত্তি জানালো।

দেব মিনতি করে বললো, 'না বৌদি, আমাকে যেতে দাও।' তারপর দ্রুত সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

৪

তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে সান্ধ্যআইন। লোকজন সব ত্রস্ত পায়ে ঘরে ফিরছে। লাল বাতির সংকেতে দেবের গাড়িটা থমকে রয়েছে।

ঠিক পাশেই দাঁড়ানো অন্য একটা গাড়ি থেকে ডাক এলো, 'হ্যালো, ডক্টর দেব!'

দেব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো তারই একজন রুগী গাড়ি থেকে হাত নাড়ছে। প্রত্যুত্তরে দেব বললো, 'হ্যালো!'

'এ রকম একটা বাজে সময়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

লাল কুচার দিকে নির্দেশ করে দেব বললো, 'রুগী দেখতে।'

'লাল কুচায়। না না ডক্টর দেব, দোহাই আপনার ...আজ রাতে অন্তত ওদিকটায় যাবেন না।' শ্রদ্ধা ভয় আর বিস্ময় মেশানো অদ্ভুত একটা গলায় লোকটি বললো।

দেব কোনো জবাব দিলো না, শুধু ছোট্ট করে হাসলো।

'বিশ্বাস করুন ডক্টর দেব, আমি আপনাকে সত্যি বলছি— আজ রাতে ওই অঞ্চলে দারুণ একটা গণ্ডগোল হবার সম্ভাবনা রয়েছে।'

ইতিমধ্যে আলোর সংকেত বদলে গেছে এবং গাড়ির সারি যে যার গন্তব্যের দিকে বাঁক নিয়ে আবার তীরের বেগে ছুটতে শুরু করেছে।

হিন্দুরা যাতে লাল কুচায় প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্যে সৈন্য মেতায়েন করা হয়েছে। কারফিউ পাশ দেখিয়ে এবং মারাত্মক খারাপ অবস্থার একজন রুগীকে দেখতে যাচ্ছে বলায় দেবকে ভেতরে যেতে দেওয়া হলো।

বড় একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে দেব ডাকলো ঃ

'বসির আমেদ !'

দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে বসির আমেদ বাইরে বেরিয়ে এলো। দেবকে দেখে ও বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

অস্ফুটে বললো, 'ডাক্তার দেব, আপনি !'

'হ্যাঁ', কোনো রকমে জবাব দিয়ে দেব ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলো, বৈঠকখানার কাছে পৌঁছে জিগেস করলো 'রুগী কেমন আছে ?'

'তেমন উদ্বিগ্ন হবার মতো কিছু নয়। যদিও খুব দুর্বল, তবু আগের চাইতে অনেক ভালো আছে।'

'এ রকম অসময়ে আমাকে দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছো ? আসলে তোমাদের পাড়াতেই একটা রুগী দেখতে এসেছিলাম। অবস্থা খুব খারাপ, এখুনি অপারেশন করা দরকার। কিন্তু যন্ত্রপাতি এনে সব ঠিকঠাক করতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগবে। যেহেতু ফিরে যেতেও পারছি না, তাই ভাবলাম এই ফাঁকে তোমার ছেলেটাকে একবার দেখে আসি।'

'সত্যিই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, ডাক্তারবাবু,' হাসতে হাসতেই বসির আমেদ বললো। কিন্তু সে হাসির মধ্যে লুকনো ছিলো প্রচ্ছন্ন একটা কৃত্রিমতা।

পরিস্থিতিটা দেব ভালো ভাবেই বুঝতে পারলো। সময় কাটানোর জন্যেই সেখানে বসে বসির আমেদের ছেলের সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করতে লাগলো।

হঠাৎ রুক্ষ, বদখচ চেহারার জনা চারেক মুসলমান ঘরের ভেতরে ঢুকলো। ওদেরই একজন জানতে চাইলো :

'কি ব্যাপার ডাক্তার সাহেব, হঠাৎ অনুগ্রহ করে এত রাত্রে এ অঞ্চলে রুগী দেখতে এলেন যে ?'

'এটা অনুগ্রহের কোনো ব্যাপার নয় : রুগী দেখতে আসাটা আমার কর্তব্য।' নম্র ভাবে অথচ নিজের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখেই দেব ধীরে ধীরে জবাব দিলো।

পাশ থেকে অন্য একজন মন্তব্য করলো, 'রুগী, না খুন হওয়া কাউকে ?'

আশ্চর্য শান্ত এবং এতটুকু বিচলিত না হয়ে দেব বললো, 'খুনের সঙ্গে ডাক্তারদের কোনো সম্পর্ক নেই, তাদের কাজ সারিয়ে তোলা।'

'এত রাত্তিরে আপনি আর ডাক্তার নন, সেও আপনার রুগী নয়। আপনি হিন্দু, সে মুসলমান।'

'রুগী হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, ডাক্তারেরা চিরকালই ডাক্তার।'

'এ তো আপনি সেই পুরনো গল্প বললেন, ডাক্তার সাহেব। আজ রাতটার জন্যেই যে আপনাকে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন, কিসের জন্যে ?' কিছুটা অবজ্ঞার ভঙ্গিতেই দেব প্রশ্ন করলো।

'যেহেতু হিন্দুরা বরাবরই হিন্দু আর মুসলমানরা বরাবরই মুসলমান।'

'কিন্তু হিন্দু হোক বা মুসলমানই হোক-বরাবরই সে মানুষ।'

'আমরা আপনার কাছে কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখতে চাই।'

বসির আমেদই সবচেয়ে অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লো, স্খলিত স্বরে কোনো রকমে সে বললো, 'এই ধরনের দুর্ব্যবহারের জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ডাক্তারবাবু। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, এ ঋণ আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারবো না। কিন্তু আজ রাতে আমি আপনার জন্যে কিছু করতে সত্যিই অক্ষম।'

'তোমরা যদি খুঁজতে চাও আমি প্রস্তুত। কিন্তু আপত্তিকর কিছু যদি পাওয়া না যায় তাহলে আমাকে কি পুরস্কার দেবে বলো ?'

'আল্লার নামে শপথ করে বলছি, কোনো ক্ষতি না করে আপনাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় যেতে দেবো।'

দেব হাসতে হাসতেই কোটটা খুলে ফেললো।

'খুব বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা খবর পেয়েছি, হিন্দুরা আজ রাতে আমাদের এই অঞ্চলটা আক্রমণ করবে। কিন্তু তাতে আমরা ভয় পাই না...' ডাক্তার দেবের পকেট হাতড়ে হাতড়েই ওদের একজন সদর্পে ঘোষণা করলো।

তন্ন তন্ন করে সবকিছু খোঁজার পর পাওয়া গেলো ৩৫ টাকা, একটা চাবি, কারফিউ পাস আর একটা টেস্ট টিউব।

'আপনি জানেন না ডাক্তার সাহেব, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম একটা হিন্দুকেও জ্যান্তো ফিরতে দেবো না।' একজন বললো।

'কিন্তু শুধু মাত্র আপনার ক্ষেত্রেই আমরা এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো', তৃতীয় জন জানালো। ওরা সবাই কোনো না কোনো এক সময়ে দেবের রুগী ছিলো।

'এখন ইচ্ছে করলে আপনি যেতে পারেন। আপনাকে আমরা রাস্তার মোড় পর্যন্ত পৌঁছেও দিতে পারি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু যেহেতু তোমরা বললে আজ রাতে আক্রমণের ভয় রয়েছে, সেই জন্যে এখানে থেকে আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই।'

'সাহায্য করতে চান! আমাদের জন্যে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, ডাক্তার সাহেব। আমাদের অঢেল অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। দেখতে চান ? আসুন আমাদের সঙ্গে।' দুজন ওদের গোপন অস্ত্রাগারে ডাক্তারকে নিয়ে যাবার জন্যে ইঙ্গিত করলো, কিন্তু দেব তার কুর্সিতে গ্যাঁট হয়ে বসে রইলো।

সুতরাং নিজেদের অধিকারে থাকা অস্ত্রের তালিকা ওরা নিজে থেকেই দিয়ে গেলো—

পিস্তল, বন্দুক, ছোরা, ছুরি ইত্যাদি।

'তাহলে এবার আপনিই বলুন—অস্ত্র না থেকে আপনি আমাদের কি ধরনের সাহায্য করতে পারবেন, যখন আমাদের এত অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে?' ওদের একজন বিদ্রূপের ছলেই দেবকে বললো।

'ওসব অস্ত্রশস্ত্রের অর্থই তো ধ্বংস', দেবও অবজ্ঞার ভঙ্গিতেই জবাবটা ফিরিয়ে দিলো, 'ও দিয়ে খুন জখম করা যায়, কিন্তু সারানো যায় না।'

'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব, আপনি নিজে হিন্দু হয়ে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই, কেন নয়? সাহায্য করাই তো আমার কাজ।'

'মুসলমানদের খুন জখম করার হিন্দুদের সংক্রামক ব্যাধিটাও কি বন্ধ করা আপনার কাজ নয়?'

'আমার ক্ষমতার মধ্যে থাকলে আমি নিশ্চয়ই তা করতাম।'

এমন সময় বাইরের রাস্তায় প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলো। ঘরের ভেতরের সবাই এক সঙ্গে চমকে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই বিহ্বলতা কাটিয়ে ওরা প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো। হাতের কাছে যে যা পেলো তাই নিয়েই ছুটে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়।

রীতিমতো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হিন্দু মুসলমান দুটো দলেরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেব চিৎকার করে উঠলো, 'থামো!'

'কাকু!' ভিড়ের মধ্যে থেকে ভেসে এলো পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর।

সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে পরবর্তী মুহূর্তটার জন্যে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা ইঁট ছুঁড়লো। ইঁটটা এসে লাগলো একজন তরুণ হিন্দুর কাঁধে। চকিতে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো উত্তেজনার আগুন। উভয় পক্ষই উভয়কে আক্রমণের জন্যে ধেয়ে এলো।

দেব দ্রুত হিন্দুদের সামনে নিজেকে মাটিতে আছড়ে ফেলে গম্ভীর গলায় হেঁকে উঠলো, 'আমাকে পায়ে না দলে তোমরা কেউ কাউকেই আক্রমণ করতে পারবে না।'

কেউ আর এগুলো না। যার যার অস্ত্র একই ভাবে ধরা রইলো।

দেবের উচ্চারিত শব্দগুলো মুসলমানদের ওপর বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ার মতো দ্রুত কাজ করে গেলো। যে লোকটা ইঁট ছুঁড়েছিলো ওরা তাকে ধরে দেবের সামনে নিয়ে এলো।

'ডাক্তার সাহেব, আজকের এই মারামারিটা না ঘটতে দেওয়ার জন্যে আমরা সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই যে, অপরাধীকে আপনার কাছে ধরে এনেছি।'

হিন্দু মুসলমানের সশস্ত্র দুটো দলই তখন দেবকে ঘিরে ধরেছে, কিন্তু কেউ ওকে স্পর্শ করতে সাহস পাচ্ছে না।

'তুমি অপরাধ করেছো', লোকটার দিকে ফিরে দেব বললো। লোকটা কোনো কথা

না বলে নিঃশব্দে মাথা নিচু করলো। 'এর জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। শুধু তুমি নয়, তোমাদের সবাইকেই অস্ত্রশস্ত্র পুলিসের কাছে জমা দিতে হবে। যদি তোমরা তা না দাও, পুলিস এসে তোমাদের সবাইকেই ধরবে। তার মানে গ্রেফতারের সংখ্যা কত দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছো ?'

দেবের কথায় সবাই সম্মতি জানালো।

হিন্দুরা ফিরে গেলো, দেবও রইলো ওদের সঙ্গে।

৫

পরের দিন ভোরে মানু যখন ঘরে ফিরে এলো, তাকে অসম্ভব ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিলো। তাকে ওই অবস্থায় দেখে সরলা যেমন মনে মনে চিন্তিত হয়ে উঠলো, তেমনি সে ভালো ভাবে ঘরে ফিরে এসেছে দেখে খুশিও হলো। সারাটা রাত জেগে কাটানোর পর কৃষাণ এই সবে ঘুমতে গেছে।

মানু একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো। এক ধরনের ব্যর্থতায় তখন তার নিজেরই লজ্জা করছিলো। তার আদর্শ, তার বিশ্বাস, তার বন্ধুবান্ধব, তার দল, সবই কেমন যেন শূন্য আর অর্থহীন হয়ে গেছে। দেবই তাদের মুখোশ খুলে দিয়েছে সম্পূর্ণ নির্মম ভাবে।

অল্প কয়েকদিন আগে অত্যন্ত সংগোপনেই মানু 'ধর্ম নিরাপত্তা সংঘ'-এ যোগ দেয়। এই গুপ্ত সংগঠনের অস্তিত্ব এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সে কাউকে, এমন কি তার সবচাইতে যে প্রিয়, সেই দেবকাকুকেও কিছু বলেনি।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে মানু একটা কুর্সিতে গিয়ে বসলো। অন্ধকারেই সে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে লাগলো।

সরলা মানুর ওপর ঝুঁকে নির্নিমেষ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো। ইচ্ছে থাকলেও ও মনে মনে স্থির করেছিলো—কোথায় রাত কাটিয়েছে সে প্রশ্ন করে মানুকে ও অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলবে না।

'মানু ?'

'মার্মাণ !'

'তোকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন রে ?'

'মনমরা নয় মার্মাণ, খুব ক্লান্ত বলেই ও রকম দেখাচ্ছে,' কুর্সির মধ্যেই সোজা হয়ে বসে মানু হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওটা যে কৃত্রিম হাসি সেটুকু বুঝতে সরলার কোনো অসুবিধে হলো না।

'মার্মাণ, আমি একটু দেবকাকুর ওখান থেকে ঘুরে আসছি, ফিরে এসে চা খাবো।'

'দেব হয়তো এখনও ঘরেই ফেরেনি। গত রাত্তিরে ও তোকেই খুঁজতে বেরিয়ে ছিলো।'

'আমাকে খুঁজতে বেরিয়ে ছিলো !'

'হ্যাঁ, আমিই ওকে পাঠিয়েছিলুম।'

'কেন?'

'আমি তোর বইয়ের মধ্যে থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলুম। তাতে লাল কুচার কথা উল্লেখ ছিলো। ওটা মুসলমানদের অঞ্চল, তাই আমি খুব চিন্তা করছিলুম।'

মানু মার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, ঘুম-জড়ানো চোখদুটো কোনো রকমে মেলে রইলো শূন্য দেওয়ালটার দিকে। দেবের শব্দগুলো যেন এখনও তার কানে বাজছে: 'আমাকে পায়ে না দলে তোমরা কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না।' মানুর বুকের অতল থেকে কে যেন বলে উঠলো: 'তোমাকে বাঁচাবার জন্যেই দেব নিজের জীবনকে পর্যন্ত উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত ছিলো।'

'জানো মামণি, দেবকাকু মানুষ নয়, দেবতা!' কথাগুলো বলেই মানু মার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

৬

মানু যখন দেবের বাড়িতে পৌঁছলো, দেখলো তার কাকু বিছানায় শুয়ে রয়েছে—ব্যথায় ম্লান মুখ, দূরে কোথাও উধাও হয়ে যাওয়া দৃষ্টি। দেবকাকু কি তাহলে অসুস্থ? মানু অবাক হয়ে গেলো।

'কাকু!'

'ও, মানু।'

'এ সময়ে বিছনায় শুয়ে রয়েছো যে?'

'ও কিছু না, এমনিই উঠতে ইচ্ছে করছে না।'

'কাকু।'

'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না রে, মানু।' ডাক্তার দেবের চোখদুটো তখন অশ্রুতে সজল হয়ে উঠেছে।

'কা-কু!'

ছোট্ট ওই দুটো শব্দ ছাড়া মানু আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারলো না।

'আজকের কাগজ দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'ট্রেনের খবরটা পড়েছিস?'

'হ্যাঁ, যাত্রীদের সবাইকেই কেটে ফেলা হয়েছে।'

'উফ্ঃ, মানুষ যে এত নিচে নেমে যেতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারছি না। ধর্ম আজ এমনই একটা অন্ধ গোঁড়ামিতে পরিণত হয়েছে যে মানুষকে পশুর চাইতেও নিচে নামিয়ে দিয়েছে।'

দেব আর মানু যখন হাসপাতালে এসে পৌছলো, গত রাত্তিরের দাঙ্গার ফলে আহত ও নিহত মানুষে সমস্ত জায়গাটা একেবারে ভরে গেছে।

৭

সরলা নিজের ঘরে বসে মানুর জন্যে একটা সোয়েটার বুনছে। মাঝে মাঝেই কি যেন একটা ভাবনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে ওর বোনার কাজ, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছে কাঁটাটা।

কৃষাণ আর দেব যখন ঘরে ঢুকলো, সরলা তখনও কাঁটাটা কামড়ে ধরে বসে রয়েছে। দেব কিছুতেই হাসি চাপতে পারলো না, বললো :

'বৌদি, তুমি কি ভাবছো আমি বলে দেবো ?'

'বলো ?'

'ঘরেতে একটাও মিষ্টি বা ফল নেই, তুমি কি দিয়ে আমাকে আপ্যায়ন করবে সেই চিন্তাতেই একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছো।'

'মোটেই তা নয়। ঘরেতে যথেষ্ট মিষ্টি আর ফল রয়েছে। অন্য আর কি হতে পারে চেষ্টা করে দ্যাখো।'

'তাহলে তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো —এই শীতে আমার একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারো কি না।'

'সেটাও কোনো সমস্যা নয়। আধ পাউণ্ড উল আর সামান্য একটু মেহনত···

'তোমার কাছে ব্যাপারটা যত সামান্যই হোক, আমার কাছে ওটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সমস্যা, অন্তত যার ঘরে সোয়েটার বোনার মতো কেউ নেই,' হাসতে হাসতে দেব সরলার একপাশে সোফার ওপরে বসলো। কৃষাণ নিজে বসলো ওদের মুখোমুখি একটা কুর্সিতে।

আগের সেই একই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে দেব বলে চললো, 'না বৌদি, শোনো, সত্যিই আমি যদি কোথাও সোয়েটার কিনতে যাই, দোকানদার নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাববে লোকটার বউ নেই।'

'কিংবা এখনও হতে পারে—ছেলেপুলে নিয়ে বউ এমনই ব্যস্ত যে বেচারি স্বামীর জন্যে একটা সোয়েটার বোনারও সময় পায় না।'

'বেশ, এবার বৌদি সত্যি করে বলো তো তুমি কি ভাবছিলে ?'

'আমি ভাবছিলুম তুমি যদি সত্যি সত্যিই বিয়ে না করো তাহলে বাকি জীবনটা আমি তোমার সোয়েটার বুনে, সার্টের বোতাম লাগিয়ে আর মোজা রিপু করেই কাটিয়ে দেবো।'

'সত্যি।'

'সত্যিই। এবার বলো তুমি বিয়ে করবে কিনা ?'

'আমি ভাবছি কোনটে সস্তা হবে—বোতাম সেলাই করার বউ, না আংশিক সময়ের দর্জি ?'

'কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছো দেব, বোতাম সেলাই করার বউও তোমার ছেলেপুলের মা হতে পারবে।' যেন নিজের কথা বলার নিপুণতায় কৃষাণ নিজেই হেসে উঠলো।

'তখন দেখবো যে আবার ছেলের সার্ট থেকেই বোতাম উধাও হয়ে যাচ্ছে, ফলে ওর বোতাম সেলাই করার জন্যে আমাকে আর একটা বউ নিয়ে আসতে হবে। তার মানেই বিরাট একটা পরিবার, অসম্ভব খরচ। না বাবা, তার চাইতে বরং অল্প খরচে আমার এই বৌদিই ভালো।'

ভেতরে ঢুকে হঠাৎ দেবকে দেখতে পেয়ে মানু বলে উঠলো, 'কাকু।'

'কে আগে জন্মেছে—তোর কাকা, না বাবা ?' ঠাট্টার ছলেই কৃষাণ গম্ভীর গলায় মানুকে জিগেস করলো। 'আমাকেও তুই কিছু না কিছু একটা বলতে পারতিস ?'

কৃষাণের অভিযোগের ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। মানুকে দেব দুহাতে টেনে নিয়ে সোফায় তার পাশে বসালো।

'এ পরিবারে দেখছি একমাত্র আমিই, যার সোফাতে বসার কোনো অধিকার নেই। আমি যেন কোনো অচ্যুত, পুরনো একটা চেয়ারে আলাদা বসে রয়েছি।' কৃষাণ বললো।

সরলা হাসতে হাসতেই জবাব দিলো, 'তোমার এই অচ্যুতদশা ঘোচাবার জন্যে গান্ধীজীর কোনো শিষ্যকে তো ডাকলেই পারো ?'

তারপর হঠাৎ, প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই সরলা বললো, 'যখন তোমরা এলে, তখন কি ভাবছিলুম সত্যিই জানতে চাও ?'

কৃষাণ আর দেব দুজনেই সমবেত স্বরে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ বলো।'

'আজ সকালে কাশ্মরী গেটে লীলাদের বাড়িতে একবার দেখা করতে গিয়েছিলুম। সেখানে উদ্বাস্তুরা রাস্তার ওপর কিভাবে বাস করছে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না··· মাথার ওপর একটা ছাউনি পর্যন্ত নেই। জরাজীর্ণ পাঁচিলের গায়ে কাপড় দিয়ে ভাগ করা ছোট ছোট খুপরির মধ্যে সমস্ত পরিবার গাদাগাদি করে বাস করছে···' অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে সরলার গলার স্বর বুজে এলো।

'ও তো কিছুই নয়,' মানু বললো, 'উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের দুর্দশা যদি একবার কাছ থেকে দেখতে পেতে, তাহলে তোমার কয়েকদিনের জন্যে খিদে ঘুম বলে কিছু থাকতো না !' উত্তেজনায় তরুণ মানুর গলার স্বর তখন কাঁপছে। 'ওই যে অতগুলো লোক, ওদের কি হবে ? ওরা আশা করে রয়েছে জাতীয় সরকার ওদের জীবন, ওদের দেশটাকেই পালটে দেবে—ওরা আবার সুন্দর ভাবে বাস করতে পারবে। কিন্তু সরকারী দফতরগুলোতে ঘুষ বা তদারকি ছাড়া কোনো ফাইল এক ইঞ্চিও নড়ে না।'

'ট্রেনের ইঞ্জিন পালটালেই তো আর ট্রেনটা নতুন হয়ে যায় না,' কৃষাণ মন্তব্য করলো। 'স্বাধীন ভারতের আকাশে তেরাঙা পতাকা উড়ছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ কয়েকটা শতাব্দী ধরে দেশবাসীর দাসত্বের এই যে মানসিকতা, তাকে পালটাতে গেলে অনেক সময় লাগবে। কোনো পরিবর্তনই একদিনে ঘটানো সম্ভব নয়।' একটু নীরবতার পর কৃষানই বললো,

'তবু তো আমি বলবো—আমার দেশের ভাগ্য অত্যন্ত সুযোগ্য এবং দক্ষ কয়েকজন নেতার হাতেই ন্যস্ত রয়েছে।'

'কিন্তু কালো-বাজার কি জিনিস এর আগে আমরা কখনও জানতুম না,' কিছুটা ক্ষুব্ধ স্বরেই সরলা বললো, ভেতরের চাপা উত্তেজনার রেশটাকে ও তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'কিন্তু এই জঘন্য রীতিটা সর্বত্রই এমন বিশ্রীভাবে চালু হয়ে গ্যাছে যে কেউ আর এখন এটাকে তেমন খারাপ চোখে দ্যাখে না। লোকেও নির্দ্বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনা করে, ওরা সবার সামনেই খোলাখুলই বলে—আগে বলুন কত কালো-টাকা দেবেন ?'

'আমরা অধিকাংশ মানুষ এই জঘন্য জিনিসটাকে সমর্থন করি বলেই এটা আজ এত প্রশ্রয় পেয়েছে, নইলে কোনোদিনই এটা এমন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না।' মতাদর্শের দিক থেকে যাকে আশাবাদী বলা চলে, সেই কৃষানই ব্যাঙ্গের ছলে কথাগুলো বললো। 'কিন্তু পক্ষপাতিত্ব আর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে আমরা যদি সবাই সবায়ের সমালোচনা করি, তাহলে কিন্তু দেশ এগুবে না। প্রত্যেকেরই ধৈর্য ধরা উচিত। ঠিক সময়ে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, হয়তো হবে,' স্বামীকে বাধা দিয়ে সরলা দ্রুত বলে উঠলো, 'কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—পাকিস্থানীরা যে সব মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, সরকারের উদ্ধার করা সেই সব মেয়েদের নিজের বাড়ির লোকজনরাই বা নিতে অস্বীকার করছে কেন ? ওরা তো ওদেরই কারুর না কারুর মেয়ে বা বোন ! তাছাড়া ওই সব হতভাগ্য মেয়েদের জীবনে যা ঘটেছে তার জন্যে কি ওরা দায়ী ?'

মানু মা:কই সমর্থন করে বললো, 'আজ পর্যন্ত বেশ কয়েক হাজার মেয়েকে পাকিস্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।'

'আর কত হাজার এখনও পাকিস্থানে রয়েছে ?' কৃষাণ জিগেস করলো।

'যত উদ্ধার করা হয়েছে তার চাইতে বেশ কয়েকগুণ বেশি। কাগজে দেখলাম ওইসব হতভাগ্য মেয়েদের সন্তানদের দেখাশোনার ভার সরকার নেবে।'

'কিন্তু অসহায় মায়েদের তথাকথিত অপরাধের জন্যে তাদের সন্তানরাই বা কেন শাস্তি পাবে ?' অনেকটা স্বগতোক্তিরই মতো উত্তেজিত স্বরে দেব বললো।

'নিশ্চয়ই.' কৃষাণ তার বন্ধুকে সমর্থন করলো, 'বিশেষ করে সেই সব মেয়েদের, যাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাদের ওপর জোর করা হয়েছে।'

'ওদের একমাত্র অপরাধ যেহেতু সামাজিক প্রথায় ওরা বিবাহিত নয় !' কথাগুলো বলতে গিয়ে ব্যথায় ম্লান হয়ে উঠলো দেবের কণ্ঠস্বর।

কিন্তু তার কথায় কেউ প্রতিবাদ করলো না। কেননা তার ভাবনা, তার যন্ত্রণাকে বুঝতে কারুরই কোনো অসুবিধে হলো না।

দেব তখন ঘুমোবার তোড়জোড় করছে, বিছানায় শুয়ে বইটার শেষ দুটো পৃষ্ঠায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে চলেছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেলো।

মানু ডাকলো, 'কাকু।'

তাড়াতাড়ি উঠে দেব দরজা খুলে মানুকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলো।

'কাকু, যদিও তুমি আমার প্রায় বাবার বয়েসী, তবু তুমি সব সময়েই আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছো।'

যদিও দেব মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলো, তবু মৃদু হেসে মানুর পিঠ চাপড়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো, তারপর জিগেস করলো :

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো মানু। কিন্তু আজ হঠাৎ এ প্রশ্ন করছো কেন ?'

'আজ আমি একটা গুজব শুনলাম। জানি না ব্যাপারটা কদ্দূর সত্যি। বাপিকে এ সম্পর্কে কিছু জিগেস করতে পারলাম না, তাই ভাবলাম তোমাকে আমি নিঃসঙ্কোচে জিগেস করতে পারি।'

কথা কটা কোনো রকমে বলে মানু বাচ্চা ছেলের মতো দেবকে আঁকড়ে ধরলো। ওই ভাবে কয়েক মিনিট চুপচাপ পড়ে থাকার পর মানু হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো।

'কাকু, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যি করে বলো তো···আমি জানি এর মধ্যে যদি কোথাও কোনো সত্যি থাকে, তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারবে, কেননা তুমিই বাপির সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শুনলাম আমি নাকি বাপির নিজের ছেলে না, বাপি আমাকে শুধু মানুষ করেছেন। কথাটা কি সত্যি, কাকু ?'

দেব বিস্মিত, প্রায় স্থবির হয়ে গেলো। কপালে জমে উঠতে শুরু করেছে গুঁড়ি গুঁড়ি ঘাম।

'কাকু, তুমি চুপ করে আছো কেন ? জবাব দাও। এখন আমি তো আর সেই অবুঝ ছোট্ট ছেলেটি নই যে অপ্রীতিকর কিছু প্রকাশ পেলে ভীষণ মুষড়ে পড়বো। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক শিখেছি, অনেক পেয়েছি কাকু—আর সেই জন্যেই আমি আজ একজন উন্নত মনের মানুষ, সবকিছু মোকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত।'

'মানু, এ গুজব যদি সত্যিও হয়—কৃষাণ বা সরলার তোমার বাবা-মা হতে আপত্তিটা কোথায় ?'

'না কাকু, ওঁরা চিরকালই আমার বাবা-মা হয়ে থাকবেন। আমার দিক থেকে ওঁদের প্রতি ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার কোথাও কোনো তারতম্য হবে না। শুধু যে জিনিসটা আমার খারাপ লাগছে···'

'বলো ?'

'যদি সোমনাথজী প্রকৃত ব্যাপারটা কখনও জানতে পারেন, কিংবা মাধু বুঝতে পারে যে ওর কাছে কোনো কিছু গোপন করেছি, তাহলে আমার সমস্ত স্বপ্নই ধুলোয় মিশে যাবে।'

একটু নীরবতার পর মানুই জিগেস করলো, 'আচ্ছা কাকু, তুমি উপেন্দ্রকে চেনো ? মাধুর সঙ্গে ও একই ক্লাশে পড়ে, ওদের বাড়িতে প্রায়ই যায়।'

'হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু আমার ধারণা ওটা তো একটা বখাটে ছেলে !'

'ওই উপেন্দ্র যে শুধু আমার বাবা-মার নামে মিথ্যে মিথ্যে বলে বেড়াচ্ছে তাই নয়, মাধু আর ওর বাবা-মার সামনেও আমাকে অপমান করার চেষ্টা করছে।'

একটু থেমে মানু আবার বলতে শুধু করলো, 'একবার সে মাধুর বন্ধু রঞ্জুকে ভোলাবার একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলো। তার অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে রঞ্জুর কোনো ধারণাই ছিলো না এবং তার মিষ্টি কথাকে ও সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলো। উপেন্দ্র কথা দিয়েছিলো নিজের গাড়িতে করে রঞ্জুকে বাড়িতে পৌঁছে দেবে। ঠিক সেই সময় আমিও ওদের কলেজে মাধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উপেন্দ্রর গোপন উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে মাধু খুবই মুষড়ে পড়েছিলো এবং আমাকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও সাহায্য করার কথা বললো। আমরা তখন একটা ট্যাক্সি নিয়ে উপেন্দ্রের গাড়িটাকে অনুসরণ করলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাকে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ধরলাম। আমাকে দেখে উপেন্দ্র তো রাগে একেবারে জ্বলে উঠলো এবং সেই দিন থেকে আমি হয়ে উঠলাম তার চিরকালের শত্রু। আমার ধারণা সে এখন আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে।'

'ওই গুজব শোনার পর তোমার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা হয়েছে, আগে আমাকে সেই কথা বলো ?'

'আমার মধ্যে কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।'

'আর তোমার বাবা-মা, তুমি কি এখনও ওদের সমানভাবে ভালোবাসো ?'

'আগের চাইতেও বেশি। আমি ওঁদের দেবতারই মতো শ্রদ্ধা করি।'

'তাহলে এ পৃথিবীতে তো তোমার ভয় করার কিছু নেই। উপেন্দ্র কি আর কিছু বলেছে ?'

'ও বলেছে আমি নাকি কোনো অবিবাহিত মেয়ের সন্তান।'

'এতে তোমার কি মনে হয়েছে ?'

'আমি কিন্তু সত্যিই বিস্মিত হয়েছি এবং কিছুটা হতাশও হয়ে পড়েছি।'

'আর তোমার সেই মার সম্পর্কে কি ধারণা, যে এ পৃথিবীতে তোমাকে জন্ম দিয়েছে ?'

'ওঁর প্রতি আমার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে।'

'ধরো ওঁর সঙ্গে যদি তোমার কখনও দেখা হয়।'

'ওঁকে উজাড় করে দেবো আমার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা, যে ভালোবাসা থেকে নিষ্ঠুর পৃথিবী ওঁকে বঞ্চিত করেছে। আমি চেষ্টা করবো ওঁর দুঃস্বপ্নের অতীতকে ভুলিয়ে দিতে। ওঁর জীবনের বাকি দিনগুলো যাতে সুখের হয় আমি তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবো।'

'মানু, সোনা ছেলে আমার, আমি ঠিক এইটাই তোমার কছে থেকে আশা করেছিলাম।'

'কাকু, তুমি জানো না আমি তোমাকে কত শ্রদ্ধা করি—তোমার দৃষ্টিভঙ্গি, তোমার

নীতির সঙ্গে কতটা একাত্ম। যে আমি তোমার কাছ থেকে এত কিছু শিখেছি, তুমি কি করে আশা করতে পারো যে আমি তোমাকে হতাশ করবো ?'

'মানু, তোমাকে ঘিরে এই যে গোপনীয়তা এর জন্যে তোমার বাবাও খুব উদ্বিগ্ন। ও শুধু অপেক্ষা করছে সেই মুহূর্তটার জন্যে যখন তুমি সবকিছু শোনার জন্যে প্রস্তুত হবে।'

একটু চুপ করে থেকে দেব কি যেন ভাবলো, তারপর জিগেস করলো, 'তোমার আগামী জন্মদিনটা যেন কবে ? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—সামনের মাসেই। সে দিনই কৃষাণ তোমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। তখন তুমি নিজেই স্থির করবে তুমি ওদের বাবা-মা হিসেবে গ্রহণ করবে কি করবে না।'

'না না, কাকু ; ও কথা তুমি আর কখনও বোলো না। ওঁরাই আমার বাবা-মা এবং চিরকালই তাই থাকবেন। আমি যে ওঁদেরই সত্তার একটা অংশ, এর জন্যে আমি গর্বিত।'

'শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম।'

'আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবছি আমার বাবা কে ?'

'যিশু খৃষ্টের বাবা কে কেউই জানে না, মানু।'

'আমি সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি—সবাই আমার মার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলো, মাকে আপমান করেছিলো, মাকে অভিসম্পাত দিয়েছিলো।'

দেব আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না, অসহ্য যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো। সে তখন অবশ্যম্ভাবী এমনই একটা মুহূর্তের মুখোমুখি হয়েছে—যখন তার ভাবনা, তার চেতনা, তার অস্তিত্বের ওপরেই নিজের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার আদর্শ, তার বিশ্বাস—যখন সে নিজেই নিজের অসহায়তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে।

'মানুষ নয়, ও দেবী !' এমনভাবে দেব গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, যেন ভেতরের রুদ্ধ আবেগটাকে সে কোনো রকমে সামলাবার চেষ্টা করছে।

'তুমি ওঁকে চেনো ? উনি কি এখনও বেঁচে আছেন ?' উদ্দীপ্ত আশায় মানু কাতর মিনতি জানালো, 'দোহাই কাকু, আমাকে তুমি বলো।'

সঙ্গে সঙ্গে দেব বুঝতে পারলো বোকার মতো তার আভাস দেওয়াটা ঠিক হয়নি, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই শেষ সুযোগের আশাতেই সে বললো :

'মানু, আমাকে আর কিছু জিগেস কোরো না। শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, আর জীব-কে বয়ে যেতে দাও তার নিজের ধারায়।'

'বেশ, তাই হবে কাকু।' মনে মনে কিছুটা হতাশ হলেও মানু আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলো না।

মানু আর দেব দুজনেই বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো, মগ্ন হয়ে রইলো যে যার ভাবনার অতলে তলিয়ে গিয়ে। অথচ ওরা কেউই তেমন অনুতপ্ত বা তিক্ততায় ভরে ওঠেনি, বরং এতে ওদের আত্মিক সম্পর্ক আরও নিবিড়, আরও গভীর হয়ে উঠলো।

একটু পরে মানু বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

আলোটার জন্যে দেব বিব্রত বোধ করতে লাগলো, যেন নিজেরই চোখের সামনে তার সব কিছু নগ্ন, একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। মানু কি সত্যিই মাধুকে পাবে না? নিজের মনেই সে অবাক হয়ে ভাবলো।

উঠে গিয়ে সে আলোটা নিভিয়ে দিলো, তারপর বিছানায় হাঁটুর ওপর মাথা রেখে চুপচাপ বসে রইলো। আপন মনেই অস্ফুষ্ট স্বরে বললো, 'মানু, আমার জীবনের কাহিনী অসম্পূর্ণই রয়ে গেলো। কামনা করি তোমার জীবন আরও সুখের হোক।'

৯

মাধুর বিয়ের জন্যে কেনা যৌতুকগুলো কুমারী যখন গোছগাছ করতে ব্যস্ত, ঝি এসে খবর দিলো একটা ছেলে ওর সঙ্গে করতে চায়। হয়তো সোমনাথ কিংবা মাধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ভেবে ও ঝিকে আরও ভালো ভাবে জেনে আসার কথা বললো। ঝি ফিরে এসে জানালো - না ওকেই খুঁজছে। তাই কুমারী বৈঠকখানায় এসে দেখা করলো।

'হঠাৎ এভাবে বিরক্ত করতে আসার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' আগন্তুক ইতস্তত করলো। 'তবে আমার মনে হয় এতে আপনারই উপকার হবে।'

'আপমার নামটা জানতে পারি কি?'

'উপেন্দ্র। মাধুর সঙ্গে এ বাড়িতে এর আগেও কয়েকবার এসেছি। আমরা একই ক্লাসে পড়ি।'

'ও, আচ্ছা! বেশ, তোমার কি বলার আছে বলো?'

'আপনি কি মাধুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ, অন্য সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গ্যাছে, শুধু যা পাকাদেখাটাই হয়নি।'

'আমি মাধুর বন্ধু, জীবনে ও সুখী হোক আমি শুধু এটাই চাই।'

'বেশ তো, কি বলতে চাও বলো?'

'কি ভাবে বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি শুধু মাধুর ভালোর জন্যেই...'

'নিশ্চয়ই। তোমার যা বলার আছে বলো। আমি তো তোমাকে কোনো রকম সন্দেহ করছি না।' শান্ত স্বরে কথাগুলো বললেও কুমারী তখন মনে মনে সত্যিই অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

'আসলে কি জানেন, আপনাদের মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়েকে একজন লোচ্চার বেজম্মা ছেলে বিয়ে করবে, আমি সেটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।'

'আমি তো তোমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছি। ওইসব খারাপ খারাপ শব্দ ব্যবহার করার সত্যিই কি কোনো দরকার আছে?'

'প্রকৃত সত্যি যেটা আপনি তো আর জানেন না, কিন্তু আমি জানি।'

'তোমার কাছে কি কোনো প্রমান আছে?'

'হ্যাঁ। মানু শেঠ কৃষাণ লালের নিজের ছেলে নয়। উনি তাকে শুধু মানুষ করেছেন।'

'কিন্তু ধরো তোমার কথাই সত্যি, তবু এতে অন্যায়টা কোথায়? জন্ম থেকে শেঠজী মানুকে লালন পালন করেছেন এবং এখনও পর্যন্ত নিজের ছেলের মতোই তাকে স্নেহ করেন।' বিবেচকের মতো নিজের ওপর আস্থা রেখেই কুমারী ধীরে ধীরে কথাগুলো বললো।

'গরীব বা দুস্থ কোনো পরিবারের ছেলে হলে আমার কিছু বলার ছিলো না। কিন্তু ও অবিবাহিত একটা মেয়ের ছেলে। ওর বাবা-মা দুজনেই বেঁচে আছে। মার নামটা ঠিক জানি না তবে বাবার নাম জানি। আপনি যদি চান বলতেও পারি।'

'কে?'

'ডাক্তার দেব!'

'কি বললে!' কুমারীর দু চোখে ফুটে উঠলো অবিশ্বাস আর শুদ্ধ বিস্ময়।

'মানুর মা যখন সন্তান-সম্ভবা হন, ডাক্তার দেব তখন ডাক্তারি পড়ছিলেন। মেয়েটির বাবা-মা এ বিয়েতে রাজী হননি। কয়েক মাস পরে, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং কুমারী মেয়েটিকে অসম্ভব তাড়াহুড়োর মধ্যেই খুব বড় লোক একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। ডাক্তার দেব গোপনে ছেলেটিকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষাণ লালকে দেন। ওঁদের তখন কোনো সন্তান ছিলো না।'

মন দিয়ে শুনতে শুনতেই কুমারী তখন ভাবনার অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো।

উপেন্দ্র বললো, 'আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু এই গোপন রহস্যের সাক্ষী রয়েছে একজন নার্স, যে সবচেয়ে বড় ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তার দেবের কথাবার্তা সব আড়াল থেকে শুনতে পেয়েছিলো। অসুস্থতার সময়ে হাসপাতালের ওই নার্সটিই আমার মাকে দেখাশোনা করতো। আমার কাকার কোনো ছেলেপুলো ছিলো না বলে উনি মানুষ করার জন্যে একটা বাচ্ছা খুঁজছিলেন। নার্সটি কাকাকে কথা দিয়েছিলো ডাক্তার দেবের বাচ্ছাটাকে পাইয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। কিন্তু পরের দিনই ও হাসপাতালে গিয়ে দেখলো যে ছেলেটি রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গেছে! যদিও এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটে আমি তখন প্রায় শিশু, তবু নার্সের প্রতিটা কথা আমি ভালো ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি এর একটা বর্ণও মিথ্যে নয়।'

উপেন্দ্র বিদায় নেবার পর বিহ্বলতার রেশটুকু কাটিয়ে উঠতে কুমারীর বেশ খানিকটা সময় লাগলো বটে, তবু নিজেকে ওর কেমন যেন সুখী আর আলোকিত মনে হলো।

১০

দেবের বেশ বড় একটা আলোকচিত্রের সামনে কুমারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছবিটার মুখের দিকে তাকিয়ে ও মুচকি মুচকি হাসছে।

'দেব, তোমার জীবনের যাকিছু গোপনীয়তা তুমি চিরটাকালই আমার কাছে গোপন করে রেখেছিলে। আজ আমি সব সব বুঝতে পেরেছি। তুমি বরাবরই বলতে—তোমার প্রিয়তমাকে হারিয়েছো নির্মম ভাবে, কিন্তু ওর স্মৃতি, ওর অভিজ্ঞান এখনও রয়েছে তোমার কাছে। অথচ সেটা যে কি কোনোদিনই তুমি বলতে চাওনি।

'আজ আমি সেই অভিজ্ঞানকে আবিষ্কার করেছি। তুমি কোনোদিনই আমার ভালোবাসা, আমার অনুরাগকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারোনি, তাই তোমার গোপনীয়তাতেও আমাকে কোনো অংশ নিতে দাওনি। আজ আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি। তোমার সন্তান, তোমার পবিত্র প্রেমের প্রতীক, আজ আমারও সন্তান হতে চলেছে।'

কুমারী সামনের সোফাটায় এসে বসলো, কিন্তু তখনও ও নিজেই নিজের মনে বলে চলেছে :

'দেব, এত দিন তুমি তোমার প্রেমকে যেভাবে লালন করে এসেছো, সত্যিই তার কোনো তুলনা হয় না। তোমার ভালোবাসার মৃতদেহটা আগলাতে আগলাতেই সারাটা যৌবন, প্রায় সমস্ত জীবনটাই কেটে গেলো। যা অন্য মানুষ আর কখনও দিতে পারে না, তোমার সেই অনন্য ভালোবাসা যে পেয়েছে, সে নারী ভাগ্যবতী, সে নারী নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়া! তবে সবচাইতে যা করুণ তোমার আর তোমার সন্তানের কাছ থেকে সে নারীকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে নির্মম ভাবে।'

দীর্ঘক্ষণ নিশ্চুপ থেকে কুমারী কি যেন ভাবলো, তারপর আবার স্বগত স্বরেই বলে চললো :

'দেব, তুমি যদি বলো ও কোথায় আছে, আমি গিয়ে ওর পায়ের ধুলো নেবো, ওকে পুজো করবো, বললো একান্তই আপন করে তোমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে ও কত ভাগ্যবতী!'

হঠাৎ মনে পড়ায়, ওর আপ্লুত আনন্দকে ছাপিয়েও কুমারীর ঠোঁটদুটো সহসা কেঁপে উঠলো।

'উপেন্দ্র চেয়েছিলো মানুকে আমার সামনে কলঙ্কিত করে তুলতে, কিন্তু তার পরিবর্তে ও যে আমাকে কি বিপুল আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে ও নিজেই জানো না। মাধুকে আমি বলবো - মানু সাধারণ কোনো মানুষ নয়, সে একজন দেবদূতেরই সন্তান, যতদিন বাঁচবে ও যেন তাকে পুজো করে। দেবের সন্তানকে যে ও বিয়ে করতে যাচ্ছে এর জন্যে মাধু সত্যিই দুর্লভ ভাগ্যবতী!'

দরজায় হঠাৎ টোকা দেওয়ার শব্দে কুমারী সচকিত হয়ে উঠলো। এমন অসময়ে আবার কে আসতে যাবে? সে কি নিয়ে আসবে—আনন্দ, না দুর্ভাগ্য? দ্বিধা ভরেই কুমারী দরজা খুললো। দেব। অস্বাভাবিক উদ্বিগ্নতায় তার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। কুমারীর মন পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই সে এসেছে। প্রকৃত সত্যটা শোনার পর ওর মনে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় সেটাই সে অবাক হয়ে ভাবছিলো। কিন্তু কুমারীকে দেখে মনে

হলো ও সুখী। তবু কুমারী অপ্রস্তুতে পড়তে পারে এমন কোনো প্রশ্নই সে করতে পারলো না। বরং কুমারীই নিজে থেকে বললো :

'বিয়ের এখনও এক মাস বাকি আছে এবং সেটা খুব একটা কম দিন নয়। মানু তোমার সন্তান, আমি চাই আজ থেকে সে আমারও সন্তান হোক।'

দেব বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো, তবু খুশিতে উদ্বেল হয়ে উঠলো সারা বুক। কেমন করে কুমারী প্রকৃত সত্যটা জানতে পারলো সে-সম্পর্কে সে কোনো প্রশ্নও করলো না।

১১

দেখতে দেখতে মাসটা কেটে গেলো, মাধু আর মানুর বিয়েও হয়ে গেলো। ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে করে ওদের বিদায় নেবার সময় অদ্ভুত একটা অনুভূতি কুমারীকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। ওর মনে হলো এমন দুর্লভ সুখী ও বোধ হয় জীবনে আর কখনও হয়নি।

কৃষাণদের বাড়ীতে পৌঁছে মাধু আর মানু বাবা মাকে প্রণাম করার সময় দেবকেও প্রণাম করলো। নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে দেবের দুচোখ জলে ভরে উঠলো তার মনে হলো মমতাও যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক তার পাশটিতে, ওর হাতটা জড়ানো রয়েছে তার হাতে। যে রক্ত দিয়ে মানু গড়া, সে রক্তে যে মমতারও সমান অধিকার রয়েছে।

১২

একদিন রাত প্রায় এগারোটা, দেব সবে শুতে যাবে. হঠাৎ তার শোবার ঘরের দরজাটা খুলে গেলো আর মানু প্রায় আছড়ে পড়লো তার কোলের মধ্যে।

'বাপি! বাপি! বাপি!' আদুরে গলায় অস্ফুটে মানু বলে উঠলো।

দেব অবাক হয়ে গেলো। মানু কেমন করে জানতে পারলো?

'বাপি, সারা জীবন তুমি আমার কাছে থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলে, কিন্তু এখন আর পারবে না।'

চোখের জলে ভিজে উঠেছে মানুর সারা মুখ। দেব একটা কথাও বলতে পারলো না। স্নেহভরে সে কেবল মানুর পিঠে হাত বুলিয়ে চললো।

'বাপি তুমি এত বড়, এমন মহৎ. তুমি তোমার সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছো। একজন স্বামী, একজন বাবা হিসেবে সমাজ তোমাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু ওইসব সামাজিক নিয়ম ক্ষুদ্র তুচ্ছ সব মানুষদের জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো বাবাই তোমার মতো এমন কঠিন ব্রত পালন করতে পারেনি।'

দেব, এতক্ষণ যে মর্মর পাথরের প্রতিমূর্তিরই মতো চুপচাপ বসে ছিলো, এখন যেন আবার তার প্রাণের স্পন্দনটুকু খুঁজে পেলো। এতক্ষণ সে অশ্রুর উৎসধারাকে সামলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু এখন আর পারলো না। তার আতপ্ত চিবুক বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর ধারায়। জীবনে এই প্রথম সে কাঁদছে।

'তোমাকে এসব কথা কে বললো, মানু ?'

'শেঠজী নিজে। আজ আমার পঁচিশতম জন্মদিন। ঘণ্টা খানেক আগে উনি আমাকে ডেকে বললেন, 'তোমারই জন্যে দেবজী তার জীবনকে উৎসর্গ করেছে! জীবনের সবটুকু দিয়ে ও তোমাকে ভালোবাসলেও কখনও নিজের ছেলে হিসেবে তোমাকে ডাকতে পারেনি। তোমাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে আমার আশা-আকাঙ্খা, আশা করি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। কিন্তু তোমার ভালোবাসা থেকে দেবজীকেও বঞ্চিত করা উচিত নয়।'

'কৃষাণ সত্যিই মহৎ-হৃদয়!' অভিভূতের মতো মৃদুভাষেই দেব বললো।

অল্পক্ষণের জন্যে দেব এবং মানু দুজনেই নিশ্চুপ হয়ে রইলো, এক সময়ে মানু বললো 'বাপি তুমি আমাকে তোমার কথা বলো।'

মানুর আবদার শুনে দেব হেসে ফেললো, বললো :

'সেটা ১৯২৪ সাল। আমি তখন ডাক্তারি পড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে পেহালগামে বেড়াতে গেছি। সেখানেই তোমার মার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। আমাদের তাঁবুটা ওদের বাড়ির খুব কাছেই। প্রথম দেখাতেই আমরা দুজনে দুজনের প্রেমে পড়ে যাই। ওরা খুব বড়লোক আর আমি গরীব। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে নিবিড় করে ভালোবাসতে পেরেছিলাম।

'প্রায় সারাক্ষণই আমরা দুজনে একসঙ্গে কাটাতাম, পাহাড়ে জঙ্গলে উপত্যকায় ঘুরে বেড়াতাম. ঝরণা আর হ্রদের জলে সাঁতার কাটতাম। একটা মুহূর্তের জন্যেও কখনও মনে হয়নি একদিন আমাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। চন্দন সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ওর অনেক ছবি তুলেছিলাম। প্রতিটা ছবিতেই ওকে মনে হতো তুষারের দেবীর মতো। ওর নামটা ছিলো অদ্ভুত, আমার উচ্চারণ করতে কষ্ট হচ্ছে দেখে ও নিজেই নিজেকে মমতা বলে ডাকতে শুরু করেছিলো।'

সজল চোখের দৃষ্টি আনতে করে দেব বলে চললো, 'ঈশ্বর সাক্ষী রেখে আমরা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু গভীর ভালোবাসা আর তারুণ্যের চঞ্চলতায় পৃথিবীর চোখে আমরা যে অবিবাহিত সে কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! মমতা তখন সন্তান সম্ভাবা, অথচ ওর বাবা-মা কিছুতেই আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এমন কি জানতে পারার পর থেকে মমতাকে একটিবারের জন্যেও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি। কেবল লোক মারফৎ একটা সংবাদ পেয়েছিলাম আমি নাকি ওঁর মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়েছি. উনি আমার মতো গরীব ছেলের সঙ্গে কোনো সর্তেই মেয়ের বিয়ে চান না।'

স্বতস্ফূর্ত ধারায় নেমে আসা চোখের জল মুছতে মুছতে দেব বললো, 'আমি তখন বিচ্ছিন্ন, অসহায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে একটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি হাসপাতালের সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে সব কথা খুলে বললাম। উনি সত্যিই খুব ভালো, আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে ওর কোনো অসুবিধে হলো না। ওঁর সাহায্যেই

আমি তখন তোমাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে এসে আমার নিঃসন্তান ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষাণকে দিলাম এবং শুধু মায়ের পরিচয় ছাড়া আর সব কথা ওকেও খুলে বললাম।

'মার ঠিকানাটা আমাকে একবার বলবে ?'

মানুর অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে দেব অবাক হয়ে গেলো।

'এই রহস্যটা চিরকালই রহস্য হয়ে থাকে না, মানু।'

'কেন ?'

'আমাদের পরিচয়কে ওর বাবা-মারা কোনোদিনই স্বীকৃতি দেয়নি, শুধু তাই নয় — একটা ধনী পরিবারে ওর বিয়েও হয়ে যায়। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আমার আর কখনও দেখা হয়নি।'

'মার সম্পর্কে কি কখনও কিছু শুনেছো ?'

'খুব কম! তুমি যখন ছোট। কৃষাণ তোমার জন্যে একজন বয়স্কা আয়া রেখেছিলো। এখানে আসার আগে মহিলাটি মমতাদের বাড়িতে কাজ করতো। ওর মুখেই শুনেছি রঞ্জু নামে ওর একটা ছোট মেয়ে আছে। মমতা কেন ওর নাম রঞ্জু রেখেছিলো আমি জানি। আমরা যখন পেহালগামে ছিলাম, ও আমাকে বলেছিলো প্রথম সন্তানের নাম রাখবে রঞ্জু। সেই জন্যে প্রথম প্রথম আমিও তোমাকে রঞ্জু বলে ডাকতাম, কিন্তু পরে নামটা পালটে মানু রাখি।'

'আচ্ছা বাপি, মার সম্পর্কে তুমি আরও কিছু জানতে পারো না ?'

'আমি ওর সম্পর্কে কোনোদিনই কিছু জানতে চাইনি, বরাবরই আমার জীবন থেকে ওকে দূরেই সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম।'

'বাপি, তুমি যখন আমাকে এতোকিছু বললে, মার সম্পর্কেও কিছু বলো…অন্তত যে পরিবারে মার বিয়ে হয়েছিলো।'

'ওরা এখন কোথায় সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। দেশ ভাগ হবার আগে পর্যন্ত ওরা লাহোরে লরেন্স গার্ডেনস্-এর কাছে একটা বাংলোতে থাকতো। ওর স্বামীর নাম জগদীশ চন্দর।'

'সত্যিই !' অনবধানেই মানুর মুখ থেকে শব্দকটা বেরিয়ে এলো।

'কি ভাবছো ?'

'কিছু না !'

'আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।'

'জানো বাপি, মাধুদের কলেজে একটা মেয়ে পড়ে তার নাম রঞ্জু ! ওর কথা তোমাকে আগেও বলেছি। আমি ভাবছি…'

'না মানু, সেই রঞ্জুই যে এ হবে সে সম্ভাবনা খুব কম। এ সব উপন্যাস বা নাটকেই সম্ভব, বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক !' মুখে বললেও মানু তখনও কি যেন একটা ভাবনার অতলে

তাকিয়ে রয়েছে।

'মানু, এ প্রসঙ্গে আমি তোমাকে দু এক কথা বলতে চাই। যখনই তুমি মার কথা স্মরণ করবে, শ্রদ্ধায় তোমার মাথা যেন নত হয়ে থাকে। আমি আজও ওকে শ্রদ্ধা করি। তুমি যখন তোমার মার সম্পর্কে কিছু জানো না, তখন আমি যদি বলি যে ও দেবীর চাইতেও পবিত্র, তখন তোমার সেটা বিশ্বাস করা উচিত। ওর স্মৃতি নিয়ে বাকি জীবনটা আমি আনন্দেই কাটিয়ে দিতে পারবো।'

নির্নিমেষ চোখে মানু দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দেবই বলে চললো, 'মানু, আমি ভেবেছি হাজারীবাগ জেলায় একটা হাসপাতাল খুলবো। প্রতি বছর বর্ষার সময় মড়কে বিহারের গ্রামগুলো থেকে হাজার হাজার পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।'

'তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, বাপি।'

'না, এখানের হাসপাতালে তোমার থাকা দরকার। আমি ভাবছি ডাক্তার রমেশের কথা। ও কি আমার সঙ্গে যেতে চাইবে বলে তোমার মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই উনি যাবেন। উনি তোমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করেন, তুমি চাইলে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্তও সানন্দে তোমার সঙ্গে যেতে চাইবেন।'

'ছেলে হিসেবে রমেশ নিঃসন্দেহে ভালো। ওকে আমি সত্যিই খুব পছন্দ করি। ঠিক আছে, তুমি বরং ওকেই প্রস্তুত হতে বলো। প্রাথমিক বন্দবস্ত করার জন্যে ইচ্ছে আছে কালই আমি রাঁচি রওনা হয়ে যাবো।'

ঘরে ফিরে আসার সময় চাপা বিষণ্ণতায় মানুর বুকের ভেতরটা ভারি হয়ে ছিলো, তখনও সে রঞ্জুর কথাই ভাবছিলো। ওদের বাড়িতে সে আগে একবার গেছে, ওর মার সঙ্গে তার দেখাও হয়েছে, কিন্তু রঞ্জুর বাবা বা মার নাম সে জানে না। তবে এটুকু সে জানে ওরা লাহোর থেকেই এসেছে। কিন্তু ও রকম কত হাজার হাজার মানুষই তো লাহোর থেকে এসেছে, লাহোর থেকে আসা অজস্র মেয়ের নামও রঞ্জু থাকতে পারে! মনের মধ্যে রঞ্জুর মার মুখটাকে সে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করলো। মুখখানা যেমন সুন্দর তেমনি সিগ্ধ অথচ কেমন ভাবগম্ভীর। মানু মনে মনে ভাবলো এমন মুখ সত্যিই বিরল।

১৩

পরের দিন দেব রমেশকে সঙ্গে নিয়ে রাঁচি চলে গেলো।

মানু ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, বার বার ঘুরে ফিরে তার কেবলই রঞ্জুর কথা মনে পড়ছে। শেষ পর্যন্ত সে মনস্থির করে উঠে পড়লো, ভবেলো ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে। পাগলের মতো দ্রুত হয়ে উঠছে তার বুকের স্পন্দন—রঞ্জুর মা যদি সত্যিই তার মা হয়! পরক্ষণেই আবার হতাশায় আশঙ্কার সে তীক্ষ্ণ-মুখ কাঁটার মতো উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে—ও যদি তার মা না হয়ে অন্য কারুর মা হয়।

রঞ্জু অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই তাকে অভ্যর্থনা জানালো, যদিও মানুর সঙ্গে ওর তেমন

কোনো পরিচয় নেই। এমন কি তার বিয়েতে রঞ্জুকে নিমন্ত্রণও করা হয়নি।

কুশল বিনিময়ের পর মানু একসময় রঞ্জুকে জিগেস করলো দেশ বিভাগের আগে ওরা কোথায় থাকতো এবং ওর বাবার নাম কি।

রঞ্জু বললো, 'আমরা লাহোরে থাকতাম। দেশ ভাগের সময় আমাদের যাকিছু ছিলো সবই নষ্ট হয়ে যায়। বাবা একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে মারা যান। সেদিন থেকে মারও স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে।'

নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে মানু আবার জিগেস করলো, 'তোমার বাবার নাম কি ?'

'জগদীশ চন্দর ?'

নামটা শুনেই মানুর মুখখানা চকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। এই হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করেই রঞ্জু জিগেস করলো, 'কেন, আপনি ওঁকে চিনতেন নাকি ?'

'না, ওঁকে আমি কখনও দেখিনি।'

দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে ওত পেতে থাকা সন্দেহটাকে দূর করার জন্যে মানুর ইচ্ছে হলো রঞ্জুর মার নাম জিগেস করে, কিন্তু লজ্জা পেলো। তবু কোনো রকমে দ্বিধা কাটিয়ে সে রঞ্জুর মার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে প্রকাশ করলো।

মমতা তখন বিছানায় শুয়ে ছিলো, একেবারে বিশীর্ণ, ম্লান, কেমন যেন অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে সারা মুখ। ও যে তার মা সে বিষয়ে মানু সুনিশ্চিত। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো মাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু নিজেকে সে অতি কষ্টে সামলে রাখলো। এ রকম একটা মারাত্মক অসুস্থতার মধ্যে তাকে নতুন কোনো আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অথচ নতুন করে আবিষ্কার করার পর মাকে ছেড়ে যেতেও তার মন সরছে না।

মিষ্টি হেসে সে মমতার শয্যার এক পাশে এসে বসলো। রঞ্জুকে উপেন্দ্রর কবল থেকে রক্ষা করার দিন থেকেই মমতার মানুকে ভালো লেগে ছিলো।

রঞ্জু বাবার কয়েকটা ছবি এনে দেখালো। একটাতে মমতাও ছিলো। ওকে তখন ঠিক রূপসী কোনো রানীর মতো দেখতে ছিলো।

'মামীকে যেমন সুন্দর দেখতে, নিশ্চয়ই নামটাও তেমন মিষ্টি।'

নামটা না জানা পর্যন্ত মানু কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলো না, কিন্তু কথাটা বলে ফেলার পরেই সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো, কিন্তু মমতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হলো না। হাসতে হাসতেই ও বললো।

'আমার ধারণা আমার নামটা বেশ ভালোই ছিলো, অবশ্য অন্য অনেকে ঠিক পছন্দ করতো না। তাই আমি নিজেই আমার নাম রেখেছিলাম মমতা।'

বিপুল উচ্ছ্বাসে মানু ভরে উঠলো। ইচ্ছে হলো মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে ওঠে—মা, মামণি, মাগো ! কিন্তু তা পারলো না, কেবল একটু ঝুঁকে এসে সে মমতার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো।

মামা দেখো, তুমি শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবে।'

'তোমাকে আমার সত্যিই ভালো লাগে, মানু।'

'তাহলে আমাকে কথা দাও তুমি আর কখনও এমন অসুস্থ হয়ে পড়বে না।'

'আমার জীবনে যতটা প্রয়োজন আমি তার চাইতেও বেশি দিন বেঁচেছি, মানু। এখন কেবল একটাই ভাবনা যা আমাকে উদ্বিগ্ন কোরে তোলে—শুধু যদি রঞ্জুর বিয়েটা…'

'রঞ্জুর বিয়ে হলে তোমার সব দুশ্চিন্তা মিটে যাবে? কিন্তু মামী, আমার জন্যেও যে তোমাকে আর কিছুদিন বাঁচতে হবে।' মানুর ইচ্ছে হলো আরও অনেক অনেক কিছু বলে, কিন্তু নিজেকে সে সামলে রাখলো।

বিদায় নেবার সময় রঞ্জুকে সে বললো, 'কবে তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা করছো বলো? তোমার কলেজের বান্ধবী মাধুই যে এখন তোমার বৌদি, আশাকরি নিশ্চয়ই সে খবরটা জানো।'

১৪

বিহার থেকে দেব মানুকে প্রায়ই চিঠি লিখতো। একবার একটা চিঠিতে জানালো জমি কেনা হয়ে গেছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই হাসপাতাল তৈরির কাজ শুরু করে দেবে।

অন্য একটা চিঠিতে জানালো যেসব স্থানীয় লোক জঙ্গলে বাস করে, সেই সব মাওঝি, বীরোহার, গাঞ্জু, তুরি, মোতি, সুন্দি, কুর্মি প্রভৃতি উপজাতীদের কথা।

''মাওঝিরা পাকা শিকারী। কোথাও বাঘ কিংবা চিতা বেরিয়েছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীর ধনুক নিয়ে সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। এবং শিকার সঙ্গে না নিয়ে ফেরাটাকে ওরা একটা অপমানকর ব্যাপার হিসেবেই মনে করে।

"ঠিক এমনি ভাবে, বীরোহাররা আবার রীতিমতো সাহসী যোদ্ধা। শিকার ওদের অন্যতম পেশী। ধান বা গমের চাইতে বনের ফলমূলই বেশি পছন্দ করে।"

আর একবার দেব চিঠিতে জানালো, "বিয়ে, উৎসব বা পালা-পার্বনে 'ঝুমুর' জাতীয় নাচ আদিবাসীদের জীবনে একটা অপরিহার্য অংশ। ছেলে মেয়ে সবাই একসঙ্গে নাচে। কখনও কখনও দুদিন একরাত ধরে চলে বিরামবিহীন তাদের নাচের উৎসব। বিয়ের সময় বর-বউও এই নাচের আসরে যোগ দেয়।"

দেবের প্রতিটা চিঠিই মানুকে নিঃসীম আনন্দে ভরিয়ে তোলে। ঘুমে দু চোখের পাতা জুড়ে না আসা পর্যন্ত সে বারবার পড়ে। আর সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অরণ্যের গভীরে একদল নারী-পুরুষ একসঙ্গে নাচছে। তাদের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, পাথরের কোঁদা পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহ, আশ্চর্য একটা দীপ্তিতে মুখগুলো উজ্জ্বল। ওদের মধ্যে দুজনকে সে চিনতে পারলো—একজন মমতা, অন্যজন দেব। পরস্পরের হাত ধরে নাচতে নাচতেই একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

মানু প্রায় প্রতিদিনই রঞ্জুদের বাড়িতে যেতো। তবু সে ওদের কাছে নিজের পরিচয় দেয়নি। কিন্তু রঞ্জু আর মমতা, দুজনেই তাকে এমন অসম্ভব পছন্দ করতো, ভালোবাসতো যে কোনোদিন একটু দেরি হলে ওরা ভাবতো। মমতা অত্যন্ত দুর্বল এবং শয্যাশায়ী। তবু মানুর জন্যেই ওর দিনগুলো কম বেদনাদায়ক আর অনেক বেশি মধুর মনে হতো।

একদিন মানু মমতাকে বললো, 'মামী, আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে।'

'বলো।'

'আগে তুমি রাজি হবে কিনা বলো।'

সেটা নির্ভর করছে কি ধরনের অনুরোধ তার ওপরে।'

'না মামী' তোমাকে কিন্তু রাজি হতেই হবে। তুমি তো জানো ছোট বাচ্ছারা সময় সময় কি ভীষণ একগুঁয়ে আর অবাধ্য হয়।'

'কিন্তু তোমার মতো একজন পরিণত মানুষ একটা ছোট্ট বাচ্ছার মতো আচরণ করবে, সেটা আমি কেমন করে আশা করতে পারি বলো ?'

'কিন্তু ধরো আমি করলাম, তখন তুমি কি করবে বলো ?'

'আগে শুনি, তারপর বলবো।'

'মামী, কয়েকদিনের জন্যে আমি তোমাকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে চাই।'

'কোথায় ?'

'যেখানে আমি যাবো। আমার বাপি একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার। সম্প্রতি উনি বিহারের গরীব গ্রামগুলোর জন্যে একটা হাসপাতাল খুলেছেন।'

'তুমি কি পাগল হয়েছো, মানু ? অত দূরে আমি কেমন করে যাবো ? তাছাড়া তোমার এত কষ্ট করার মতো মূল্যবান জীবনও আমার নয়।' হতাশায় ম্লান স্বরে মমতা বললো।

'মূল্যবান, কি মূল্যবান নয়, সেটা আমি ভালো জানি। তোমার স্বাস্থ্যকে এভাবে তোমার হাতে আমি আর কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারবো না।' মানু এমন ভাবে কথাগুলো বললো, যাতে প্রকাশ পেলো প্রচ্ছন্ন একটা কর্তৃত্বের ভাব।

'তুমি যদি তোমার বাবাকে দিয়ে সত্যিই আমাকে পরীক্ষা করাতে চাও তাহলে উনি যখন দিল্লীতে আসবেন আমি তখন ওঁকে দেখাতে পারি।'

'না মামী, আমার অনুরোধ তোমাকে মেনে নিতেই হবে। বায়ু পরিবর্তন তোমার শরীরের পক্ষে সত্যিই বিশেষ প্রয়োজন। দোহাই তোমার, না কোরো না।' অত্যন্ত শোভন অথচ দৃঢ় স্বরেই মানু মিনতি জানালো।

দিল্লীর এই দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশ থেকে গ্রামের খোলা আবহাওয়ায় কয়েকদিন কাটিয়ে আসার সুযোগ মমতাকে মনে মনে কিছুটা প্রলুব্ধ না করে পারেনি। তাই ও এক রকম রাজিই হয়ে গেলো।

দিন দুয়েক পরেই ওরা যাত্রা শুধু করলো—মমতা; রঞ্জু আর মানু। প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওরা আগে থেকেই আসন সংরক্ষিত করে রেখেছিলো। প্রত্যেকের জন্যে এক একটা সুটকেশ আর বিছানা ছাড়া ওদের সঙ্গে মালপত্তর তেমন কিছুই ছিলো না। যাত্রাপথ নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘ, তবে সৌভাগ্যবশত ওদের একবারই মাত্র ট্রেন বদল করতে হয়েছিলো।

'প্রথমে যতটা ভেবেছিলাম, এখন আর ততটা কষ্ট হচ্ছে না।' এক সময়ে মমতা মানুকে বললো। 'যদিও নিজে থেকে উঠতে পারি না, তবু আমার তেমন দুর্বল লাগছে না।'

মানু উল্লসিত হয়ে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললো, 'মামী, তোমার সুন্দর অতীত দিনের কথা আমাদের বলো।'

মমতা ম্লান ঠোঁটে হাসলো। এমন অদ্ভুত আবদার কেউ করতে পারে ভাবতেই ওর অবাক লাগলো। তবু, চকিতে সমস্ত অতীত এসে ভিড় করে দাঁড়ালো ওর চোখের সামনে। শিক্ষকদের আবাসনে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই ওর দু চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুধারা।

'আমৃত্যু এইযাত্রা পথ যদি আর কখনও শেষ না হয়, জীবনে এর চাইতে বেশি কিছু আমি আর আশা করি না!' অনেকটা স্বগতোক্তিরই মতো অস্ফুটে মমতা বললো।

'না মামী, না ; এ কথা তুমি আর কখনও বোলো না! এই ট্রেন কোথাও না কোথাও এক সময়ে তো থামবেই। কিন্তু কে বলতে পারে, পথের ধারের কোনো স্টেশনে তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে আনন্দ অপেক্ষা করছে কি না।'

'তুমি বুঝতে পারছো না, মানু—জীবনে এর চাইতে সুখের মুহূর্ত আমি কল্পনাও করতে পারছি না!' কামরার আসনে শুয়ে থাকা বিশীর্ণ ম্লান মুখেও অদ্ভুত একটা দীপ্তি ফুটিয়ে মমতা বললো।

মানু আর রঞ্জু তাস খেলছে. শয্যা থেকে খুশির চোখে মমতা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের দুটিকে মনে হচ্ছে ঠিক স্বপ্নসুখে বিভোর দুটি পাখির মতো।

১৬

রাঁচি রোড স্টেশনে পৌছে মানু, মাধু আর কুমারীকে তারবার্তা পাঠালো, যদিও দিল্লী ছাড়ার আগে বাড়িতে জানিয়ে এসেছিলো, তবু সে জানে ওরা নিশ্চয়ই ভাবছে।

দেবের গ্রামে পৌছতে ওদের বেশ কয়েক মাইল বাসে যেতে হলো। বাস যেখানে থামলো ছোট ছোট কয়েকটা দোকান নিয়ে মাত্র সামান্য কয়েক ঘর লোকবসতি। দেবের নতুন তৈরি হাসপাতালটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা সাধারণত জঙ্গল. কাটার ঠিকেদারের কাছে দিন-মজুরীর কাজ করে। গাছ কেটে কাঠ বানানোর কাজে ওরা সারাটা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় সবুজ শালপাতায় বানানো পাত্রে হাঁড়িয়া নিয়ে মুখর আনন্দে মেতে ওঠে।

হাসপাতাল সুসংলগ্ন বাগানে দেব একটা আরামকুর্সিতে শুয়ে রয়েছে। সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সে প্রায় বিধ্বস্ত। তবু অসুস্থ দুস্থ মানুষদের সাহায্য করার জন্যে সে সব সময়েই প্রস্তুত।

বড় জোর মিনিট দশেক সে বিশ্রাম নিতে পেরেছিলো, এমন সময় একজন মহিলা তার অসুস্থ বাচ্ছাটাকে নিয়ে এলো। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে দেব সঙ্গে সঙ্গে ওদের ভেতরে নিয়ে গেলো।

ঠিক এমনি সময় বাসটা হাসপাতালের ফটকের সামনে থামলো। বাস থেকে নামলো মাত্র তিনজনই যাত্রী—মানু, রঞ্জু আর মমতা। বাসযাত্রার ক্লান্তিকর ধকলে মমতার মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। তবু ঠোঁটের কোণে ম্লান একটুকরো হাসি ফুটিয়ে ও বললো :

'ওষুধে কোনো কাজ হবে কি না জানি না, তবে এমন সুন্দর একটা পরিবেশ আমার আয়ুকে আরও কয়েক দিনের জন্যে বাড়িয়ে দিয়েছে।'

মানু তখনও অবাক হয়ে ভাবছে রঞ্জুর সামনে মমতাকে কেমন করে দেবের কাছে নিয়ে যাবে! রঞ্জু এখনও পর্যন্ত কিছু জানে না। ওর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই।

মানু মনে মনে স্থির করলো প্রথমে ওদের একটা খালি ঘরে নিয়ে যাবে। অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করায় মমতাকে সে একটা বিছানায় শুনিয়ে দিলো; রঞ্জুকে রান্নাঘরে পাঠালো চা বানাবার জন্যে। রমেশই প্রথম জানতে পেরে দেবকে খবর দিতে গেলো।

মমতার শয্যার পাশে বসে মানু অধীর আগ্রহে তার জীবনের সেই দুর্লভ মুহূর্তটার জন্যে প্রতীক্ষা করে রয়েছে—কখন বাপি এসে মামণিকে দেখবে।

মমতা জানতো মানুর বাবা একজন নামকরা ডাক্তার এবং উনিই এখন তাকে দেখবেন। কিন্তু একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ায় ও জিগেস করলো, 'আচ্ছা মানু, তুমি তোমার অনেক কথা আমাকে বলেছো, কিন্তু তোমার বাবার নামটা আমাকে এখনও বলোনি।'

'ওঁর নাম ডাক্তার দেব।' অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায়, বরং বলতে গেলে এক রকম উপেক্ষার ভঙ্গিতেই সে জবাব দিলো।

নামটা শুনে মমতা কেমন যেন দমে গেলো, অথচ ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকে কিছুতেই চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করলো :

'আর তোমার মা?'

'আমার মা…'

মানুর কথা শেষ করার আগেই দেব ভেতরে ঢুকলো।

বাঁকা চোখের দৃষ্টিতে মমতা দেবের মুখের দিকে তাকালো, পঁচিশ বছরের আগের দেখা সেই দেব প্রায় একই রকম রয়েছে। মুখে সামান্য একটু ক্লান্তির ছাপ আর কপালের দুপাশে পাকা চুলের গুচ্ছ ছাড়া তার চেহারা বা ভঙ্গিতে কোথাও কোনো পরিবর্তন

ঘটেনি। মমতার মুখ থেকে সমস্ত রঙ কে যেন নিঃশেষে মুছে নিয়েছে, দেওয়ালের গায়ে ভর দিয়ে ও উঠে বসার চেষ্টা করলো।

অস্ফুট, বিহ্বল-বিস্ময়ে ও শুধু বললো, 'দেবজী!'

'হ্যাঁ, মমতা, আমি!'

দেব মমতার আরও কাছে এগিয়ে এলো।

মানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মমতার দিকে তাকিয়ে ছিলো, ভেতরের চাপা উত্তেজনা আর দুর্বলতায় কষ্ট পাচ্ছে দেখে সে তাড়াতাড়ি মমতাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

এমন সময় রঞ্জু চা নিয়ে ফিরে এলো। দেব ওকে চিনতে পেরে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলো।

রঞ্জু জিজ্ঞেস করলো, 'আমার মা সেরে উঠবে তো, ডাক্তারবাবু?'

কোনো রকমে চোখের জলকে ধরে রেখে দেব বললো, 'ওর জন্যে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো।'

চা-পর্ব মিটলো। মমতাকে এখন অনেক ভালো, উচ্ছল আর হাসিখুশী মনে হচ্ছে। চায়ের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে রঞ্জু রান্নাঘরে ফিরে গেছে।

'আমি কি একটুখানির জন্যে একবার হাসপাতালে যেতে পারি?' মমতার শয্যার ওপর ঝুঁকে দেব জিগেস করলো।

দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো। দেব হেসে ফেললো।

আর তখনই মমতার মনে পড়লো এ ঘরে ওরা একা নয়, মানুও রয়েছে। তার দিকে ফিরে চাপা অথচ স্বচ্ছ স্বরেই মমতা বললো:

'মানু, তুমি হয়তো জানো না—আমি অনেক দিন ধরেই দেবজীকে চিনি।'

'শুধু চেনো, আর কিছু নয়?' হাসতে হাসতেই ঠাট্টার ছলে দেব বললো।

'মার্মাণ, আমি রঞ্জু, তোমার ছেলে রঞ্জু।' মানু দৌড়ে গিয়ে মমতার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁকড়ে ধরলো।

'রঞ্জু, সোনা আমার...'

মমতা আর কিছু বলতে পারলো না, কান্নার রুদ্ধ আবেগে ওর গলার স্বর তখন বুজে গেছে।

ক্লান্তি সত্ত্বেও সারা মুখে অবাধ হাসি ফুটিয়ে দেব বললো, 'তোমার ছেলে রঞ্জু এখন অনেক বড় হয়ে গ্যাছে, মমতা। এর জন্যে মনে হয় ধন্যবাদটা আমারই প্রাপ্য।'

১৭

'আজকের কাগজ দেখেছো বাপি?' পরের দিন সকালে প্রাতরাশের সময় মানু দেবকে জিগেস করলো।

'না, এখনও ঠিক সময় করে উঠতে পারিনি।'

'কাল বঙ্গের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা সামুদ্রিক ঝড় বয়ে গ্যাছে। ঘর-বাড়ি তছনছ করে, গাছ-পালা উপড়ে, ট্রেন উলটিয়ে, রেল লাইন একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। কত লোক যে মরেছে এখনও তার হিসেব করা যায়নি।'

'এই ধরনের ঘূর্ণী-ঝড়গুলো সত্যিই খুব মারাত্মক!' দেব যে মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠছে, সেটা তার কণ্ঠস্বর শুনে স্পষ্টই বোঝা গেলো।

প্রাতরাশের পর রঞ্জু আর মানু জঙ্গলে 'ঝুমুর' নাচ দেখতে গেলো। ঘরে রইলো কেবল মমতা আর দেব।

মমতা বললো, 'যখন আমার সব ছিলো, তখন তোমাকে আমি কিছুই দিইনি। আজ আমার দু হাত শূন্য, রিক্ত। নিশ্চয়ই তোমাকে শুধু স্মৃতি নিয়ে আজ এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।'

দেব মমতার হাতদুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলো। বললো, 'তোমার হাত শূন্য, রিক্ত নয় মমতা। কিন্তু আজ আমার আর কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই।'

'আমাকেও না?'

'মমতা, আমি জানি তুমি বরাবরই স্বামীর সম্মান অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছিলে। কিন্তু চিরকালই তোমার ভালোবাসা ছিলো আমার জন্যে, এবং আমার জন্যেই থাকবে। বিশেষ কোনো সম্পর্কের ওপর আমাদের ভালোবাসা নির্ভর করেনি। যে কটা বছর বেঁচেছি, সারাক্ষণই তোমার অস্তিত্ব অনুভব করেছি আমার সত্তায়। এখন তোমাকে দু চোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি। এর চাইতে বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না। আমাদের এই নতুন যাত্রায় যৌবন নেই, বার্ধক্য নেই, কামনাও বলে কিছু নেই।'

পায়ে পায়ে সন্ধ্যে যত এগিয়ে আসছে, ঠাণ্ডাও পড়ছে জাঁকিয়ে। দেব একটা শাল এনে মমতার কাঁধের চারপাশে জড়িয়ে দিলো। দুজনেই বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

এক সময়ে মমতাই প্রথম নীরবতা ভেঙে বললো, 'আচ্ছা, ভবিষ্যতে তুমি রুগী দেখবে, ওষুধ দেবে আর আমি তাদের সেবা করবো—সেটা সম্ভব নয়?'

'নিশ্চয়ই সম্ভব। কে আমাদের বাধা দেবে বলো?' কেমন যেন মগ্ন স্বরেই দেব জবাব দিলো।

'না, হয়তো কেউ দেবে না...ভয় শুধু, পাছে আমার এই ছোট্ট আনন্দটুকুকেও কেউ কেড়ে নেয়!' গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মমতা চুপ করে গেলো।

মমতার অসুস্থতা হঠাৎ মারাত্মক খারাপের দিকে মোড় নিলো। ওকে দেখার মুহূর্ত থেকে দেব ঠিক এই আশংকটাই করছিলো। সে জানতো এই ভয়ঙ্কর রোগের কোনো ওষুধ নেই, শুধু যন্ত্রণাটাকে একটু কমিয়ে জীবনকে যে কটাদিন ধরে রাখা যায়। এখন মনে হচ্ছে সে আশাও বুঝি নিভতে বসেছে।

দেব মমতাকে বিছানায় শুইয়ে দিলো। রক্তবমি শুরু হওয়ার একটু পরেই মমতা জ্ঞান

হারিয়ে ফেললো। নানান ওষুধপত্র দিয়ে দেব আপ্রাণ চেষ্টা করলো ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার।

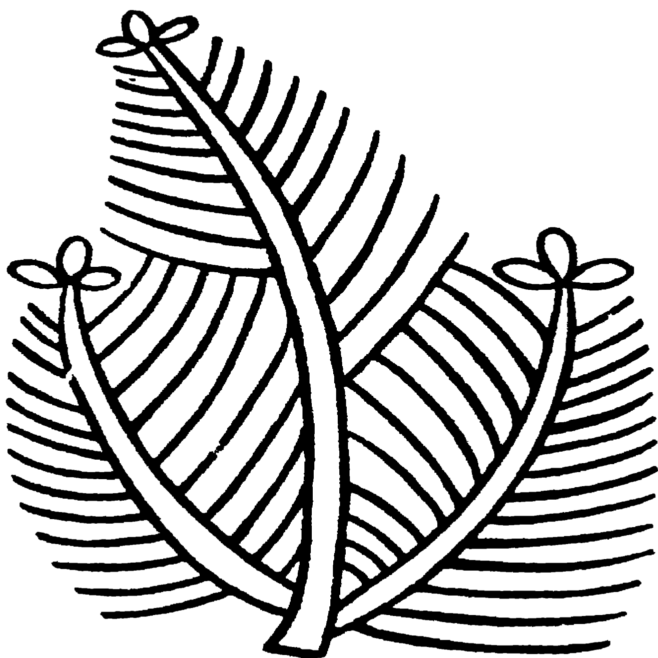
সন্ধ্যের পর মানু আর রঞ্জু যখন ঘরে ফিরে এলো, মমতার তখন অন্তিম মুহূর্ত, যেন শেষ যাত্রার ক্ষণে ওদের দেখার জন্যেই ও অপেক্ষা করছিলো।

মমতা ওদের দুজনকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলো। মার ওই দুঃসহ যন্ত্রণা ওরা আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলো না, ঘর ছেড়ে বারান্দায় পালিয়ে এসে বাচ্ছাদের মতো কাঁদতে লাগলো।

মমতা একটা হাত দেবের দিকে বাড়িয়ে দিলো। দেব ওর হাতটা দুহাতে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিলো। মমতা সারা শরীরে অনুভব করতে পারলো অদ্ভুত একটা শিহরণ. দুর্বিসহ যন্ত্রণার মধ্যেই, দুঃসাহসিক প্রয়াসে ও একটু হাসার চেষ্টা করলো। তারপর ধীরে ধীরে ওর চোখের পাতাদুটো মুদে এলো, আর কোনো দিনের জন্যেও খুললো না।

মধ্যরাত্রিও অতিক্রম করে গেছে। মমতার মাথাটা কোলে নিয়ে দেব তখনও বসে রয়েছে। মানু তার দিকে একটা তারবার্তা এগিয়ে দিলো। কুমারী পাঠিয়েছে। যাকে ও কখনও দেখেনি, অথচ বরাবরই দেবের চোখ দিয়ে অনুভব করেছে, সেই মমতার পায়ে ওর হয়ে দেব যেন কয়েকটা ফুল দেয়।

ডাক্তার দেবের অনড় দেহটা যেন চমকে উঠলো। তারবার্তাটা সে রেখে দিলো মমতার পায়ের কাছে। আর ঠিক তখনই, হঠাৎ, সে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললো। সারা জীবনের অঙ্গীকার আর আত্মসংযম ভুলে গিয়ে সে বাচ্ছা ছেলের মতো মমতার দেহটাকে আঁকড়ে ধরলো। তার বিশীর্ণ চিবুক বেয়ে অঝরে নেমে এলো অশ্রুধারা।



গল্পগুচ্ছ

অনুবাদ / দিব্যেন্দু বন্দোপাধ্যায়

আমার কাহিনীটা বলার আগে পমপিআইর কথাটা বলে নেয়া যাক।

পমপিআই ছিলো নেপলসের কাছাকাছি একটি প্রাচীন ইতালিয় নগরী, খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে যা গ্রীক জাহাজগুলোর বন্দরের কাজ করতো। খৃষ্টপূর্ব তিনশো দশ সালে একটা রোমান জাহাজ ওই বন্দরে গিয়ে পৌঁছনোর আগেই, ফিরে যেতে বাধ্য হয়। জাহাজটাকে বন্দরে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পরে, খৃষ্টপূর্ব আশি সালে রোমান অধিকারের পর পমপিআই একটি রোমান উপনিবেশেই পরিণত হয়। রোমানদের প্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণ তখন ল্যাটিন ভাষা এবং রোমান আইন, প্রথা, শিল্প ও স্থাপত্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়াও সে যুগে পমপিআই ছিলো অবসর বিনোদন এবং বিলাসিতার পক্ষে এক চমৎকার জায়গা। প্রায় বিশ হাজার মানুষ তখন এই নগরীতে বসবাস করতো।

তেষট্টির ফেব্রুয়ারী মাসে একটা বড়ো গোছের ভূমিকম্পে পমপিআই নগরীর অনেকটাই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু খুব শীগগির চতুর্দিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেলো। এবং এই গঠনকার্য চলার মধ্যেই, উনাশি সালের তেইশে আগস্ট, একটি আগ্নেয়গিরি থেকে দুরন্ত বেগে ছুটে আসা লাভার স্রোত সমস্ত নগরীটাকে একেবারে বেমালুম উধাও করে দিলো। আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো ঝরে পড়া জ্বলন্ত পদার্থের ধারা ছ ফুট লাভার নিচে তলিয়ে দিলো দেশের মাটিকে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় নগরীর অধিবাসীরা যে যেমন অবস্থায় ছিলো, লাভাস্রোতের নিচে তারা ঠিক সেই অবস্থাতেই চাপা পড়ে রইলো।

অন্তহীন কাল ধরে মৃত, দগ্ধ এই মহানগরী মাটির নিচে সমাধিস্থ হয়েই ছিলো। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে একটা খাল কাটার সময় মানুষ এই লুপ্ত নগরীর কিছু কিছু চিহ্ন, কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে। ষোলোশো আটচল্লিশ সালের মার্চ মাসে নেপলসের সম্রাট ওই অঞ্চলটাকে খনন করার আদেশ দেন এবং সতেরোশো তেষট্টি সালে বিভিন্ন শিলালিপির মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আবিষ্কৃত জিনিসগুলো সত্যিই পমপিআই নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

এই খনন কার্যে প্রথম আবিষ্কার হয় প্রতিমূর্তিগুলো। আঠারো শো ষাট সালে খুঁজে পাওয়া যায় বালি আর ছাইয়ের স্তূপে চাপা পড়ে থাকা মানুষের দেহের অবশিষ্টাংশ। তখন প্লাস্টার অফ প্যারিসের সাহায্যে দেহগুলোকে নতুন করে গড়ে নেওয়া হয়—অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে যেমন অবস্থায় ছিলো, তার দেহকে ঠিক তেমনি আকার দিয়ে ফিরে পাওয়া যায় অসংখ্য মানুষের বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা, ছুটন্ত বা চলন্ত প্রতিমূর্তি। একদিন যারা ছিলো প্রাণময় সৃষ্টি, আজ তারা শুধু প্রতিমূর্তি মাত্র।

খনন কার্যের পরবর্তী পর্যায়ে আবিষ্কৃত হলো মহানগরীর স্থাপত্য চিহ্ন: বাড়ি-ঘরের

কাঠামো, আসবাবপত্র, নানা জাতের নানা ধরনের জিনিসপত্র, আর স্বর্ণময় প্রণয়দেবতার মন্দির। জানা গেলো, পর্মাপিআই ছিলো শিল্প আর স্থাপত্যে সমৃদ্ধময়ী এক নগরী।

পর্মাপিআইর সঙ্গে আমার কোনোই প্রভেদ নেই। দীর্ঘ পনেরো বছর লণ্ডনের কুয়াশা আর আমার নিজের ভেতরকার নৈঃশব্দের আলিঙ্গনে আমি নিস্পন্দ হয়েছিলাম। প্রতিদিন সকালবেলা মিস সিং-এর মুখোশটা মুখে এ'টে আমি স্কুলে পড়াতে যেতাম।

গত বারের ছুটিতে আমি রোমে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, মহিলারা গির্জায় গির্জায় মোমবাতি জেলে দেন। আমি কোথাও কোনো মোমবাতি জ্বালিনি। আমি সেই ফোয়ারাটা দেখেছি, যেখানে মনোবাসনা পূর্ণ হবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পয়সা ছ'ড়ে দেয়। আমি কিন্তু আমার পয়সার ব্যাগ থেকে একটি মুদ্রাও বের করিনি। ফ্লোরেন্সে গিয়ে দেখেছি, মিকেলেঞ্জেলো স্কোয়ারে ছবি তোলাবার জন্যে সবাই পায়রাদের হাতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। আমি তা-ও করিনি। তারপর নেপলস হয়ে, ফিরতি পথে গিয়েছি পর্মাপিআইতে। সেখানে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আমি ফের যখন প্রধান ফটকটার কাছে গিয়ে পৌছলাম, তখন লোহার দরজাটা শক্ত মুঠিতে আমার হাতটাকে চেপে ধরলো। আমি শিউরে উঠলাম। কোনোদিন কোনো পুরুষমানুষও আমাকে অমন করে আঁকড়ে ধরেনি। সেই লোহার দরজাটার ওধারেই ছিলো পর্মাপিআইর ধ্বংসাবশেষ—ইতস্তত ছড়ানো ছেটানো ভাঙাচোরা মূর্তির টুকরো আর ভাঙা দেয়ালের অবশিষ্টাংশ।

লোহার দরজাটার জন্যে আমি সেদিকেও তাকাতে বাধ্য হলাম। চতুর্দিকে লুকোবার মতো কোনো জায়গা নেই—এ নগরী যখন জীবিত ছিলো তখন হয়তো তা ছিলো। হয়তো তখন বড়ো বড়ো ঘরগুলোর মধ্যে ছোটো ছোটো ঘরও ছিলো। কিন্তু এখন সমস্ত কিছুই একেবারে খোলামেলা, সব রহস্যই এখন প্রকাশিত। কোন গলিপথ যে কোথায় গেছে, তা-ও বোঝা সম্ভব নয়। অলিগলিগুলোও এখন নিজেদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে একটা অন্যটার সঙ্গে গলাগলি করে পড়ে রয়েছে।

লোহার দরজার শক্ত মুঠোর মধ্যে আমার হাতটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো। প্রথমে ডান হাত, ডান বাহু, ডান কাঁধ—তারপর ওই একই ভাবে বাঁ দিকটাও ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। নিজেকে আমি জোর করে দরজাটার কাছ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার পাদুটো আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।

নিজেকে একটা মৃতদেহ—পর্মাপিআইর বিশ হাজার মৃতদেহের মতো একটা মৃতদেহ—বলে মনে হচ্ছিলো আমার। দ্রুত ওখান থেকে সরে পড়ার প্রচেষ্টায় আমি ডান পাটা সামনের দিকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মাটি থেকে ওপরে তুলতেই চতুর্দিকে ছড়ানো উষ্ণ ভস্মরাশির মধ্যে চিরদিনের মতো একটা মৃতদেহ হয়ে গেলাম।

কোন্ দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছিলাম আর এখন কোন্ দিকে আমাকে যেতে হবে—তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কারণ সমস্ত বাড়িঘরই ধ্বংস হয়ে গেছে আর

পথগুলো একে অন্যকে নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে উষ্ণ অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে ক্রমাগত।

তারপর অন্তহীন মুহূর্ত ধরে আমার চোখদুটো একবার উজ্জ্বল আর একবার বিষণ্ণ-বিধুর হয়ে উঠতে লাগলো। আমার বুকের মধ্যে কি যেন একটা ফুঁপিয়ে উঠতে শুরু করেছিলো। কোনো একদিন পমপিআইর মতো আমিও প্রাণময়ী ছিলাম।

গত পনেরো বছর ধরে আমি লণ্ডনের কুয়াশা আর নিজের নিশ্চুপতায় চাপা পড়ে ছিলাম। সেই নিশ্চুপতা বা সেই কুয়াশা—কোনোটারই উচ্চতা আমি জানতাম না। কিন্তু নিশ্চয়ই তা ছ ফুটের ওপরে হবে, কারণ আমার পুরোটাই তার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলো।

আমার সেই বিশেষ 'আমি' টিকে আমি কোনোদিনও দেখিনি। কিন্তু এখন আমি দেখতে পাই : আমার ভেতরে একটা প্রাণময়ী নগরী ছিলো। যৌবনে উপনীতা প্রতিটি মেয়ের মধ্যেই একটি করে নগরী থাকে।

আমার নগরীতে আমার বাবা-মার একটা বাড়ি ছিলো—একটা বিশাল খোলামেলা উঠোন ছিলো বাড়িটাতে। আর ছিলো ছায়া-ছড়ানো একটা পিপুল গাছ আর একটা রাস্তা, যার মোড়ের কাছে আমার বন্ধুরা থাকতো। মোড়ের কাছে আরও একটা ঝুপসি মাথা গাছ ছিলো, তার ছায়া স্বস্তি যোগাতো পথিকদের। এ ছাড়া অন্য একটা বিরাট বাড়িও ছিলো সেখানে। রাত্রিবেলা আকাশের তারার মতো সে বাড়িতে অগুন্তি আলো জ্বলতো আর প্রতিদিন ভোরবেলা সূর্যটা উঁকি মারতো সে বাড়ির দেয়ালের পেছন থেকে। অন্যান্য সমস্ত অল্প বয়সী মেয়েদের মতো আমিও প্রায়ই ওই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম।

দেখতে দেখতে আমার ছোট্ট নগরীটা মহানগরী হয়ে উঠলো। আমি কলেজে পড়তাম এবং অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতাম। কয়েক হাজার না হলেও অন্তত কয়েকশো চরিত্র আমার নগরীর অংশ হয়ে উঠেছিলো—বিভিন্ন কাহিনী থেকে আবিষ্কার করে আমি তাদের মঞ্চে এনে হাজির করেছিলাম।

কি বিরাট ছিলো আমার শহরটা ! আর কত সুন্দর ! ঠিক পার্মপিআইর মতো। এই শহরটাও গড়ে উঠেছিলো সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমার হৃদয়ও বয়ে যেতো শান্ত আর দুরন্ত গতিতে। বিদেশী বই পড়ার সময় আমার মনে হতো, ওই বইয়ের চরিত্রগুলি যেন নৌকো আর ফেরিতে করে আমার বন্দর-শহরে এসে পৌঁছেছে।

তারপর একদিন আগ্নেয়গিরিটা ফেটে পড়লো, কালো কালো জ্বলন্ত ভস্মের মতো লাভার বৃষ্টি গিলে ফেললো শহরটাকে। ভস্মের পুরু আবরণের নিচে হারিয়ে গেলো শহরটার সমস্ত অস্তিত্ব।

পনেরো বছর আগে ডান পাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, বাঁ পায়ের গোড়ালিটা মাটি থেকে ওপরে তুলতেই জ্বলন্ত ভস্মরাশির মধ্যে আমি একটা মৃতদেহ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার শহরের ইতিহাসের সঙ্গে পমপিআইর ইতিহাসের কোনো পার্থক্য নেই। হয়তো সেজন্যেই পমপিআইর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে আমি নিজের শহরটার

ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে গিয়েছিলাম। তবে সামান্য একটা প্রভেদ অবশ্য আছে। পমপিআইর কোনো মানুষই নিজের মৃতদেহটাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু আমি দেখলাম, আমি কঠিন দৃষ্টিতে নিজের মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। বাদবাকি সমস্ত কিছুই এক। দুটো শহরের কেউই কবরের জন্যে কোনো জায়গা পায়নি। প্রত্যেকের মুখই অবারিত, প্রত্যেককেই আমি চিনতে পারি—স্মৃতির অতল থেকে মনে করতে পারি প্রত্যেকের সঠিক মুখশ্রী আর চেহারা।

আমার মৃতদেহটা ছিলো আমার নরম শরীরের ওপরে একটা মুখোশ। মাথায় সুন্দর আঁচড়ানো চুল, সোজা সিঁথি। পরনে সাদা রেশমি পাজামা, সবুজ কামিজ আর তার সঙ্গে মানানসই দোপাট্টা। কানে হালকা দুল। নিষ্পাপ মুখখানাতে তামার মতো একগুঁয়েমি—যার জন্যে প্রয়োজনের মুহূর্তে মুখটাকে কঠোর বা কোমল করে তোলা যায়।

সপ্তাহের শেষে স্কুল বন্ধ থাকতো। তখন সময় কাটানো আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে উঠতো। এই কারণেই আমাকে রোমে যেতে হয়েছিলো। নয়তো ছুটিটা আমাকে ঘরের একটা পঞ্চম দেওয়াল করে তুলতো। কিন্তু রোম থেকে ফিরে আসার পরেও আমার মনে হতো, আমি যেন লণ্ডনে নেই—আমি আমার শহরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে মরছি।

ভেবেছিলাম সপ্তাহান্তিক ছুটিতে আমি ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই লীন হয়ে থাকবো, চিনে নিতে চেষ্টা করবো মৃত মানুষগুলোকে। কিন্তু রাত্রিবেলা জর্জ টেলিফোন করে জানালো, তার কাছে সিনেমার দুটো টিকিট আছে এবং সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। আমি ওকে ফেরাতে পারিনি, তাই ওর সঙ্গেই সিনেমাটা দেখতে গেলাম।

দ্য কামেরন একটা সুপরিচিত ইতালিয় ফিল্ম। যৌবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ানো ছেলে মেয়ে দুটিকে দেখতে বেশ লাগছিলো। একদিন ছেলেটি মেয়েটিকে রাত্রিবেলা ঘরের বদলে বারান্দায় শুতে অনুরোধ করলো—কারণ তার ইচ্ছে, মাঝরাতে সে মেয়েটির কাছে আসবে। মেয়েটি রাত্রিবেলা নাইটিংগেলের গান শুনবে বলে বাবা মার কাছ থেকে বারান্দায় ঘুমোবার অনুমতি নিয়ে রাখলো। ভোরের দিকে বাবা ভাবলেন, একবার গিয়ে মেয়েটার একটু খোঁজ নিয়ে আসবেন। কারণ রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়েছিলো বলে তাঁর মনে হচ্ছিলো, মেয়েটার হয়তো শীত করছে। কিন্তু তিনি গিয়ে দেখলেন, একটি ছেলে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘুমোচ্ছে—দুজনেই সম্পূর্ণ নগ্ন, নিবিড় আলিঙ্গনে লীন হয়ে আছে দুজনে। ভদ্রলোক বিচলিত হয়ে ফিরে এসে স্ত্রীর ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, 'কাল রাত্তিরে তোমার মেয়ে নাইটিংগেলের গান শুনতে চেয়েছিলো। যাও, দেখে এসো গে - সে নাইটিংগেলটাকে ধরে রেখেছে।'

সিনেমা হলে আমার পাশে বসে থাকা জর্জ আমার হাতটা নিয়ে নিজের দুই উরুর মাঝখানটাতে রেখে বললো, 'এই যে তোমার নাইটিংগেল। ধরে রাখো…'

ছবিটা দেখার পর জর্জ আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিতে এসে আমার কাছেই থেকে গেলো। রাত্রিবেলা ছবির মেয়েটির মতো আমিও নাইটিংগেলটাকে ধরে রাখলাম।

এই প্রথম আমি জর্জের সঙ্গে এই ধরনের রাত কাটালাম। তবে পুরুষমানুষ সম্পর্কে এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। মাঝে মাঝে আমি এভাবে পুরুষমানুষের সঙ্গে রাত কাটাই।

বিছানায় পুরুষমানুষের সঙ্গে আমার প্রথম অভিজ্ঞতাটা বড়ো ভয়ংকর। সেদিন সেই অনুভূতিটা আমার সমস্ত শরীরে আগুনের মতো কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। মনে হয়েছিলো আমার প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন হাড়-মাস শুদ্ধ অন্য অঙ্গগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। বীর্য গ্রহণের সময় জরায়ুটা যেমন করে উন্মুক্ত হয়ে যায়, আমার শরীরের প্রতিটি অংশ সেদিন রাতে তেমনি করে উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিলো।

সেদিন একটা আশ্চর্য সমাপতনিক ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। সাধারণত আমার নৈতিক মূল্যবোধগুলো আমাকে আঁকড়ে রাখে। প্রতিদিন রাতে ঠাণ্ডা জলে স্নান করে আমি শরীরটাকে হিম-শীতল করে তুলি, তারপর নিজেকে কম্বলে মুড়িয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু সেদিন আমি আমার এক বয়স্কা ইংরেজ বান্ধবী, ক্লেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ও আমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখালো। জিনিসটা রবারের তৈরি অবিকল একটা পুরুষের যৌনাঙ্গ। ও চলতি সপ্তাহেই ওটা বাজার থেকে কিনেছে। জিনিসটাতে দুটো ব্যাটারি লাগানো এবং ব্যাটারির শক্তিতেই ওটা চলে। ক্লেয়ারের কথাগুলো যেন আত্মকরুণায় ভরা। দুঃখভরে ও বললো, 'আর কি করবো বল্? এ বয়সে পুরুষমানুষ আর কি করে পাবো। সাত বছর হলো আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আগে দু-একদিনের জন্যে কাউকে জুটিয়ে নিতুম। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে…'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, যৌবনভর আমি যদি আমার নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে আঁকড়ে রাখি, তাহলে পরবর্তী জীবনে আমাকেও ক্লেয়ারের মতো ওই ধরনের জিনিস কিনতে হবে এবং তখন ওই রবারের টুকরোটাই আমার নিয়তির একটা অংশ হয়ে উঠবে।…

তাই সেদিন সন্ধ্যায় আমি একটি পরিচিত পুরুষমানুষকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালাম। বললাম, আমার জন্মদিন--কিন্তু আসলে সেটা ছিলো আমার মৃত্যুদিন। তাড়াতাড়ি রাতের রান্নাবান্না সেরে, এক বোতল স্কচ কিনে, ঘরটাকে আমি তাজা সুগন্ধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুললাম। বাড়ির মধ্যে একা একা শুধু একটি মেয়েমানুষ থাকলে কোনো পুরুষই বই আর শিল্প নিয়ে এক ঘণ্টার বেশি কথাবার্তা চালাতে পারে না। তাই একঘণ্টা বাদে সে পরম স্নেহে আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতটা প্রাণহীন আর ব্যগ্র হয়ে উঠে আমার গোটা শরীরটাকেও ব্যগ্র আর প্রাণহীন করে তুললো।

অপরাধবোধ থেকে আমি কোনো যন্ত্রণা অনুভব করি না, সেদিনও করিনি। তবু যেদিন রাতে জর্জ প্রথম আমার সঙ্গে ঘুমোলো সেদিন আমার মনে হয়েছিলো, ওকে আমার সঙ্গে করে আমার মৃত নগরীটাতে নিয়ে যাওয়া উচিত। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে যেমন পম্পিআইর ধ্বংসস্তূপ দেখতে যায়, তেমনি আমারও উচিত ওকে আমার নিজের প্রিয় শহরটার ধ্বংসাবশেষগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো।

জর্জকে আমি, কেন জানি না, কিছুই বলিনি। সকাল বেলা সে এক কাপ চা খেয়ে

চলে গেলো আর আমি একা একা ফিরে গেলাম আমার ধ্বংসস্তূপ…আমার মৃতদেহ… আর সেই বিশাল দেয়ালওয়ালা বাড়িটাতে, যেখানে একদিন বারিন্দ্র থাকতো। দেয়ালের সামনে এই যে তার মৃতদেহ…তার মুখ আর শরীরটা এখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। চওড়া কাঁধের ওপরে তার মুখ, গমের মতো গায়ের রঙ আর সুন্দরভাবে খোদাই করা গভীর দুটি কালো চোখ। ওই চোখ দুটো আমার প্রাণ নিয়ে নেবার ক্ষমতা রাখতো।

রাত্রিবেলা স্বপ্নে আমি প্রায়ই তার অট্টালিকায় গিয়ে আমার মেহেদি-রাঙানো হাতদুটি দিয়ে তার বিছানা পেতে দিতাম। রাস্তার মোড়ে বারিন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার পর যখন আমি বাড়িতে ফিরে আসতাম, তখন বাড়ির দেয়ালগুলো আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে জড়িয়ে ধরতো। আমার বাবার উত্তেজিত চোখদুটোকে দেখে পিপুল গাছ থেকে অজস্র পাতা খসে পড়তো আর আমার মনে হতো দুরন্ত রোদে আমি জ্বলেপুড়ে মরে যাচ্ছি।

তারপর একদিন আমার অস্পৃষ্ট কুমারী শরীরটা কলঙ্কিত হলো। বাড়িতে ফিরতেই মা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। মার চোখ দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো জ্বলছিলো। উনুন থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ টেনে বের করে মা বললেন, 'এতোই যখন ইচ্ছে, তখন এটা ভেতরে গুঁজে রাখলি না কেন ?'

স্বপ্নে, আর বান্ধবীদের কাছেও, আমি পুরুষমানুষদের সম্পর্কে অনেক মিষ্টি-মধুর কথা শুনেছি। কিন্তু মার কথাগুলো শুনে মনে হলো, একটা জ্বলন্ত কাঠ যেন আমার মখমল-নরম উরুদুটোর ভেতরে গুঁজে দেওয়া হয়েছে…

বেশ কয়েকদিন আমি নিজের ঘরে বন্দী হয়ে কান্নাকাটি করলাম। তারপর একদিন আমার মা এক সাধুকে পাকড়াও করে তাঁর কাছ থেকে আমার জন্যে যেন কি একটা নিয়ে এসে, দুধ বা অন্য কিছুর সঙ্গে সেটা মিশিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমাকে তা খেতে হলো, কিন্তু সারাটা রাত আমি চুপি চুপি শুধু বমি করলাম। পরদিন সকালে মা আমাকে কিছু মিঠাই এনে খেতে দিলেন। আমাকে বলা হলো, একজন বিগতদার ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করা হয়েছে। বারিন্দ্র আমাদের ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোক নয়, কিন্তু আমার হবু স্বামীটি তা-ই। মিঠাইগুলো থু থু করে ফেলে দিলাম আমি। তারপর মার মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম বারিন্দ্রদের বাড়ির দিকে।…

কিন্তু তারপরেই আচমকা মাটির নিচ থেকে ছুটে এলো উষ্ণ লাভাস্রোত, কালো কালো জ্বলন্ত ভস্মরাশি উড়তে শুরু করলো বাতাসে বাতাসে। শুনতে পেলাম, গত সপ্তাহেই অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করেছে বারিন্দ্র !

এবং সেই শহর থেকে পালিয়ে আসার জন্যে ডান পাটা সামনের দিকে বাড়িয়ে, বাঁ পায়ের গোড়ালিটা ওপরের দিকে তুলতেই—জ্বলন্ত ভস্মরাশির মধ্যে আমি একটা মৃতদেহ হয়ে গেলাম।…

আমার নগরীর ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে এই আমিই আমার সেই মৃতদেহ।

বাইরে একটা মাদি ঘোড়া ডেকে উঠতেই, গুলেরি ডাকটা চিনতে পেরে এক ছুটে বাড়ির বাইরে চলে এলো। ঘোড়াটা ওর বাপের বাড়ির গাঁয়ের। ওর ঘাড়ে মাথা রাখলো গুলেরি, যেন ওটা ওর বাপের বাড়ির দরজা।

গুলেরির বাবা-মা চাম্বাতে থাকেন। ওর স্বামীর গ্রামটা একটু উঁচু জায়গায়, সেখান থেকে চাম্বা মাত্র কয়েক মাইলের পথ। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তাটা এঁকেবেঁকে ভীষণ খাড়াখাড়ি ভাবে নিচের দিকে নেমে গেছে। ওখান থেকে দেখা যায়, দূরে পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে চাম্বা। বাড়ির জন্যে মন-কেমন করলেই গুলেরি ওর স্বামী মানাককে নিয়ে ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। দ্যাখে, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে চাম্বার ঘরবাড়িগুলো। তারপর বুক ভরা অহঙ্কারের আলো নিয়ে ফিরে আসে আবার।

বছরে একবার, ফসল কাটার পর, গুলেরিকে কয়েকটা দিন চাম্বায় ওর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়। গুলেরির দুই বান্ধবীরও বিয়ে হয়েছে চাম্বার বাইরে, তারাও ওই সময়ে বাপের বাড়িতে যায়। সারা বছর ওরা এই বাৎসরিক মিলনের পথ চেয়ে থাকে, তারপর প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় নিজেদের অভিজ্ঞতা, আনন্দ আর বেদনার কথা আলোচনা করে। পথে পথে একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায় ওরা। তারপর আসে ফসল তোলার উৎসব। ওই উপলক্ষ্যে মেয়েদের নতুন পোশাক হয়। ওরা তখন দোপাট্টাগুলোকে রঙ করে, মাড় দিয়ে, তাতে অভ্রের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়। আর কেনে কাচের চুড়ি আর রূপোর দুল।

গুলেরি চিরদিনই ফসল-কাটার দিন গোণে। শরতের বাতাস যখন আকাশের বুক থেকে মৌসুমী মেঘগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন ও বসে বসে চাম্বার বাড়িটার কথা ভাবে। প্রতিদিনকার বাঁধাধরা কাজগুলো শেষ করে—পোষা জীবগুলোকে খাইয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ীর রান্না সেরে আনমনা হয়ে চিন্তা করে আর কতো দিন বাদে বাপের বাড়ি থেকে কেউ ওকে নিতে আসবে।

এখন আবার সেই দিনটা এসে গেছে! মনের আনন্দে ঘোড়াটাকে আদর করে বাপের বাড়ির চাকর নাতুকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, পরের দিন রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে গুলেরি।

ওর মনের উচ্ছ্বাসকে ভাষায় রূপ দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। সেজন্যে ওর মুখের অভিব্যক্তিটুকুই যথেষ্ট। ওর স্বামী, মানাক, চোখ বন্ধ করে হুক্কা টানছিলো: মনে হচ্ছিলো, হয় তামাকটা তার পছন্দ হয়নি আর নয়তো সে বউয়ের মুখোমুখি তাকাতে পারছে না।

'তুমি চাম্বার মেলায় আসবে তো ? একদিনের জন্যে হলেও এসো কিন্তু!' গ্‌লোরি মিনতি করে বলে।

মানাক ছিলিমটাকে পাশে নামিয়ে রাখে. কোনো জবাব দেয় না।

'আমার কথার জবাব দিচ্ছো না যে বড়ো ?' সামান্য উষ্ণ হয়ে প্রশ্ন করে গ্‌লোরি। 'একটা কথা বলবো, শুনবে ?'

'আমি জানি, তুমি কি বলবে। তুমি বলবে : 'বছরের মধ্যে এই একটি বারই তো আমি বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যাই'। ঠিক কথা, কিন্তু এর আগে কোনোদিনই তোমাকে বাধা দেওয়া হয়নি।'

'তাহলে এবারেই বা তুমি বাধা দিচ্ছো কেন ?'

'শুধু এবারটি,' মানাক মিনতি জানায়।

'তোমার মা কিছুই বলেননি ! তাহলে তুমি কেন আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছো ?' গ্‌লোরি ছেলেমানুষের মতো একগ্‌ঁয়ে হয়ে ওঠে।

'আমার মা···' মানাক তার কথাটা শেষ করে না।

সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সকালে গ্‌লোরি ভোর হবার অনেক আগেই নিজেকে তৈরি করে নিলো। ওর কোনো বাচ্চাকাচ্চা নেই। তাই তাদের শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে রেখে যাবে, না নিজের সঙ্গে নিয়ে যাবে—সে ব্যাপারে ওর কোনো সমস্যাও নেই। নাতু মাদি ঘোড়াটাকে জিন পরালো। শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নিলো গ্‌লোরি. তাঁরা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ জানালেন।

'আমি তোমাদের সঙ্গে খানিকটা পথ যাবো.' মানাক বললো।

খুশিমনে রওনা হলো গ্‌লোরি। দোপাট্টার নিচে ও মানাকের বাঁশিটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিলো। খাজিয়ার গ্রামের পর রাস্তাটা খাড়াইভাবে চাম্বার দিকে নেমে গেছে। সেখানে পৌঁছে গ্‌লোরি দোপাট্টার নিচ থেকে বাঁশিটা বের করে মানাকের হাতে তুলে দিলো। তারপর মানাকের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'নাও, বাজাও তোমার বাঁশি।'

কিন্তু আপন চিন্তায় আত্মহারা মানাক ওর কথায় কোনো মনোযোগ দিলো না।

'বাজাচ্ছো না কেন ?' মিষ্টি করে জিগেস করে গ্‌লোরি।

মানাক বিষণ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়। তারপর বাঁশিটাকে ঠোঁটের কাছে তুলে নিয়ে এক আশ্চর্য বেদনাময় আর্তি ফুটিয়ে তোলে।

'গ্‌লোরি, তুমি যেও না !' আর বাজাতে পারছিলো না বলে বাঁশিটা গুলোরিকে ফিরিয়ে দেয় মানাক। 'আমি আবার বলছি, এবারটি তুমি না হয় না গেলে !'

'কিন্তু কেন ?' গ্‌লোরি প্রশ্ন করে। 'তুমি মেলার দিনে এসো, তারপর আমরা একসঙ্গে চলে আসবো। কথা দিচ্ছি, সেদিন আমি তোমাকে ফেরাবো না।'

মানাক আর অনুরোধ করে না।

ওরা পথের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। ওদের একটু একাকীত্বের সুযোগ দেবার জন্যে নাতু ঘোড়াটাকে নিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলো। মানাকের মনে পড়লো, সাত বছর আগে এমনি এক দিনে ফসল তোলার উৎসবে যোগ দেবার জন্যে সে আর তার বন্ধুরা এই পথ ধরেই চাষায় গিয়েছিলো। সেবারের মেলাতেই গ্লোরিকে প্রথম দেখেছিলো মানাক, তারপরই হৃদয়-বিনিময়। মানাকের মনে পড়লো, পরে গ্লোরির সঙ্গে নির্জনে দেখা করে ওর হাতটা ধরে সে বলেছিলো, 'তুমি একেবারে কাঁচা ফসলের মতো—দুধে ভরা।'

'কাঁচা ফসল খোঁজে জন্তু-জানোয়ারেরা,' এক ঝাঁকুনিতে নিজের হাতটাকে মুক্ত করে নিয়ে গুলোরি বলেছিলো, 'মানুষ সেটাকে ভেজে খেতে ভালোবাসে। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে চাও, তাহলে আমার বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসো।'

মানাকের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে রীতি ছিলো, বিয়ের আগেই কনের মূল্য পাকাপাকি করে নিতে হবে। মানাক বিচলিত হয়ে উঠেছিলো। কারণ গুলোরির বাবা মেয়ের জন্যে কতো দাম চাইবেন, তা সে কিছুই জানতো না। কিন্তু গুলোরির বাবা সম্পন্ন মানুষ, শহরে বাস করেছেন। তিনি শপথ করেছিলেন, মেয়ের বাবদে তিনি একটি পয়সাও নেবেন না—কিন্তু মেয়েকে তিনি ভালো বংশের কোনো উপযুক্ত তরুণের হাতে সমর্পণ করবেন। মানাক চিন্তা করে দেখলো, এই প্রয়োজনীয় শর্তগুলো সে সবই পূরণ করতে পারছে। তাই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওদের বিয়ে হয়ে গেলো।

গুলোরি ওর হাতখানা মানাকের কাঁধে রাখতেই গভীর চিন্তায় মগ্ন মানাক আচমকা যেন জেগে উঠলো।

'কিসের স্বপ্ন দেখছিলে গো?' গুলোরি ঠাট্টা করলো।

মানাক কোনো জবাব দিলো না। মাদি ঘোড়াটা ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার করে উঠলো। আর সামনের পথের কথা চিন্তা করে রওনা হবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো গুলোরি। তারপর বললো, 'এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে নীলমণি লতার একটা জঙ্গল আছে, জানো তো? লোকে বলে, কেউ ওর ভেতর দিয়ে গেলে কালা হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে তুমি যেন সেই নীলমণি লতার জঙ্গল পেরিয়ে এসেছো। আমার কোনো কথাই তুমি শোনোনি।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, গুলোরি।' মানাক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তুমি যা বলছো, আমি তার কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

দুজনেই তাকালো দুজনার দিকে। কেউই অন্যজনের মনের কথাটা বুঝতে পারলো না।

'আমি এবারে যাই', গুলোরি শান্ত সুরে বললো। 'তুমি বরং বাড়িতে ফিরে যাও, অনেকটা পথ চলে এসেছো।'

'তুমি তো এতোটা পথ হেঁটেই এলে! এবারে বরং ঘোড়াটায় উঠে বোসো।'

'এই নাও, তোমার বাঁশি।'

'ওটা তুমিই নিয়ে যাও।'

'মেলার দিন তুমি এসে বাজাবে ?' গুলেরির মুখে স্মিত হাসি। সূর্য ঝিলমিলিয়ে উঠলো ওর চোখদুটিতে। মানাক মুখ ঘুরিয়ে নিলো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলে, চাম্বার পথ ধরলো গুলেরি। মানাক ফিরে গেলো নিজের বাড়িতে।

বাড়িতে ঢুকে অবসন্নের মতো খাটিয়ায় শুয়ে পড়লো মানাক।

মা চিৎকার করে বললেন, 'সেই কতোক্ষণ আগে গেছিস ! একেবারে পাহাড়ের মাথা অব্দি গিয়েছিলি নাকি ?'

মানাকের কণ্ঠস্বরটা ভারি। ইচ্ছে হলো বলে. 'সব সময় বুড়িদের মতো অমন ক্যাটক্যাট করো কেন, বলো তো ? মাঝে মধ্যে একটু কাঁদলেও তো পারো !' কিন্তু সে চুপ করেই রইলো।

সাত বছর হলো মানাক আর গুলেরির বিয়ে হয়েছে, কিন্তু আজ অব্দি গুলেরির কোনো সন্তান হয়নি। মানাকের মা তাই গোপনে গোপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, 'আট বছরের পরে আমি কিছুতেই এটা মেনে নেবো না।'

এ বছরে তিনি তাই নিজের সিদ্ধান্ত মতো দ্বিতীয় বউ আনার জন্যে ইতিমধ্যেই পাঁচশো টাকা দিয়েছেন। মানাক জানে, এতোদিন উনি অপেক্ষা করেছিলেন গুলেরি বাপের বাড়িতে গেলেই নতুন বউ নিয়ে আসবেন বলে।

মা এবং সামাজিক প্রথার প্রতি অনুগত থাকায় মানাকের দেহটা নতুন নারীর আমন্ত্রণে সাড়া দিলো, কিন্তু তার বুকের ভিতর মনটা গেলো মরে।

একদিন খুব ভোরবেলা ছিলিম টানতে টানতে মানাক লক্ষ্য করলো, তার এক পুরনো বন্ধু সামনের পথ ধরে কোথায় যেন যাচ্ছে।

'আরে হেই ভবানী, এতো ভোর ভোর সকালে যাচ্ছিস কোথায় ?'

ভবানী থমকে দাঁড়ালো। ওর কাঁধে ছোট্ট একটা পুঁটলি। এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে সে জবাব দিলো, 'তেমন কোথাও নয়।'

'কোথাও না কোথাও তো নিশ্চয়ই যাচ্ছিস ! তা দুটো টান মেরে যাবি নাকি ?'

উবু হয়ে বসে মানাকের হাত থেকে ছিলিমটা তুলে নিলো ভবানী। তারপর বললো, 'আমি চাম্বার মেলায় যাচ্ছি।'

ভবানীর কথাটা একটা তীক্ষ্ণ সূচের মতো মানাকের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিঁধলো।

'মেলা কি আজকে ?'

'প্রতি বছর তো এই এক দিনেই হয়,' ভবানী শুকনো গলায় জবাব দিলো। 'তোর মনে নেই, সাত বছর আগে আমরা সেই একসঙ্গে গিয়েছিলুম ?'

ভবানী আর কিছু বলে না, কিন্তু তার নীরব ভর্ৎসনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে অশান্তি অনুভব করে মানাক। ছিলিমটা নামিয়ে রেখে ভবানী তার পুঁটলিটা তুলে নেয়। পুঁটলির

ভেতর থেকে তার বাঁশিটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। মানাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করে সে। যতোক্ষণ মানুষটা দৃষ্টির সীমানা থেকে উধাও হয়ে না যায়, ততোক্ষণ মানাকের দৃষ্টি তার বাঁশিটার দিকে স্থির হয়ে থাকে।

পরদিন বিকেলে ক্ষেতে কাজ করতে করতে মানাক দেখতে পায়, ভবানী ফিরে আসছে—কিন্তু ইচ্ছে করেই অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। ভবানীর সঙ্গে তার কথা বলার কোনো ইচ্ছে ছিলো বা মেলার কোনো কথাও সে শুনতে চাইছিলো না। কিন্তু ভবানী উলটো দিক দিয়ে ঘুরে এসে ঠিক মানাকের মুখোমুখি হয়ে বসে। ভবানীর মুখটা বিষণ্ন, অঙ্গারের মতো দীপ্তিহীন।

'গুলেরি মরে গেছে!' সাদামাঠা গলায় বললো সে।

'কি বললি?'

'তুই আবার বিয়ে করেছিস শুনে, ও পরনের শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলো।'

তীব্র বেদনায় মানাকের মুখের ভাষা হারিয়ে যায়। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে অনুভব করে, তার নিজের জীবনটাও জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

দিন যায়। মানাক আবার ক্ষেতে কাজ করতে শুরু করে। তাকে খেতে দিলে সে খায়। কিন্তু সে যেন একটা মরা মানুষ—মুখটা ভাবলেশহীন, দুচোখে শূন্যতা।

মানাকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী অভিযোগ জানায়, 'আমি ওর পরিবার নই, তবে আমাকে ও বিয়ে করেছে—এই যা!'

কিন্তু খুব শীগগিরি ও অন্তঃসত্ত্বা হয়। মানাকের মা খুশি হয়ে ওঠেন নতুন পুত্রবধূর প্রতি। মানাককে উনি বউয়ের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে দেন। কিন্তু মানাক এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন সে কিছুই বুঝতে পারেনি। তার দুচোখে তখনও সেই অসীম শূন্যতা।

মা তাঁর পুত্রবধূকে ভরসা দিয়ে আর সামান্য কটা দিন স্বামীর এমনধারা মেজাজকে মেনে নিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, বাচ্চাটা হবার পর তাকে তার বাপের কোলে বসিয়ে দিলেই, মানাক বদলে যাবে।

যথা সময়ে মানাকের স্ত্রীর একটি ছেলে হলো। মানাকের মা খুশি মনে বাচ্চাটাকে স্নান করিয়ে, সুন্দর পোশাক পরিয়ে, মানাকের কোলে এনে রাখলেন। নিজের কোলে নবজাত শিশুটার দিকে তাকিয়ে রইলো মানাক। তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ ধরে, যেন কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার—মুখে যথারীতি সেই ভাবলেশহীন অভিব্যক্তি। তারপর আচমকা তার শূন্য চোখদুটো আতঙ্কে ভরে উঠলো। মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত মানুষের মতো মানাক চিৎকার করতে শুরু করলো, 'ওকে সরিয়ে নাও! ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও! ওর গায়ে কেরোসিনের গন্ধ।'

পাচ বোন

এ কাহিনী এক বিস্তীর্ণ দেশের। স্ফটিক স্বচ্ছ হিমেল জলরাশি দুরন্ত বেগে ছুটে এসে ধুইয়ে দিয়েছিলো প্রাণের অপরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি। ফুলেরা তাদের সৌরভ ছড়িয়ে রেখেছিলো চারদিকে আর সাতটা রঙ সুন্দর পোশাক এনে দিয়েছিলো প্রাণকে। সূর্যের কিরণ সুধারসে ভরিয়ে তুলছিলো সমস্ত ফলগুলোকে। প্রাণ তখন দুচোখ ভরা নিবিড় উৎসাহ নিয়ে বাতাসকে বলছিলো :

'শুনেছি, এই শতাব্দীর পাঁচটি মেয়ে—তারা সবাই তরুণী আর সুন্দরী।'

'হ্যাঁ।'

'আজ আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো।'

বাতাস হাসলো।

'আমি পাঁচটা উপহার নিয়ে এসেছি– সব কটাই সমান দামী। ওদের প্রত্যেককে আমি একটা করে উপহার দেবো। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'

'তুমি যদি চাও—'

'প্রথমে আমি সব চাইতে বড়ো বোনটির কাছে যেতে চাই।'

'বেশ। কিন্তু মনে রেখো, ওর বাড়িতে কোনো জানলা নেই। শুধু একটি মাত্র দরজা— ওর স্বামী বেরুবার সময় সেটাতে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যান। আর উনি যখন ফিরে আসেন, তখন সেটা বন্ধ থাকে ভেতর থেকে।'

'তুমি বরং নিজের মধ্যে সৌরভের মতো আমাকে ঘিরে রেখো– তেমনি করেই আমি তোমার সঙ্গে ওর বাড়িতে যাবো।'

'না, মোটেই তা নয়। সৌরভে আমার ওজন বেড়ে যায়, তখন আমি আর ফাঁক-ফোকড় দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি না। ওর বাড়ির দেয়ালগুলো পার হতে গিয়ে আমি যে সময়টা ব্যয় করবো, তার মধ্যেই আমার পাঁজরগুলো একেবারে ভেঙে যাবার মতো অবস্থায় গিয়ে ঠেকবে।'

তারপর বাতাস পাঁচ বোনের মধ্যে সব চাইতে বড়ো বোনের বাড়িতে নিযে গেলো প্রাণকে।

প্রাণ দেখলো, একটা বিশাল পাঁচিলের গায়ে অসংখ্য ছবি খোদাই করা রয়েছে। কয়েক শো·· কয়েক হাজার ছবি।

'দেয়ালটা এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে রয়েছে। কোনোদিনও এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয়নি এমন কোনো নারী এ বাড়িতে মারা গেলে, এ দেশের মানুষ ওই দেয়ালের গায়ে তার ছবি খোদাই করিয়ে রাখে।'

'এ বাড়ির কোনো বাসীন্দা কি কোনোদিনও ওই চৌকাঠটা পেরোয় না ?'

'না, প্রাণ—কোনোদিনও না।'

'কি নাম, ওই দেয়ালটার?'

'ঐতিহ্য—যার কিছুটা চাপিয়ে দিয়েছে বংশগতি, কিছুটা ধর্ম। আর বাদবাকিগুলো সমাজের চাপানো ঐতিহ্য।'

'কিন্তু আমি অন্তত একবার এ বাড়ির নারীটিকে দেখতে চাই।'

'সূর্যের কিরণও তাকে দেখতে পায়নি। তা হলে তোমার পক্ষে সেটা কি করে সম্ভব হবে?'

'কিন্তু বাতাস, আমরা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। তুমি কোন্ সময়ের কথা বলছো?'

'এখানে শতাব্দী শুধু এ বাড়ির উপান্তে ঘুরে ঘুরে মরে। দশ শতাব্দীর উত্তরণেও এখানকার বাসীন্দাদের পরিবর্তন হয়েছে সামান্যই, অথবা কিছুই না।'

'আমি ওর জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি।'

'তোমার উপহার কোনোক্রমে ওর কাছে গিয়ে পৌঁছলেও, ও কোনোদিনও নিজের হাতে তা স্পর্শ করতে পারবে না।'

'কেন?'

'কারণ এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই ওর কাছে বর্জনীয়।'

'ও কি আমার কথাও শুনবে না?'

'না। এই দেয়ালের বাইরে থেকে যাওয়া সমস্ত শব্দই ওর শ্রুতির আগোচরে থেকে যায়।'

'তুমি কি বলছো, বাতাস? শত হলেও, ও একটা অল্পবয়সী মেয়ে!'

'হায় প্রাণ! তুমি সম্ভবত বছরের হিসেবে কথাটা বলছো। কিন্তু এ বাড়ির মেয়ে কোনোদিনই যৌবনে পৌঁছোয় না। শৈশবের বুকে বাস করার সময়েই বার্ধক্য এসে তাকে জয় করে নেয়।'

• • •

পরাজিত আত্মার মতো আতঙ্কিত হয়ে এগোতে গিয়ে প্রাণের পাদুটি টলতে থাকে।

বাতাস বলে, 'এই শতাব্দীর দ্বিতীয় একটি মেয়ে আছে।'

'কোথায়?'

'ওই তো, রেলপথ থেকে কয়লা কুড়োচ্ছে।'

একটি মহিলা—দেখে মনে হয় বছর তিরিশেক বয়েস, শরীরের পাশের দিককার অনাবৃত অংশটুকু ওড়নায় ঢাকা—ডান হাতে মুঠো ভর্তি কয়লা তুলে ঝুড়িটার মধ্যে রাখতে রাখতে গজ দশেক দূরে শুইয়ে রাখা নিজের মেয়েটার দিকে তাকালো। মেয়েটির কান্না ক্রমশই আরও কর্কশ আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিলো। মহিলা ঝুড়িটাকে এক পাশে নামিয়ে

রেখে মেয়েটিকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলো। বাচ্চাটা বারবার ওর স্তনবৃন্তদুটিকে নিয়ে টানাটানি করছিলো, কিন্তু দুধ আসছিলো না বলে ফের সে কান্না জুড়ে দিলো।

প্রাণ ওর কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকলো, 'বোন !'

মহিলা সম্ভবত ওর ডাক শুনতে পায়নি।

প্রাণ আরও কাছে গিয়ে ফের ডাকলো, 'বোন !'

মহিলা নৈর্ব্যক্তিক চোখে প্রাণের দিকে তাকালো, তারপর অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলো নিজের চোখদুটিকে—যেন তাকে নয়, অন্য কাউকে ডাকা হয়েছে।

এবারে প্রাণের ঠোঁটদুটি স্ফুরিত হয়ে ওঠে, 'বোনটি !'

উদাস চোখে প্রাণের দিকে তাকিয়ে আগের মতোই নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় মহিলা প্রশ্ন করে, 'কে তুমি ?'

'আমি প্রাণ।'

কাঁদতে থাকা মেয়ের প্রতি ফের মনোযোগী হয়ে ওঠে মহিলা—যেন পার্শ্ববর্তিনীর কথায় ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

'আমি তোমার দেশে, তোমার শহরে, তোমার বাড়িতে এসেছি…'

দেশ, শহর এবং বাড়ি সংক্রান্ত এই সমস্ত কথাবার্তা মহিলা কিছুই সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

'আজ আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।'

মহিলা হিংস্র চোখে প্রাণের মুখের দিকে তাকায়—যেন বলতে চায়, ওর পক্ষে এ ধরনের রসিকতা করা উচিত নয়।

'তোমার মেয়েকে বুকের দুধ দিচ্ছো না কেন ? বেচারী কাঁদছে যে !'

*

মহিলা প্রথমে নিজের জীর্ণ শরীর, তারপর মেয়ের শুকিয়ে ওঠা মুখখানা ভালো করে লক্ষ্য করে। প্রশ্নটার মর্মার্থ বুঝতে পারে না ও। দুধ থাকলে কেন ও বাচ্চাটাকে বুকের দুধ দেবে না ?

'এখান থেকে তোমার বাড়ি কতোদূর ?'

'ওই নোংরা নর্দমাটার ওধারে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

'কিন্তু বাড়ি নামের যোগ্য কোনো বাসা আমার নেই। ওটা স্রেফ একটা নল-খাগড়ার ছাউনি।'

'তাতে কি এসে যায় ?'

'ঘরে কোনো খাটিয়াও নেই। তার বদলে তুমি দেখবে এক জোড়া চটের থলি।'

'তোমার স্বামী ?'

'সে অসুস্থ।'

'উনি কি করতেন ?'

'একটা কারখানায় মজুরের কাজ করতো। কিন্তু গত বছরের ছাঁটাইতে ওকেও কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তারপর ?'

'আজ এক বছর হলো সে অসুস্থ।'

'এটি কি তোমার একমাত্র সন্তান ?'

'একটা ছেলেও আছে, কিন্তু…'

'সে কোথায় ?'

'একদিন—ওর তখন ভীষণ খিদে পেয়েছিলো বলে ও একজন বড়োলোকের গাড়ি থেকে একটা আপেল চুরি করেছিলো। তাই পুলিস ওকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'আমি কি তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে যেতে পারি ?'

'কিন্তু…কে তুমি ?'

'আমি প্রাণ।'

'আমি জন্মেও তোমার নাম শুনিনি।'

'ছোটোবেলায় যখন গল্পটল্প শুনতে, তখন মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই শুনেছো।'

'আমার মা অনেক গল্প জানতো। বাবা ছিলো একজন চাষী, কিন্তু তার নিজের কোনো জমি ছিলো না। আমার দিদির বিয়ের সময় আমরা যে টাকাটা ধার করেছিলাম, সেটা আর শোধ করা যাচ্ছিলো না। মহাজন আমাদের পোষা জন্তুগুলোকে নিয়ে গেলো, বাবা দূরদেশে চলে গেলো কাজ খুঁজতে। তখন মা রাত্তিরবেলা ঘুমোতে পারতো না—আমাকে দত্যি-দানা আর ভূতপ্রেতের গল্প বলতো। কিন্তু তোমার নামটা আমি কোনোদিনও শুনিনি।'

'বাবা দূরদেশ থেকে কি নিয়ে এলেন ?'

'মা বলতো, বাবা অনেক সোনাদানা নিয়ে আসবে। কিন্তু বাবা আর এলোই না !'

তারপরেই মহিলা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। 'কিন্তু তুমি আমার বাড়িতে যেতে চাইছো কেন ?' প্রশ্ন করে ও।

'আমি…' প্রাণ আর কিছু বলতে পারে না।

মহিলা কয়লার ঝুড়িটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'আমি তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি,' প্রাণ নির্যাস আর রঙে ভরা একটা ঝুরি এগিয়ে দেয় ওর দিকে।

'না, বোন। ওটা তুমিই রাখো,' সচকিত হয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় মহিলা।

'আমি এটা তোমার জন্যেই এনেছি !'

বাড়িতে ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত পা চালায় মহিলা। কিন্তু প্রাণকে তখনও পেছন-পেছন আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে থমকে দাঁড়ায় ও।

'তুমি ফিরে যাও, বোন। আমার পিছু পিছু এসো না। অচেনা মানুষকে আমার ভারি ভয়। একবার এক অল্পবয়সী শহুরে বাবু এসে কথা দিয়েছিলো আমার স্বামীকে চাকরি করে দেবে, আমার ছেলেকে কয়েদখানা থেকে ছুটি করিয়ে দেবে। আমি পড়শীদের কাছ থেকে আটা ধার করে এনে তাকে রুটি ভেজে খাইয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেকে দেখার জন্যে তার সঙ্গে শহরে যাবার সময়, সে পথের মধ্যে…পথের মধ্যে…'

বলতে বলতে মহিলার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো শিউরে ওঠে, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে চলে যায় ও।

* * *

প্রাণের চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বাতাস বলে, 'এবারে চলো তোমাকে তৃতীয় বোনের বাড়িতে নিয়ে যাই।'

একটা প্রাসাদোপম বাংলোবাড়ির কাছ দিয়ে যাবার সময় বাতাস প্রাণের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে, 'এইটে ওর বাড়ি।'

সদর দরজায় দারোয়ান ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে একটা চাকরাণীর মাধ্যমে ভেতরে খবর পাঠায়। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয় প্রাণকে। অবশেষে অনুমতি পেয়ে একটার পর একটা কাচের দরজা এবং একের পর এক রেশমি পর্দা পেরিয়ে একটা বিশেষ ঘরে গিয়ে পৌঁছোয় ও।

ঘরের এক কোণে রাখা একটা শ্বেতপাথরের নারীমূর্তিকে তখন জল ছিটিয়ে ধোয়ানো হচ্ছিলো। তাছাড়া কাছেই কুর্সীতে বসেছিলেন একটি মহিলা—তার গায়ের রঙও শ্বেত পাথরের মতো। রেশমি সুতী ওর অঙ্গখানিকে আবরিত করতে সচেষ্ট।

দাঁড়ানো নারীমূর্তিটার দিক থেকে কোনো সাড়া এলো না। কিন্তু বসে থাকা মূর্তিটি বললো, 'কে তুমি? আমি তোমাকে চিনতে পারছি না।'

প্রাণ ঘুরে দাঁড়ালো, কিন্তু প্রাণময় কিছু দেখতে পেলো না। দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটাকে স্পর্শ করে দেখলো, পাথরের মতো কঠিন। তারপর বসে থাকা মূর্তিটিকে স্পর্শ করলো ও—রবারের মতো নরম।

'আমি প্রাণ,' অস্ফুটে বললো ও।

'ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে তোমার নামটা কোথায় যেন শুনেছি। হয়তো ছেলেবেলায় কোনো বইটইতে পড়েছি।'

'কোনো বইতে?'

'হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে। আমার সহপাঠী একটি ছেলে কবিতা লিখতো। একবার সে তার লেখা গানের একটা খাতা আমাকে উপহার দিয়েছিলো। ওর মধ্যেই তোমার নামটা ছিলো।'

'সে এখন কোথায়?'

'সে বেচারার কোনো খবরই আমি জানি না।'

'আর তার গানগুলো ?'

'এই নতুন বাংলোতে আসার সময় আমি পুরনো সব কিছুই ফেলে রেখে এসেছি। এখানকার সমস্ত জিনিসই আমাদের নতুন কেনা।'

'দেখে মনে হয় খুব দামী।'

'আমার স্বামী একজন 'রইস আদমি'। আশা করছি আসছে নির্বাচনে উনি ফের একজন 'জাঁদরেল মানুষ' নির্বাচিত হবেন। আমরা ইচ্ছে করলেই যে কোনো সময়ে যে কোনো জিনিস বিনা অসুবিধেয় কিনে ফেলতে পারি।'

রবারের মতো মহিলাটি টেবিলে পড়ে থাকা ফুলগুলো প্রাণকে উপহার দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

প্রাণ ফুলগুলোকে স্পর্শ করতেই কেমন যেন একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ অনুভব করলো।

'এই ফুলগুলো আমি এক্ষুনি চাকর-বাকরদের দিয়ে তুলিয়েছি। ঝি বোধহয় ফুল-গুলোকে ধোয়নি। তাই হয়তো একটা বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে—চাকর-বাকরদের হাতের গন্ধ। ...আজ কিন্তু বেশ গরম, তাই না ? আমার যেন একটু অসুস্থ লাগছে।'

'তুমি চাইলে, আমি তোমাকে বাইরের খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজে থেকেই প্রস্তাব জানালো প্রাণ।

'না, আমি এভাবে বাইরে বেরুতে পারি না। অন্য জাতের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা আমাদের সম্মানের পক্ষে হানিকর। সত্যি কথা বলতে কি, অপারেশনের পর আমার কিছু কিছু অসুখ কিন্তু সারেনি। তাই এখনও আমার মাঝে মাঝে ভীষণ যন্ত্রণা হয়।'

প্রাণ উঠে, রবার সদৃশ মহিলাটির নাড়ি পরীক্ষা করলো এবং ওর শরীরটাকে স্পর্শ করে বললো, 'তোমার হৃৎপিণ্ডটা চলছে না কেন ? ওটা যে একেবারে নিস্তব্ধ আর পাথরের মতো ঠাণ্ডা !'

'ওখানেই তো অসুবিধেটা রয়ে গেছে ! আমার স্বামী বলেছেন, এবারে আমাদের কোনো বিদেশে যেতে হবে—হয়তো বা আমেরিকায়। কারণ সেখানকার ডাক্তাররা ভীষণ দক্ষ। সেখানে ফের আমাকে অপারেশন করাতে হবে।'

'কিসের জন্যে ?'

'কোনো নব বিবাহিতা কোনো 'নামজাদা পরিবারে' এসে যোগ দিলে প্রথম রাতেই দেশের নামজাদা ডাক্তারদের দিয়ে তাকে অপারেশন করানো হয়। উঁচু তলার সমাজে এটাই প্রচলিত রীতি।'

'বিয়ের রাতে অপারেশন ?'

'হ্যাঁ ! মেয়েটির শরীরটাকে কাটাকুটি করার পর ওর হৃৎপিণ্ডটাকে বের করে ফেলে, তার জায়গায় একখণ্ড সোনা রেখে দেওয়া হয়। আমার অপারেশনটাতে খানিকটা ত্রুটি রয়ে গেছে। তাই মাঝে মাঝে আমি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করি। আর একবার অপারেশন করা হলে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবো।'

'আমি তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি।'

'না। আমার স্বামী এখন কারুর কাছ থেকে কোনো উপহার নিতে বারণ করেছেন—কারণ নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে। তাছাড়া দেশের সব কটা প্রতিষ্ঠিত কারখানায় আমাদের অংশ রয়েছে। কাজেই এ ধরনের ছোটোখাটো উপহার নেওয়া আমাদের সাজে না।'

দূর-আলাপনীতে ঘণ্টি বাজছিলো। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে নিয়ে দু-চারটে কথা বললেন মহিলা। তারপর বললেন, 'বোন, আমাকে তোমার যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে বরং অন্য কোনো সময়ে এসো। এখন আমার স্বামী তাঁর দলের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে বাড়িতে আসছেন।'

• • •

তারপর বাতাস প্রাণের হাত ধরে চতুর্থ বোনের বাড়িতে নিয়ে গেলো।

বাড়িটা নেহাতই সাধারণ, কিন্তু বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িটার উজ্জ্বলতায় চোখে ধাঁধা লেগে যায়। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রাণ ভেতরে উঁকি মেরে তাকায়। বাইশ-তেইশ বছরের একটি তরুণী ওর বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে। যে সমস্ত জিনিস নেহাতই অপরিহার্য, ঘরে শুধু তেমনি জিনিসই রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তরুণীর পোশাক-আশাক প্রচণ্ড জমকালো।

দরজায় আলতো করে টোকা দিলো প্রাণ।

'কে ওখানে ? দয়া করে আস্তে টোকা দিন।' তরুণী দরজার কাছে আসে, 'নইলে আমার বাচ্চাটার ঘুমের ব্যাঘাত হবে।' তারপরেই হতচকিত হয়ে ওঠে ও, 'তুমি···তুমি···'

'আমি প্রাণ !'

'জানি।'

'তুমি জানো ?'

'সারাটা জীবন আমি তোমার ছায়ার পেছনে ছুটেছি। এখন আমি ক্লান্ত, নিঃশেষিত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। তুমি বরং চলে যাও—যেখান থেকে এসেছো, সেখানেই ফিরে যাও। দেখছো না, আমার দরজার সামনে গণ্ডি দেওয়া রয়েছে ? ওটা তুমি পেরোতে পারবে না। ওটা তুলে দেওয়াও যায় না। তুমি যাও এখান থেকে···যাও—' হাঁপাতে শুরু করে তরুণী।

'লক্ষ্মী বোনটি আমার···'

'বোন ? আমি কারুর বোন নই, কারুর মেয়ে নই, কিচ্ছু নই।'

প্রাণ ঘুমন্ত শিশুটার দিকে দৃষ্টি স্থির করে, 'তোমার সন্তান···'

'আমার সন্তান···আমার···কিন্তু কেউ ওর পিতৃত্ব দাবি করে না।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমাদের দেশে যখন স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপন হলো, তখন আমার হাড়গুলো তার কাঠামোটার ভার বহন করেছে। আমাদের মাটিতে যখন স্বাধীনতার গাছ পোঁতা হলো

তখন আমার রক্ত তাকে জল দিয়েছে। কিন্তু সেদিন রাতে যখন চারদিকে আনন্দের আলো জ্বলছে, তখন আমার ইজ্জত আমার মান সম্মানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। এই শিশু সেই রাত্রির ফসল, সেই আগুনের ভস্ম, সেই আঘাতের ক্ষতচিহ্ন... ...'

'হায়রে, দুখিনী বোন আমার!'

'সেদিন থেকে প্রতি রাত্রে সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। প্রায়ই আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, আমার নিষ্পাপ হাতদুটিতে তুমি চিরসবুজ-সুগন্ধি-পাতার স্পর্শ বুলিয়ে দেবে, আমার মায়ের বাড়ির প্রাঙ্গণ পল্লীগীতির সহজ সুরে ভরে উঠবে, আমি নিজের কানে বিয়ের সানাই শুনতে পাবো। আমাদের গাঁয়ের একটি শক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবান তরুণ ছিলো আমার সমস্ত স্বপ্নের নায়ক। আমি তখনও তোমার ছায়ার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি। কিন্তু আচমকা আমাদের গ্রামটা লুট হয়ে গেলো, আমার বাবাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলা হলো, আমার ভাইকে খুন করা হলো আর একটা ঘৃণ্য সাপ এসে হুল ফুটিয়ে দিলো আমাকে। তারপর আর একটা সাপ ..তারপর আর একটা...মানুষের মাথাওলা এই সাপগুলো একবার কোনো মেয়েকে কামড়ালে, সে আর কোনোদিনও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না—বিষে জরোজরো হয়ে কোনো রকমে সে শুধু বেঁচে থাকে।

'তারপর আমি তোমার আরও একটা ছায়া দেখতে পেলাম। দেশের লোক আমাকে বললো, ওই সাপগুলোর বজ্রআঁটুনি থেকে আমি মুক্তি পাবো, আমার শরীর থেকে ওদের বিষ টেনে বের করা হবে, আমার সতীত্ব আমার সরলতা আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমার ছায়ার পেছনে ছুটলাম—কিন্তু দেখা গেলো, সেটা মরীচিকা···স্রেফ মরীচিকা। আমার স্বপ্নের নায়ক আমাকে গ্রহণ করতে রাজি হলো না। একেবারে দরজা থেকেই সে আমাকে ফিরিয়ে দিলো। আবার সেই বিষ পান করতে হলো আমাকে। এইমাত্র যে সাপের কথা বললাম, তেমনি আরও অনেক সাপ পেঁচিয়ে ধরলো আমাকে। আমার বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে, দ্যাখোনি? কি ঝকঝকে গাড়ি! একটা মস্ত বড়ো সাপ ওটার মালিক। আজ রাতে সে আমাকে হুল ফোটাবে।'

• • •

প্রাণের মুখে কথা সরে না। ওর হাতের উপহারটা চোখের জলে সিক্ত হয়ে ওঠে।

'আমার জন্যে কি এনেছো তুমি—উপহার? দেখতে পাচ্ছো না আমার সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে? আমি স্পর্শ করলে তোমার উপহার, তোমার বর্ণ, তোমার সুগন্ধ—সবই বিষাক্ত হয়ে যাবে। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষে ভরা ..বিষ ..আর কিছু নেই।'

অচেতন হয়ে পড়া প্রাণের মুখে বাতাস সোহাগের স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। তারপর জ্ঞান ফিরলে ওকে নিয়ে যায় পঞ্চম বোনের বাড়িতে।

বিশ বছরের একটি সুদর্শনা মেয়ের চতুর্দিকে অসংখ্য বই, বাদ্যযন্ত্র আর হরেক রকমের রঙ ছড়ানো। প্রাণ খানিকটা স্বস্তি অনুভব করে। সুন্দরী মেয়েটি আঙুল দিয়ে একটা বাদ্যযন্ত্রের তারগুলোকে স্পর্শ করতেই মধুর সুরে বাতাস ভরে ওঠে। ও গান গাইতে থাকে,

ওর দু চোখে অশ্রুবিন্দু ঝিলমিলিয়ে ওঠে আকাশের নক্ষত্রের মতো। তারপর এক টুকরো কাগজে রঙের হালকা রেখায় সুন্দর একটা ছবি আঁকে মেয়েটি।

ওর দক্ষ হাতদুটিতে চুমু দিয়ে ইচ্ছে হয় প্রাণের। সুমধুর সুরের জাদু, আশ্চর্য বাণী আর অপরূপ অঙ্গরেখায় ভরে ওঠে সমস্ত পরিবেশ। প্রাণ বড়ো করে একটা নিঃশ্বাস নেয়। তারপর সুগন্ধি আর রঙে ভরা ঝুড়িটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

মেয়েটি বিস্মিত হয়ে ওঠে।

'আমি প্রাণ।'

'জানি···' মেয়েটি বলে, কিন্তু আর কিছুই বলতে পারে না।

• • •

আচমকা প্রাণ থমকে দাঁড়ায়। বাড়ির সামনে লাগানো লোহার সরু তারে ওর গতি ব্যাহত হয়।

'এই মুহূর্তে আমি তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছি না', মেয়েটি মাথা নিচু করে।

'কেন ?' প্রাণ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ওঠে।

'আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন স্বপ্নের মধ্যে অথবা যখন জেগে থাকি তখন কল্পনার মধ্যে তুমি যদি আমার কাছে আসো—তাহলে আমি অনন্তকাল ধরে তোমার সঙ্গে কথা কইবো, তোমাকে গল্প শোনাবো, তুমি যা বলতে চাও তা সবই শুনবো। তা ছাড়া আমি সর্বদাই তোমার ছায়াটাকে ধরতে চেষ্টা করি। দ্যাখো, এই রঙ দিয়ে আমি ছবি এঁকেছি তোমার···এই তারযন্ত্রের সুরে সুর মিলিয়ে আমি তোমারই গান গেয়েছি···তোমার ভালোবাসার কাহিনী লিখে দিয়েছি এই কলম দিয়ে···'

'কিন্তু আজ আমি নিজে তোমার কাছে এসেছি, আর তুমি···তুমি···'

'আস্তে কথা বলো···ভীষণ আস্তে !···আমার বাড়ির সবকটা দেয়ালে গর্ত রয়েছে··· হাজারটা চোখ সর্বদা আমার গতিবিধির দিকে নজর রাখছে। এই গর্তগুলোর ভেতরে তাকিয়ে দ্যাখো···প্রতিটা গর্তের পেছনে এক জোড়া করে ভয়ংকর চোখ। চোখগুলো লাভায় ভরা। প্রতিটা জিভ থেকে হাজার হাজার তীর ছুটে বেরোয়। আমি তোমার পাশে এক মুহূর্ত বসলে ওদের তীর তৎক্ষণাৎ আমার রঙের বাটি উলটে দেবে, আমার বাজনার তারগুলোকে এলোমেলো করে ফেলবে, তছনছ করে দেবে আমার গানের প্রতিটা বাণী। আর এই চোখগুলোর লাভা···'

'কিন্তু এরাই তো তোমার গান শোনে, তোমার গল্প পড়ে, তোমার আঁকা ছবি দ্যাখে···'

'এ দেশের শিল্পীরা শুধু তোমার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে, তারা তোমার মুখ দেখতে পারে না। যদি কেউ কোনোক্রমে তোমার মুখখানা দেখে ফেলে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।···শোনো প্রাণ, তুমি বরং চলে যাও। কেউ হয়তো তোমাকে এখানে দেখে ফেলবে !···শুধু স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও তোমাকে অভ্যর্থনা করার জায়গা

আমার নেই !...'

'আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি।'

'শুধু তখনই আমি তা নেবো।...কিন্তু তুমি এসো! আমি তোমার জন্যে নতুন করে পরমানন্দ রচনা করবো। তুমি দয়া করে এসো, প্রাণ—তোমার উপহারের ডালি দিয়ে আমি আমার স্বর্গ সাজিয়ে তুলবো। এসো প্রত্যুষের প্রথম প্রহরে—তখন আমি তোমার ভালোবাসার কবিতা লিখবো, তোমার সুরুচির ছবি আঁকবো, তোমার সৌন্দর্যের গান গাইবো। কিন্তু এখন তোমাকে চলে যেতে হবে, নয়তো কেউ তোমার উপস্থিতি জেনে ফেলবে।...'

প্রাণের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় মেয়েটি।

ও যখন বিছানা থেকে উঠলো, তখনও রাত শেষ হয়ে ভোর হয়নি। চিরদিনই ও খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু আজ একটা বিশেষ দিন—আজ ওর উপোসের সপ্তম আর শেষ দিন।

উনুনে শুকনো চেলাকাঠগুলো সাজিয়ে নিলো ও। তারপর আগুন ধরিয়ে আলু সিদ্ধ করার জন্যে এক ডেকচি জল বসিয়ে দিলো উনুনে। ঘরের এক কোণে দেরাজ-আলমারিটার মধ্যে সিঙ্গারার জন্যে খানিকটা ময়দা রয়েছে—এই বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্যেই ময়দাটুকু সযত্নে জমিয়ে রেখেছে ও। কিন্তু যতোদিন উপোস চলবে, ততোদিন ওর ময়দা ছোঁয়া বারণ।

ওর মনে পড়লো, পর দিন ওকে আরও একটু ভোরে উঠতে হবে। কন্‌জাক্‌রা আসবে, তাদের মসূর ডাল আর আলু ভেজে দিতে হবে। হালুয়ার জন্যে খানিকটা সূজীর কথা ও আগে থেকেই মুদীকে বলে রেখেছে। পুরির জন্যে জোগার করে রেখেছে ভালো আটা। ওই বিশেষ দিনের কথা ভাবতে গিয়ে ও কল্পনায় দেখতে পেলো, ও প্রদীপ জ্বালছে··· কন্‌জাক্‌রা আসবে···ও তাদের ছোটোছোটো সুন্দর পাগুলোকে ধুইয়ে দেবে···ওদের হাতে বেঁধে দেবে লাল রঙের পবিত্র সুতো···খেতে দেবে, দক্ষিণা দেবে···তারপর নিজের মাথাটা নামিয়ে আনবে ওদের পায়ের কাছে - নিষ্পাপ ছেলে-মেয়েদের পা, যা দেহ আর মনের পবিত্রতার প্রতীক।

ওর ভাবনারা অতীতের দিকে ফিরে যায়। অনেক বছর আগে ওর বয়েস যখন ন-বছর, তখন ওর মায়ের এক বান্ধবী ওকে কন্‌জাক্ হিসেবে নেমন্তন্ন করেছিলো। সেদিন ও গোলাপী দোপাট্টা পরেছিলো, হাতে পরেছিলো হলদে রঙের কাচের চুড়ি। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলো অল্প বয়েসী একটি ছেলে—ভারি সুন্দর ছেলেটি। সে ওর মায়ের বান্ধবীর ভাই-পো।

একটা বছর যেতে না যেতে, ওর বয়েস দশ বছর পূর্ণ হবার আগেই, সেই ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হলো ওর—মায়ের সেই বান্ধবীর ভাই-পোর সঙ্গে। ছেলেটি ওর গলায় বিয়ের সোনালি মালা পরিয়ে দিলো। সুন্দর পোশাকে কনে-বউটি সেজে শ্বশুর বাড়ি চলে গেলো ও।

শ্বশুর বাড়িতে মাত্র একটা রাত কাটিয়েই ও বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিলো। এর পরের বার যাবে আর দু বছর বাদে। সবাই তখন বলেছিলো : 'এখন ও আর কুমারী নয়, এখন ও কনে-বউ।'

তারপর আর একদিন, বড়ো জোর ন-টা মাস যেতে না যেতেই, ওর বাড়ির সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। সবাই বললো : 'এখন ও আর কনে-বউ নয়, এখন ও বিধবা।'

স্বামীকে ও সামান্যই চিনেছিলো। তাঁর মৃত্যুর সময় ও তাঁর কাছে ছিলো না। বিয়ের দিন সে যখন ঘোড়ার পিঠে চেপে এসেছিলো, তখনও ও তাঁকে দেখতে পায়নি। তাঁর

সম্পর্কে সেই একটা দিনের কথাই মনে আছে ওর, যেদিন গোলাপী দোপাট্টা আর হলদে রঙের কাচের চুড়ি পরে ও একজন কন্‌জাক্‌ হিসেবে ওর মায়ের বান্ধবীর বাড়িতে গিয়েছিলো —সেদিন পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে সে-ও ছিলো সেখানে।

আর আজ ও নিজেই কন্‌জাক্‌দের আমন্ত্রণ জানাতে চলেছে। তাদের ছোটোছোটো ছিপছিপে হাতগুলোকে ও ধুইয়ে দেবে। তারা হবে ওর ছোট্টো ছোট্টো দেব-দেবী। পরম শ্রদ্ধায় নিজের মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে আনে ও, নামিয়ে আনে প্রায় নিজের পায়ের কাছাকাছি। তারপরেই নিজের পায়ের দিকে চোখ পড়ে ওর। পা দুটো এখন বড়ো হয়ে গেছে। নোংরা-পা। চামড়াগুলো পুরু আর শক্ত হয়ে ফেটে ফেটে গেছে। চমকে ওঠে ও। ওর মনে হয়, ছোটো ছোটো কুমারী মেয়েদের পা-গুলোও ছোট্টো, হাতগুলো নরম আর নিটোল। নিজের বাহু দুটিকে পরখ করে দেখে ও—সামান্য পেলবতাও আর অবশিষ্ট নেই, এতোটুকুও কোমলতা নেই···স্রেফ খানিকটা মাংসপেশী ঝুলে রয়েছে বাহুর হাড়টা থেকে।

আসছে কাল সুন্দর সুন্দর অপাপবিদ্ধ ছেলে-মেয়েরা সারি বেঁধে বসবে। সেই ছোট্টো ছোট্টো দেব-দেবীদের কাছে নিজের মাথাটা নিচু করবে ও। ভাবতেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও, হৃৎপিণ্ডটা চলতে শুরু করে দ্রুতলয়ে। ওর মনে হয়. ও নিজেও যেন কন্‌জাক্‌দের মধ্যে বসে রয়েছে। কে যেন ওদের পা ধুইয়ে, মনিবন্ধে পবিত্র সুতো বেঁধে, কপালে লাল ফোঁটা পরিয়ে দিলো। তারপর পবিত্র আগুনের সামনে সকলে মিলে মাথা নোয়ালো ওরা। কিন্তু হঠাৎ ওর ঘোমটায় আগুন ধরে গেলো। পা দুটো আবার শক্ত হয়ে ফেটে-ফেটে গেলো, হাতের মাংসগুলো ঝুলতে লাগলো থলথলে হয়ে, তাপদগ্ধ ঘোমটার নিচে ধূসর হয়ে উঠলো মাথার চুলগুলো।

'মা', পাশের ঘর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। গতি স্তব্ধ হলো ওর চিন্তা-ভাবনার। মনে পড়লো, ও সিদ্ধ করার জন্যে ডেকচিতে আলু বসিয়েছে। এখনও মালতিকে চা দিয়ে আসা হয়নি।

'আসছি গো মেয়ে', জবাব দিলো ও।

মালতি ওর নিজের মেয়ে নয়। ওর নিজের কোনো মেয়ে থাকা সম্ভবও নয়! ওর যখন দশ বছর বয়েস, তখনই ওর স্বামী মারা যায়। তাঁর মৃত্যুর সময় ও ছিলো বাপের বাড়িতে। খবরটা এসে পৌঁছবার পর ওর বাড়ির আর পাড়া-প্রতিবেশী অন্যান্য মেয়েরা একত্র হয়ে ওর রঙীন পোশাক আর গয়নাগুলোকে খুলে দিয়েছিলো। ওরা সবাই তখন কেঁদেছিলো আর হা-হুতাশ করেছিলো।

দু বছর বাদে ওর শ্বশুর বাড়িতে যাবার কথা ছিলো। কিন্তু স্বামী মারা যাবার জন্যে দু বছর পূর্ণ হবার সোয়া এক বছর বাকি থাকতেই ওকে সেখানে যেতে হয়েছিলো। ওকে বরণ করে নেবার জন্যে সেদিন কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান হয়নি। শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত পুত্রের সম্মান অটুট রাখার জন্যেই সেদিন শ্বশুর বাড়িতে আসতে হয়েছিলো ওকে।

কালক্রমে শ্বশুর-শাশুরি মারা গেলেন। মারা গেলেন ওর নিজের বাবা-মা-ও। সেই

থেকে দেবরের সংসারে ওর বাস।

মালতি ওর জায়ের মেয়ে। প্রথম দিকে ওর জায়েরও কোনো সন্তান হয়নি। তাই ওদের ভয় ছিলো—ওরা মারা গেলে ওদের মৃতদেহের ওপরে মিঠাই ছোঁড়ার, ওদের আত্মার উদ্দেশ্যে খেজুর আর জল দেবার মতো কেউ হয়তো ওদের বংশে থাকবে না।

তারপর বেশ কয়েক প্রস্থ কবজ-তাবিজ আর পূজো আচ্চার পর ওর জায়ের একটা ছেলে হলো। পরের বছর হলো আর একটি। তারপর এলো তৃতীয় জন। তারপর থেকে এক বছর অন্তর ওর জায়ের একটি করে সন্তান হয়েছে আর ও তাদের 'মা' হয়ে, তাদের লালন-পালন করে বড়ো করে তুলেছে। জায়ের মতো ওরও এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কারণ এবারে ও মরে গেলেও শ্রাদ্ধ করার লোক রয়েছে। ওর মৃত স্বামীর কোনো ছেলে নেই, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁর ভাইয়ের ছেলেরা তো রয়েছে! ওর মৃত্যুর পর তারাই ওর শেষ কাজটুকু করবে।

সব কটা বাচ্চাই ওকে 'মা' বলে ডাকে। এমন কি ওর দেওর পর্যন্ত। দেওর জানে: বিধবা হলেও, স্ত্রী হওয়া কি জিনিস তা বৌদি কখনও জানতে পারেনি। সে জানে বৌদি কোনোদিনও মা হয়নি, তবু সে ওকে 'মা' বলে ডাকে।

জলটা ফুটে উঠেছিলো। ও চা বানালো। চিনেমাটির পেয়ালা আর পিরিচগুলোকে সাবধানে তুলে নিয়ে ট্রে-র ওপরে সব কিছু সাজালো। তারপর ট্রে-টা মালতির ঘরে নিয়ে গিয়ে খাটের পাশের টেবিলটাতে আস্তে করে নামিয়ে রাখলো। চিনেমাটির বাসন-পত্র নিয়ে কাজ করতে ওর ভারি ভয়! সামান্য একটু ধাক্কাতেই ওগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। ও নিজে চিরদিনই পিতলের বাটিতে করে চা আর কাঁসার বাসনে করে ঘোল বানিয়ে খেয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছর হলো ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে উঠেছে, কলেজে যাচ্ছে। এখন ওরা আর বাটিতে করে চা খাওয়া পছন্দ করে না। অনেক কষ্টে তারা ওকে আলাদা আলাদা পাত্রে চা দুধ আর চিনি রাখতে শিখিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা নিজেদের পছন্দমতো চিনি মিশিয়ে খেতে চায়। যতোদিন ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছিলো, ওর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিলো—ততোদিন ও তাদের সরভরা দুধ খাওয়াতে পেরেছে। কিন্তু এখন তারা আর ওর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই। এখন তারা ওই বিচ্ছিরি কালো কালো চাগুলো খেতে ভালোবাসে, যে চা ও মাটির ভাঁড়ে করে ঝাড়ুদারকে খেতে দিতো। ছেলেমেয়েদের ও সর ভর্তি দুধ খেতে দিতে চায়। কিন্তু তারা যুক্তি দেখায়, মোষের দুধ বড্ডো ঘন এবং সেটা বুদ্ধিবৃত্তি গড়ে ওঠার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

যে ছেলেটির সঙ্গে মালতির বিয়ে হবে, সে গতকাল এখানে এসে পৌঁছেছে। মালতির পাশের ঘরেই ঘুমিয়েছে সে। তাকেও চা দেবার জন্যে 'মা'কে বললো মালতি। মালতির ঘর থেকে ছেলেটির ঘরে যাবার একটা দরজা আছে। ছেলেটির জন্যে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বৃদ্ধা সেই দরজা দিয়েই ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ছেলেটি বিছানা থেকে ওঠার জন্যে গায়ের লেপটা টেনে সরিয়ে দিতেই ঠুংঠাং করে একটা শব্দ শুনতে পেলো ও। কয়েক

টুকরো কাচের চুড়ি বিছানা থেকে খসে পড়েছে মেঝের ওপরে। বৃদ্ধা চমকে উঠলো। সেদিন মালতি যে নতুন কাচের চুড়িগুলো পড়লো, এই টুকরোগুলো সেই একই রঙের। আজ সেই চুড়িরই কয়েকটা টুকরো খসে পড়লো ছেলেটির বিছানা থেকে।

বৃদ্ধা মুখ ঘুরিয়ে নিলো, কিন্তু নড়তে পারলো না। ওর পাদুটো যেন মাটির সঙ্গে গেঁথে গেছে, সে দুটোকে টেনে তোলার মতো এতোটুকু শক্তিও আর ওর মধ্যে অবশিষ্ট নেই। মালতিও শব্দটা শুনতে পেয়েছিলো। মায়ের মনোযোগটা অন্যত্র সরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় ও বললো, 'মা, আজই না তুমি আমাদের হাতে লাল সুতো বেঁধে, কপালে লাল ফোঁটা পরিয়ে, আমাদের ভালো ভালো জিনিস খেতে দেবে ?'

'না গো মেয়ে—আজ না, কাল।' শুধু এটুকুই বলতে পারলো ও। তারপর ফিরে গেলো রান্নাঘরে। একটা চিন্তা অতিদ্রুত ওর মনে জেগে উঠছিলো বারবার। ও কন্‌জাক্‌দের খেতে ডাকবে। মালতিও তাদের মধ্যে একজন। একটি কুমারী হিসেবে—পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে—মালতিও তাদের সঙ্গে বসবে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে মালতির কাছেও ওকে মাথা নোয়াতে হবে।...

বৃদ্ধার মুখে ভ্রূকুটি জেগে ওঠে। ওর মনে হয়, দশ পনেরো এমন কি বিশটা বছরও কুমারী হয়ে থাকা শক্ত কিছু নয়। ও নিজে কি পুরো তিন কুড়ি বছরই কুমারী হয়ে কাটিয়ে দিলো না ? আর এখন কিনা এই বয়সে কোঁচকানো কপাল নিয়ে ওকে মালতির কাছে মাথা নোয়াতে হবে ! কথাটা ভাবতেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে ও।

ওর নিজের দিক থেকে খাঁচায় বন্দী করে রাখা সিংহের মতো ও নিজের বাড়ন্ত যৌবনটাকে কাটিয়ে দিয়েছে। মনের কামনা-বাসনাগুলোকে পোষ মানিয়েছে। পাছে ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো খাঁচাটা ভেঙে ফেলার মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাই ও ভালো করে খায়নি, ঘুমোয়নি। পাছে মনের হিমায়িত আবেগগুলো তরল হয়ে ওঠে, তাই ও নব-বিবাহিতদের মধ্যে কখনও বসেনি। মনের সমস্ত বাসনাগুলোকে ও প্রশান্ত সাগরের মতো শান্ত করে রেখেছিলো। পাছে সেই সমুদ্রের জলে জোয়ার জেগে ওঠে, তাই ও গ্রীষ্ম কালে ছাদে ঘুমোনোর সময় কোনোদিনও চাঁদের দিকে তাকায়নি।...নিজেকে ও সত্যিই সশ্রম নিয়ন্ত্রণের কাছে নিবেদন করেছিলো।

তারপর যখন ওর নিটোল অঙ্গগুলো বুড়িয়ে যেতে শুরু করলো, মাথার কালো চুল-গুলো হয়ে উঠলো ধূসর—তখন একটা দারুণ স্বস্তি অনুভব করলো ও। বাসনার উত্তাপে ভরা দিনগুলো তখন ফুরিয়ে যেতে শুরু করেছে। মৃত মানুষটার সম্মান পুরোপুরি অক্ষুণ্ন রেখেছে ও।

মাঝে মাঝে রাত্রি বেলা ও জেগে ওঠে, তারপর আর ঘুমোতে পারে না। সারারাত শুধু এ পাশ ও পাশ করে। স্বামীর মুখটার ছবি মনের সামনে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে—কিন্তু তাঁকে ও শুধু একবারই দেখেছে, যখন নিতান্ত বালিকা বয়সে মায়ের বান্ধবী ওকে কন্‌জাক্‌ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। সেদিনের সেই ছোট্টো ছেলেটিকেই ও নিজের স্বামী হিসেবে

কল্পনা করে নিতে চেয়েছে, কিন্তু কোনোদিনও তা পারে না।

এখন ওর বয়েস ষাটের ওপরে। বছরে দুবার ও উপোস করে। প্রথা অনুযায়ী এই উপলক্ষ্যে ও চিরদিনই অল্প বয়সী কুমারী মেয়েদের আমন্ত্রণ জানায়। ওদের মধ্যে অনেক কুমারীই বউ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রতি বছরই অন্যেরা এসে তাদের জায়গা নিয়ে নেয়। অনেক সময় এমনও হয়েছে, যে সমস্ত ছোটোছোটো মেয়েদের ও আমন্ত্রণ জানিয়েছে, দেখা গেছে তাদের মায়েরাও কয়েক বছর আগে ওর কাছে আমন্ত্রিতা হয়ে এসেছিলো। এভাবেই জীবনের চাকা ঘুরে চলে।

কোনোদিনই ও উপোস বাদ দেয়নি—একটি বারও না। লোকে বলে, বিধবারা উপোস করলে মৃত স্বামীদের আত্মা শান্তি পায়। এটাই ওর উপোস পালন করার কারণ। স্বামীর আত্মাকে শান্তি দেবার পবিত্র কর্তব্যই ও এতোদিন ধরে পালন করে চলেছে। কোনোদিনও উপোসের কোনো বিধি-নিষেধ ও লঙ্ঘন করেনি।

কিন্তু আজ ওর মনে হলো, পৃথিবীটা বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে ওর সারা জীবনের বিশ্বাস। ওই মরা মানুষটা ওর কে ? মনে সন্দেহ জেগে ওঠে ওর। ও কিভাবে ওর দিন, ওর রাতগুলোকে কাটাচ্ছে তা সে কোনোদিনও দেখতে আসেনি। সারাটা যৌবন ও সঙ্গীহীন হয়ে কাটিয়েছে, এখন ওর সামনে শুধু বার্ধক্যের দিনগুলি। ও প্রার্থনা করেছে, নিজেকে উৎসর্গ করেছে, কাঁটার পথ বেছে নিয়েছে শুধু একটি মাত্র উদ্দেশ্যে —যাতে সেই মৃত মানুষটা তার পরিশ্রমের ফলটুকু পায়।

ওর মনে ঘূর্ণী-বাতাস জেগে ওঠে। 'সে মানুষটা আমার কে ? আমি তাঁকে জন্মেও দেখিনি। তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনো সুযোগও আমার হয়নি।' নিজের চারদিকে এক অসীম শূন্যতা অনুভব করে ও। ওকে শক্তি যোগাবার মতো আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্যে আদম নন্দনকানন থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ও তো তেমন কিছুই করেনি! তবে ও কেন জীবনের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে ? পৃথিবীতে এসে যে মানুষটার মাধ্যমে জীবন কাটানোর কথা ছিলো, সে তো ওর দশ বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগেই মরে গেছে!

জীবন ওকে বঞ্চিত করেছে। কেন ? কি পাপ করেছিলো ও ? সারা জীবনের সমস্ত উপোস আর প্রার্থনার প্রতি ওর মনে আচমকা এক প্রচণ্ড ঘৃণা জেগে ওঠে।

ওর মনে হয়, ওর শরীরের মধ্যে যেন কোনো বায়বীয় পদার্থ জমে উঠেছে—যেন একটু বাদেই চুরমার হয়ে ফেটে পড়বে ও। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে ওঠে। হাতদুটো প্রসারিত হয়ে ওঠে ময়দা ভর্তি চটের থলেটার দিকে। এক মুঠো ময়দা তুলে নিয়ে নিজের মুখের মধ্যে গুঁজে দেয় ও।

সূর্যটা যখন অনেক উঁচুতে উঠে গেছে তখন সংসারের সবাই এসে আবিষ্কার করে, বৃদ্ধা অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

এটা পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘ এবং সব চাইতে সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

গাঁয়ে বার্কসির বাবার আশি একর জমি, কিন্তু তরুণ বার্কসি ক্রমশই জমির কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে কাছেই একটা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকে আর লক্ষ্য করে দূরের শহরটার আলোগুলোকে।

গ্রামটা একটু উঁচুতে থাকার দরুণ শহরটাকে মনে হয় যেন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ছোট্ট একটুকরো আলোকিত অঞ্চল। বার্কসি এ কথাও জানে যে ওই শহরের পরেই রয়েছে এক ঝলমলে মহানগর।

সূর্যটা অস্তে যেতেই দূরের আলোগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর বার্কসির মনে হয়, আলোগুলো যেন তাকে ডাকছে।

অবশেষে একদিন সে মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো। পা থেকে কাদামাটি ধুয়ে, নতুন জুতো পরে, অসন্তুষ্ট বাবা-মার কাছ থেকে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে সে রওনা হয়ে গেলো শহরের পথে।

সে গ্রাম ছেড়ে এসেছিলো বাকসা হিসেবে, মিস্টার বার্কসি হবার জন্যে তাকে পেরিয়ে আসতে হলো অনেক দীর্ঘ পথ।

দিল্লীর একটা অন্যতম বড়োসড়ো সচিবালয়ে মিস্টার বার্কসি একটা চাকরি পেয়ে গেলো। সামান্য একটা কেরানী হলেও প্রতিদিন লাল পাথরে গড়া বাড়িটাতে ঢোকার সময় সে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। স্যুটবুট পরে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় অফিসে গিয়ে ঢুকলেও, তার ভেতরকার গ্রাম্য ছেলেটা প্রতিবারই বাড়িটাতে ঢোকার সময় তাকিয়ে থাকে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে।

সহকর্মীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হলো। কিন্তু গাঁয়ের জাগিরা, যার নিজস্ব একটা ঘোড়া আছে আর কারমা, যে গ্রামের সব চাইতে বড়ো কুয়োটার মালিক— তাদের মতো বন্ধু একটিও হলো না। তার একমাত্র বন্ধু রইলো সে নিজে।

একদিন এক বিচিত্র খেয়ালে সে তার সহকর্মীকে বললো, 'দিল্লী একটা অদ্ভুত শহর। এখানে নোংরা আছে, সরু রাস্তা আছে, প্রাসাদের মতো বাড়ি আছে, ফুলে ভরা বাগান আছে আবার অনেক ধ্বংসস্তূপও আছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি নিজেই দিল্লী। এই দিল্লী শহরটা আমার মধ্যেই রয়েছে।' তার কথাগুলো আগুনের মতো সমস্ত অফিসে ছড়িয়ে পড়লো। সহকর্মীরা উপহাস করে তার নাম রাখলো, মিস্টার দিল্লী। সেই থেকে বার্কসি নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কোনোদিন কথা বলেনি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে ভাবে, খালি পায়ে ক্ষেতে কাজ করার সময়েও সে আকাশের দিকে হাত বাড়াতো। অথচ এখন মোজাপরা অবস্থাতেও তার পায়ের নিচ থেকে মাটিটা

সরে গিয়ে, তাকে এমন করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখছে কেন। বহু বছর আগে গ্রামে স্কুলের কুর্সিগুলো তাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতো। কিন্তু এখন স্কুলের পালা শেষ করে অফিসের কুর্সিতে বসে, তার সে আকর্ষণটা দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে।

বার্কাসির মনে হয়, তার সঙ্গী বাকসা—যে তার সঙ্গে শহরে এসেছিলো, সে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। বার্কাসি ভাবে, 'আসলে বাকসাকেই শহর টেনেছিলো। নইলে শহরে কিইবা এমন আছে! ঘড়ির দুটো কাঁটার মতো সময়টা আবার ঠিক একই জায়গায় ফিরে আসে। দিনের বেলা আমি এই ছোট্ট অফিস ঘরটাতে বন্দী হয়ে থাকি আর রাতে ওই ছোট্ট কুঠরিটা বন্দী করে রাখে আমাকে।'

বার্কাসি ভাবে, গ্রামে মোষগুলোর জন্যে ডালপালা কেটে দেবার সময় বইপত্র সব সময় তার দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখতো। এখন তার টেবিলটা ফাইলে বোঝাই, ফাইলে অজস্র কাগজপত্র—অথচ ওদিকে সে তাকিয়েও দেখে না। বার্কাসি বুঝতে পারে, বই আর অফিস-ফাইলের মধ্যে একটা বিরাট প্রভেদ রয়ে গেছে। তাই সান্ধ্য-কলেজে যোগ দিয়ে সে তার বেশির ভাগ সময়টাই পড়াশুনোয় কাটাতে থাকে।

একদিন বার্কাসি একটা কবিতা সঙ্কলনের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এবারে তার পায়ের তলায় মাটিটা শক্ত হয়ে ওঠে। মাঝরাতে সে অনুভব করে, কবিতারও একটা শহর আছে, সে শহরের আলোগুলো অনেক বেশি ঝলমলে এবং তারা বার্কাসিকে নিজেদের কাছে টানছে।

সেই পথে মাইলের পর মাইল হেঁটে একদিন রাতে লেখিকার নামের দিকে চোখ পড়লো বার্কাসির। 'অমৃতা প্রীতম।' বইটা উলটে কবির ছবিটার দিকে তাকালো সে। অনুভব করলো, তার শরীরের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেলো। গ্রামে তার যৌবন এসেছে। কিন্তু গ্রামে বা শহরে কোনো নারীই তার মধ্যে এধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেনি। জীবনে এই প্রথম একটি নারীর জন্যে তার সমস্ত দেহ মন আকুল হয়ে উঠলো। সারা রাত সে স্বপ্ন দেখলো, অমৃতা প্রীতমের হাতে সে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছে, ছুঁতে চেষ্টা করছে ওর ওড়নায় বসানো নক্ষত্রগুলোকে।

পরদিন সকালে এবং পরপর অনেকগুলো সকালেই ঘুম ভেঙে বার্কাসির মনে হয়েছে, অমৃতা প্রীতম যেন এইমাত্র তার ঘর থেকে বাইরে গেছে, তার বিছানায় তখনও ছড়িয়ে রয়েছে ওর অসংখ্য কবিতা।

দৈনন্দিন নিয়ম মাফিক বিছানা ছেড়ে ওঠা, চা পান করা, ক্যান্টিনে খাওয়া, লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করা—সমস্ত কিছুই যেন এক অপরূপ কবিতার চরণ হয়ে উঠলো তার কাছে।

তারপর আচমকা ঋতু পরিবর্তনের মতো এক নিবিড় শূন্যতা ঘিরে ফেললো তাকে। কুয়াশার মতো এক গাঢ় নৈঃশব্দ নেমে এলো বার্কাসির ওপরে, বৃথাই নিজের সচেতনতা ফিরে পাবার চেষ্টা করলো সে। হঠাৎ নৈঃশব্দকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে একটা আওয়াজ তার কানে এসে পৌঁছলো। আওয়াজটা লতা মঙ্গেশকারের—তার নতুন কেনা রেকর্ড

প্লেয়ারে ওর গান বাজছিলো। নৈঃশব্দের কূপে সাথীডাকা নাইটিংগেলের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো ওর কণ্ঠস্বর।

রেকর্ডটা শেষ হয়ে আসতেই বার্কাস ছুটে গিয়ে সেটাকে নতুন করে চালিয়ে দিলো— অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো রেকর্ডের খামে ছাপা লতা মঙ্গেশকারের মুখের দিকে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো সে, শুধু সুরের হিল্লোল ছড়িয়ে ছিলো তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। সেদিন এবং আরও অনেক রাত সে কাটিয়ে দিলো লতা মঙ্গেশকারের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে, ওর আঙুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায়। আর সোনার সুতোয় বোনা শাড়ী পরে লতা তার বিছানায় বসে গান গাইলো সারা রাত ধরে।

অনেকগুলো রাত লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠস্বরে ডুবে রইলো বার্কাস। কিন্তু তারপর ফের আবিষ্কার করলো, নৈঃশব্দের আরও গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে সে।

একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক সুন্দরী মহিলার ছবির দিকে চোখ পড়লো তার। মহিলার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ছবিটার মতোই নিষ্পলক চোখে সে খবরটা পড়ে জানলো, ওটা এক বিখ্যাত নর্তকী, 'মিস ইণ্ডিয়া' হিসেবে নির্বাচিতা ইন্দ্রানী রহমানের ছবি।

সেদিন সারা রাত ধরে সে এক নর্তকীর পায়ের ছন্দে ছন্দে গাওয়া বিয়ের গান শুনলো, তার সাধারণ রাত্রিবাসটা হয়ে গেলো সুন্দর একটা রেশমী পোশাক, সমস্ত সময়টা সে কাটিয়ে দিলো ইন্দ্রানী রহমানের জন্যে মুক্তো বেছে বেছে।

কোথায় সে যেন পড়েছিলো, ইন্দ্রানী আধা-বাঙালী। তারপর থেকে সে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, ইন্দ্রানীর দীর্ঘ কালো চুল থেকে ভেসে আসা নারকেলের গন্ধ পেতো।

একদিন সকালে একটা নুড়িতে পা রেখেই সে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেলো। কারণ তার মনে হয়েছিলো, ওটা ইন্দ্রাণীর নূপুর থেকে খসে পড়া একটা ঝুনঝুনি।

খবরের কাগজে আবহাওয়া-বার্তা থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা এমন সব খবর দেয়, যাতে আবহাওয়াটাই বদলে যায়। বার্কাসের কাছে এমনি একটা খবর হলো, ইন্দ্রাণী রহমান ইউরোপে চলে গেছে।

আবার শুরু হলো শূন্যতার দিন, আবার তাকে দাঁড়াতে হলো অনস্তিত্বের ওপরে। এখন তার পায়ের নিচে মাটি নেই, আকাশও নেই মাথার ওপরে।

বাতাসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একদিন জয়পুর ভবনের গ্যালারিতে নিজেকে আবিষ্কার করলো বার্কাস। সেখানে দেয়ালে দেয়ালে ঝোলানো রঙের পৃথিবী। ওখানে কিছু কিছু মুখ বিষন্ন আর নিশ্চুপ, তাদের সঙ্গে নিজের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব করলো সে। ওখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতো বার্কাস। কিন্তু একখানা বিশেষ ছবির মুখোমুখি হয়ে তার মনে হলো, সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অনন্তকাল ধরে। যেন মোহাবিষ্ট হয়ে ওখানেই নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক তার কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'স্যার, বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। আপনি আবার কাল

আসতে পারেন।'

কথাহীন-পরম-আবেশ থেকে নিজেকে টেনে এনে সে জিগেস করলো, 'ইনি কে ?'

'আপনি জানেন না, স্যার ?' তত্ত্বাবধায়ক অবাক হয়ে গেলো। 'এখানকার সমস্ত ছবিই তো ওঁর আঁকা। উনি বিখ্যাত শিল্পী অমৃতা শেরগিল।'

বার্কসি অনুভব করলো ইন্দ্রাণী রহমান, লতা মঙ্গেশকার আর অমৃতা প্রীতমের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়েছিলো—এবারেও সেই একই অনুভূতি সম্পূর্ণ অধিকার করে ফেলছে তাকে। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে উঠছিলো, সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছিলো সে। ...কিন্তু আচমকা কবরের তীক্ষ্ণ হিমতা তাকে আঁকড়ে ধরলো। তত্ত্বাবধায়ক তখন বলছিলো,'অমৃতা শেরগিল অনেক দিন হলো মারা গেছেন। খুব অল্প বয়সেই মারা গেছেন উনি। যদি বেঁচে থাকতেন '

নিজের আত্মাটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে বার্কসির নিজের দেহটাই যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে, 'কেন পৃথিবীতে আমি এতো দেরি করে জন্মালাম। বড্ডো দেরি হয়ে গেছে ! পৃথিবীটা এখন প্রাণহীন...'

মাসের পর মাস কেটে যায়। বার্কসির অবস্থা এখন দেহ-খুঁজে-বেড়ানো আত্মার মতো। ইতিমধ্যে সে মাস্টার্স ডিগ্রীটা পেয়ে গেছে। একদিন আত্মদর্শনের সময় সে ভাবলো, 'হয়তো আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, তাই কবিতার প্রতীক হিসেবে অমৃতা প্রীতমকে নিজের করে পেতে চেষ্টা করেছি ..হয়তো আমার সুরবোধ ছিলো, তাই লতা মঙ্গেশকার আমাকে আকর্ষণ করেছে ..হয়তো নৃত্যশিল্প আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলো, তাই মুক্তো বাছার সময় আমি ইন্দ্রাণী রহমানকে আমার কনে বলে কল্পনা করেছি...হয়তো রঙের বর্ণালী আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, তাই আমি কল্পনা করেছিলাম অমৃতা শেরগিল...'

সব কটা নৌকা পুড়িয়ে দিয়ে নদীর ধারে বসে থাকা মাঝির মতো সেদিন অফিসের কুর্সিতে বসেছিলো সে। ভাবছিলো, 'আমি একটা ব্যর্থতা। আমি কিছুই হতে পারিনি... আমি স্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব !' অবহেলায় উড়ছিলো তার কাগজপত্রগুলো।

একদিন সে বাবা-মার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলো। তাঁরা ওকে মিনতি করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে। হারমানা হাতে পদত্যাগ পত্র লিখে, গ্রামে রওনা হলো বার্কসি।

গ্রামে ফিরে বাবা-মা এবং জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করলো সে। তারপর ক্ষেত-খামারের কাজে নিজেকে নিয়োগ করে বাবা-মার ইচ্ছে মতো গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করলো।

বিয়ের রাতে কনের ঘোমটা খোলার জন্যে মা পরিবারের পুরুষানুক্রমিক পাঁচ টুকরো সোনা তার হাতে তুলে দিলেন। ওগুলোর মধ্যে থেকে চারটে টুকরো বেছে নিয়ে বাকিটা মার কাছে ফিরিয়ে দিলো সে। তারপর কনের কাছে এগিয়ে গিয়ে, বাসর শয্যায় বসে, জীবনে বাস্তবতার আবরণ উন্মোচনের জন্যে ওকে তার স্বপ্নের চার কনের প্রতীক হিসেবে ওই চার টুকরো সোনা উপহার দিলো।

বাড়ি থেকে সমস্ত মৃতদেহই বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মিনা যখন ওর বাবা মার কাছে ফিরে এলো, তখন তাঁদের মনে হলো—সরকারী চিঠিতে মোড়া একটা শবদেহ যেন বাড়িতে এসে ঢুকলো। চিঠিটা অবিশ্যি ওর নয়, ওর স্বামীর মৃত্যুর প্রমাণ-পত্র। সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এমন অনেক জিনিস আছে যা মেয়েরা সহজাত প্রবৃত্তিবশেই বুঝতে পারে। এদের মধ্যে একটা হচ্ছে: আমাদের দেশে পুরুষমানুষরা একবারই মরে, কিন্তু তাদের বিধবারা মরে বারবার।

একেবারে ভেঙে পড়া অবস্থায় মিনা যখন বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো, তখন মৌন দেয়াল গুলো পর্যন্ত প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলো। ঈশ্বর জিভ কেটে নিলে একমাত্র মানুষই মূক হয়ে যায়। ওর বৃদ্ধ বাবা-মাও তাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়িটা বিশাল, পরিবারের প্রত্যেকেরই একটি করে নিজস্ব ঘর। মিনা শান্ত পায়ে বাড়িতে ঢুকে সোজা নিজের পুরনো ঘরে উঠে গেলো, যেন এইমাত্র ও কলেজ থেকে ফিরে এসেছে। যে দরজাগুলো আগে সাধারণভাবে খুলেছে আর বন্ধ হয়েছে, এখন সেগুলো অভিশপ্ত। গত বিশ বছরে শুধু বিশেষ বিশেষ কতকগুলো ঘটনাই—যেমন বিয়ে, বিচ্ছেদ, জন্ম আর মৃত্যু—ওদের খুলেছে আর বন্ধ করেছে। অশ্রু আর হাসি দিয়ে বুড়ো বাবা মা মেনে নিয়েছেন তাঁদের নিয়তিকে।

বিশ বছর আগে যখন মিনার বড়দির বিয়ে হয়, তখন বিয়েটা ওর কাছে দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিলো। দু বছর বাদে প্রথম সন্তানের জন্ম দেবার জন্যে যখন ও এ বাড়িতে ফিরলো, তখন সন্তানের জন্ম দরজাটাকে ফের খুলে দিলো ওর জন্যে। দুগ্ধপোষ্য শিশুটাকে ফেলে রেখে ও যখন মারা যায়, তখন মৃত্যু ওর কাছে দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিলো আবার।

নবজাত শিশুটিকে ওর ঠাকুর্দা-ঠাকুমা নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটা শিশুকে লালন পালন করার ব্যাপারটা তাঁদের কাছে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে উঠতেই তাঁরা ওকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। শিশুটার ছোটো ছোটো হাতদুখানি খুলে দিলো দরজাটাকে।

তেমনি ভাবেই বছর বারো আগে মিনার ভাই যখন কলেজে পড়ার জন্যে বিদেশে চলে গেলো, তখন ঘরটা চাবি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নিয়তি দরজাটাকে আবার খুলে দিলো সেদিন, যেদিন বাপ-মার অমতে বিয়ে করে সে বউ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলো। ঘরটাকে তখন রেশমী পর্দা দিয়ে নতুন করে সাজানো হলো এবং ঘরটা থেকে তখন তরুণ প্রেমিক যুগলের তীব্র বাসনার নির্যাস ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। একটা বছর যেতে না যেতে বিয়ের মতোই আকস্মিক বিবাহ-বিচ্ছেদে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো আবার।

তিন বছর আগে নববধূর বেশে মিনা যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন ওর বিয়ের বাজনা দরজাটাকে বন্ধ করে দিয়েছিলো। তিন বছর বাদে ওর বৈধব্যে দরজাটা ফের খুলে যাবে, এই ছিলো নিয়তি।

মিনার বাবা-মা ওর এ সর্বনাশের অসহায় প্রত্যক্ষদর্শী মাত্র। মিনার ভাই বাণিজ্য-জাহাজের সঙ্গে এখন সমুদ্রযাত্রী। ওর দিদির ছেলেও, এখন আঠারো বছর বয়সের তরুণ, কলেজে পড়ার সুবাদে প্রবাসী।

মিনার জন্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে দরজাগুলো খুললো এবং বন্ধ হলো। ওর বাবা-মা আর সইতে পারছিলেন না, দুঃখ-বেদনায় ওঁরা দৃষ্টিশক্তি প্রায় খুইয়েই ফেললেন।

যেন কবরে ফুল দেবার জন্যেই মৃত্যু সংবাদ জানানো সরকারী চিঠিগুলো বারবার এসে হাজির হচ্ছিলো। যুদ্ধ-বিধবাদের পুনর্বাসনে সরকার পক্ষ ভীষণ আগ্রহী এবং সে ব্যাপারে এ পক্ষের মতামত জানাটা সরকারের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মৃত মানুষের মতো মিনা কিন্তু তাদের আগ্রহের কাছে উদাসীন হয়েই রইলো।

সহানুভূতি জানানোর জন্যে বাড়িতে আসার পক্ষে মিনার ভাই অনেকটাই দূরে ছিলো। কিন্তু ওর দিদির ছেলে অবিনাশ হস্টেল থেকে বাড়িতে ফিরে এলো। অবিনাশ কোনোদিন নিজের মাকে দেখেনি, তার কোনে খেলার সাথীও ছিলো না। মিনাই ছিলো তার কাছে সব কিছু। অবিনাশ ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরতেই মিনা এতোক্ষণ আগলে রাখা চোখের জলের ধারা খুলে দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তিন বছর আগে যে অবিনাশ ছিলো বালক মাত্র এখন সে তরুণ-যুবক—মাথায় মিনাকে ছাড়িয়ে গেছে।

গত কয়েকদিন মা ওকে যা কিছু খেতে দিয়েছেন, মিনা তা প্রায় স্পর্শই করেনি। কিন্তু অবিনাশ যখন ওর খাবার এনে বললো, 'এসো মিনু, খেয়ে নেওয়া যাক', তখন তার কথাটা মিনুর খিদে জাগিয়ে তুললো।

প্রত্যেকের কাছেই ও 'মিনা' কিংবা 'মিনাজি'। কিন্তু অবিনাশ এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সৈনিক-স্বামীর কাছে ও ছিলো 'মিনু।' মিনা ডাক শুনলে নিজের বয়সটা কম বলে মনে হয় ওর আর মিনাজি শুনলে মনে হয়, বয়েসটা যেন বেশি হয়ে গেছে। কিন্তু শিশু অবিনাশ আধো আধো বোলে ওকে মিনু বলেই ডাকতো, সমবয়সী করে তুলতো ওকে। আর এখন অবিনাশের মিনু ডাক শুনে মনে হলো, অবিনাশ যেন বয়সে ওর চাইতেও বড়ো হয়ে গেছে।

বিয়ের দিনেই মিনা ওর স্বামীকে বলেছিলো, সে যেন ওকে মিনু বলে ডাকে। তা-ই ডাকতো সে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিনুও মরে গেছে। মিনা বেঁচে আছে ওর বাবা-মার কাছে, আর মিনাজি বেঁচে আছে সমাজের অন্য সকলের কাছে।

অবিনাশ 'মিনু' বলে ডাকতেই ও একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে নিজের হাতটা মুখে চেপে ধরলো। তারপর মৃত্যুপথ যাত্রী মানুষ যেমন শেষ নিঃশ্বাস নেবার জন্যে আকুলি বিকুলি করে, তেমনি ভাবে ফের ওই ডাকটা শোনার মিথ্যে আশায় হাতটা সরিয়ে নিলো

মুখ থেকে। অবিনাশকে ও কিছুই বলেনি, শুধু নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলো বাতাসে ঝুলে থাকা শব্দটার দিকে।

একটি মেয়ে হিসেবে ও স্বাভাবিকভাবেই জানে, এখন ওই শব্দটার আর কোনো অর্থই থাকতে পারে না। তবু বিস্ফারিত চোখে ও সেদিকে না তাকিয়ে পারেনি।

অবিনাশ খাবার এনে দিতে মিনা তা খেলো। অবিনাশ খেলা শুরু করতে, ও তাতে যোগ দিলো। এবং অবিনাশ যখন ওকে বেড়িয়ে আসার কথা বললো, ও তাতেও রাজি হয়ে গেলো। পার্কে গাছের ছায়ার নিচে ও অবিনাশের পাশাপাশি ছায়ার মতো হেঁটে বেড়াবে।

আলো আর অন্ধকারের মায়া ঘিরে রাখে মিনাকে। অন্ধকারে অবিনাশকে ওর সৈনিক পুরুষটির মতো মনে হয় আর আলোতে অবিনাশ হয়ে ওঠে ছোট্ট একটা শিশু—যাকে শিশু বয়সে ও মায়ের মতো পালন করেছে।

কোনো পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীর প্রতিটি অঙ্গই বেঁচে থাকতে পারে—কিন্তু জরায়ুটা নিশ্চয়ই মরে যায়। মিনা ভাবে, ওর সৈনিক পুরুষটিকে ও যদি নিজের জরায়ুতে বন্দী করতে পারতো, তবে তাঁর একটা অংশ আজও বেঁচে থাকতো। এবং সেই হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো ওর কাছে হয়ে ওঠে যন্ত্রণাময় দীর্ঘ প্রহর।

একদিন আলো আর অন্ধকার যখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, তখন বিছানায় শুয়ে থাকা মিনা চোখ তুলে অবিনাশের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে দুটো মুখ দেখতে পেলো। একটা মুখ ওর স্বামীর আর একটা ওর অনাগত সন্তানের। দুটো মুখ যেন মিলেমিশে এক হয়ে আছে। মিনা জানে, ওদের মধ্যে একজন মৃত আর একজন কোনোদিনও জন্মাবে না। তবু দুটো ছায়ার এই আশ্চর্য প্রহেলিকা ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলো না। অথচ ও বুঝতে পারছিলো, ওখানে কোনো ছায়া নেই—ওদের মধ্যে একজন তরুণ আর একজন শিশু—যাকে ও আঠারো বছর ধরে চেনে। কিন্তু নিজের অবচেতন মনে ও জানতো, ওটা একটা পুরুষের মুখ আর ও নিজে স্রেফ একটি নারী—যার জরায়ু পুরুষের শাশ্বত অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্যে কেঁদে মরছে।

আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে মিশে যেতেই মিনার হৃদয়ের গভীরে ওর চেতন আর অবচেতন মিলেঝুলে একাকার হয়ে গেলো—পুরুষমানুষটার দিকে নিজের দুবাহু এগিয়ে দিলো ও।

একটি নারী ও একজন পুরুষের পোশাক-আশাক কেঁপে কেঁপে উঠে মেঝেতে খসে পড়লো, যেন নিজেদের সমাধীস্থ করার জন্যেই ছোট্ট একটা স্তুপ হয়ে উঠলো ওরা। এ মুহূর্ত দুটি সত্তার মিলনের মুহূর্ত নয়। যখন কোনো নারী নিজের সমস্ত বিশ্বাসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মরিয়া হয়ে যা পাবার নয় তাকে খুঁজে খুঁজে মরে, এ মুহূর্ত সেই নরক যন্ত্রণার। আর পুরুষটা তখন আতঙ্কিত হয়ে ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করে নিজের বয়েসটাকে।

তারপর মুহূর্তটা কেটে যায়, আর একবার মৃত্যু হয় মিনার। শুধু মিনার নয়, মিনুরও।

ভোর হওয়া অব্দি সারারাত ধরে দুই নারী পরস্পরকে দোষারোপ করে এবং শেষ পর্যন্ত ঊষার আগমন জানিয়ে সূর্য উঠতেই দুজন শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে দুজনকে।

তখন তৃতীয় এক নারী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো সরকারী কাগজপত্রগুলোতে ত্রস্ত হাসে সই কোরে, দূর কোনো পাহাড়ি অঞ্চলে একটা শিক্ষকতার কাজ দেবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানায় সে।

সামান্য কয়েকদিন পরে একটা ঘটনা যে ঘরের দুয়ার খুলে দিয়েছিলো, অন্য এক ঘটনা তাকে বন্ধ করে দিলো আবার।

কোনো এক দূর দেশে চলে গেলো মিনা, হয়তো বা চিরদিনের জন্যেই।

প্রতিদিন সন্ধে পাঁচটার সময় একটা ঈগল ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে আসে, ওদের চোখে ছোঁ মেরে নিচে নামে এবং ওদের সামনে পড়ে থাকা এক টুকরো পণির তুলে নিয়ে উড়ে চলে যায়।

এইভাবে প্রতিদিন ওদের চোখগুলো বিদ্ধ হয়।

'এসেছে ?' বারান্দায় পা ফেলে একটি মেয়ে প্রশ্ন করে।

'হয়তো…' ইতিমধ্যেই বারান্দায় এসে 'প্রবেশ' ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকা অন্য মেয়েটি জবাব দেয়। নিজের দৃষ্টি দিয়ে যেন দরজাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছিলো ও।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকা তৃতীয় মেয়েটি ভাবছিলো, স্বপ্নে যে রাস্তাটাকে ও চুরমার করে ভেঙে দিয়েছিলো, সেটা কি করে এখনও অটুট রয়ে গেছে।

চতুর্থ জন রাস্তার দিকে নয়, তাকিয়ে ছিলো সিঁড়িটার দিকে—যেখানে একজনের জুতোজোড়া ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না।

পঞ্চম জনের উচ্চতা কম বলে সে শুধু মানুষটার জুতো নয়, তার পাতলুনের নিচের অংশটাও দেখতে পায়।

ওরা সকলেই আকাশের দিকে এক ঝলক চাহনি ছুঁড়ে দেয়, যেন পুলিসের কাছে ঘটনাটা জানিয়ে দিচ্ছে।

একটু পরেই একটা গাড়ি 'প্রবেশ' ফটক দিয়ে দ্রুত ভেতরে এসে ঢোকে, গাড়িবারান্দায় ঢুকে গতিটা শ্লথ করে এবং এক মিনিটের মধ্যেই আবার ছুটে বেরিয়ে যায়।

তিন তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা বিচলিত হয়ে ওঠে, যেন ওরা ওই গাড়িটাতে প্রায় চাপা পড়তে যাচ্ছিলো। ওরা প্রত্যেকেই এমনভাবে গাড়িবারান্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সত্যি সত্যি ওখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

রোববার বাদে প্রতিদিন এমনি হয়।

রীতি অনুযায়ী কাহিনীটা এইভাবে বলতে হয় :

একটা অফিস, একজন বড়ো সাহেব আর তার পাঁচটি স্টেনো।

অফিসটা খুব বড়োসড়ো, তাতে অনেকগুলো বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগের মাথায় একজন করে বিভাগীয় প্রধান। কিন্তু বেসরকারীভাবে 'উনিই' সমস্ত অফিসটাকে পরিচালনা করেন।

পদাধিকার বলে উনি এতোখানি ক্ষমতা রাখেন যে, যে কোনো অফিসে উনি যখন-তখন যেতে পারেন, কর্মচারীদের ঘরে টেলিফোন করে যে কোনো মেয়েকে তাঁর অফিসে এসে দেখা করতে বলতে পারেন। মেয়েটি এটাকে নিজের সৌভাগ্যের প্রতীক বলেই

ধরে নেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই, অদৃশ্য অক্ষরে 'জরুরী' লেখা ফাইল নিয়ে মেয়েটিকে ওঁর অফিসে গিয়ে ঢুকতে দেখা যায়।

সবাই তাঁকে 'বাদশা সালামৎ' বলে। আর পাঁচটি স্টেনো, তাঁর দরবার নর্তকী। নৃত্য শিল্পে পটিয়সী হওয়া ছাড়াও ধরে নেওয়া হয় একজন নর্তকী হবে আদবকায়দা দোরস্ত, ভদ্র এবং সুবেশা। সেইমতো প্রতিটি মেয়েই অফিসে রওনা হবার আগে নিখুঁত এবং কেতামাফিক সাজগোছ করে নেয়।

ওরা যথাসম্ভব শোভন সুন্দরভাবে কথা বলে, হাঁটে, ভদ্র আচরণ করে। এবং যে মেয়েটিকে 'তাঁর' অফিসে ডাকা হয়, সে তৎক্ষণাৎ নিজের ব্যাগ থেকে ছোট্ট একখানা আরশি বের করে মুখের প্রসাধনটা যাচাই করে নেয়—যেন ফাইলে নথিপত্র সাজিয়ে রাখছে।

'উনি' কাগজপত্রে সই করেন এবং মেয়েটিকে অন্য কোনো কাজ সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে ফাইলটা ফিরিয়ে দেন। কাজে খুশি হয়ে যেদিন উনি কোনো অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন, সেদিনটাকে সব চাইতে শুভদিন বলে ধরে নেওয়া হয়।

ওদের মধ্যে কেউ পাঁচ বছর, কেউ বা ছ বছর ধরে চাকরি করছে। কিন্তু বড়ো সাহেব সম্পর্কে কারুরই কোনো অভিযোগ নেই। ওদের বলা বা না বলা একমাত্র আকুতি—এই অফিসেই কাজ করে যাওয়া।

এই বছর 'তাঁর' মাথায় একগুচ্ছ ধূসর চুল জেগে উঠেছে। মেয়েরা সেটাকেও পরম রমনীয় বলে প্রশংসা করে। 'উনি' এখনও নিজের সেই শ্বেতাবগুলোকে ধরে রেখেছেন—যেমন : রোম্যান চেহারা, গ্রীক সৌন্দর্য, দেবদুতের মতো মুখ, অনন্ত যৌবন, জীবন্ত ঈশ্বর··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েরা যতোক্ষণ অফিসে থাকে, ততোক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকে। এবং ওই প্রভাবে, এমন কি দুপুরের খাওয়ার সময়েও, ওরা খুশিমনে অতিরিক্ত কাজ তুলে দেয়। মুগ্ধতা ভাঙে শুধু সন্ধে পাঁচটার সময়, যখন ওঁর স্ত্রী গাড়ি নিয়ে দৃশ্যে এসে হাজির হন।

গাড়ির কালো রঙের সঙ্গে ঈগলের পালকের সাযুজ্য করে নেওয়া সত্ত্বেও একদিন মেয়েরা অর্থহীন মনে করে সেটাকে বাদ দিয়ে, সরাসরি 'ওঁর' স্ত্রীর সঙ্গে সেটাকে জুড়ে নিলো।

মহিলা ঠিক পাঁচটার সময় আসেন, ওদের চোখে ছোঁ মারেন এবং স্রেফ এক তুড়িতে কষ্টার্জিত অধিকার থেকে ওদের বঞ্চিত করে তোলেন।

ওদের অধিকারের সঙ্গে ওরা পাণির শব্দটাকে একত্র করে নিয়েছিলো। কিন্তু পাণিরের মধ্যে নিরামিষত্ব রয়ে গেছে বলে ওরা সেটাকে পালটে মাংসের টুকরো করে নেয়।

মায়াজাল ভেঙে যাবার পর মেয়েরা বাড়িতে ফেরার জন্যে মন্থর পায়ে বাসস্ট্যাণ্ডে

হেঁটে যায়।

সম্মোহনটা ঠিক সূর্যের মতো—সন্ধ্যায় অস্ত আর সকালে উদয়। সকালবেলা বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছেই ওরা আবার খুশিয়াল আর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

শেষ অব্দি পঞ্চকন্যা এই জীবনধারাকেই মেনে নিয়েছিলো। কিন্তু আচমকা একটা ঘটনা ঘটে গেলো। 'ওঁর' স্ত্রী মারা গেলেন। মেয়েরা উত্তেজিতভাবে একে অন্যের কাছে কথাটা চালাচালি করলো, যেন নিশ্চিত করে নেবার চেষ্টা করলো ঘটনাটার যথার্থতা।

আকস্মিক অসুস্থতার জন্যে মৃত্যুর আগে পুরো একটা সপ্তাহ মহিলাকে দেখা যায়নি। কিন্তু মেয়েদের বিশ্বাস হয় না, উনি মারা গেছেন। আগের মতোই নিবিড় ব্যগ্রতায় ওরা মহিলার এসে পৌঁছনোর জন্যে আপক্ষা করে থাকে।

দিন যায়। ওদের বিশ্বাস জন্মে, মহিলা সত্যিই মারা গেছেন। এখন সারাটা দিন 'ওঁর' গাড়িটা এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচটার সময় 'উনি' অফিস থেকে বেরোন, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামেন এবং এক মুহূর্তও না থেমে গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে চলে যান।

অফিসের পর মেয়েরা যথারীতি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, মনে মনে 'ওঁকে' বিদায় জানায়, তারপর বাস স্ট্যাণ্ড অব্দি হেঁটে যায়। যদিও ওদের এই জীবনধারায় লক্ষ্যনীয় কোনো পরিবর্তন হয়নি, তবু যেন ভেতর থেকে এর নিয়মিত ভাঙন হয়ে চলে।

'ওহ্, মহিলা কেমন ঈগলের মতো আমাদের ওপরে ভেসে বেড়াতো!'

'হ্যাঁ…ভীষণ একঘেয়ে ছিলো আমাদের সন্ধ্যাগুলো।'

'শেষ অব্দি আমাদের শাপেই ও মরলো।'

একসঙ্গে খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ওরা। কিন্তু কালক্রমে ওরা মহিলাকে নিয়ে আলোচনা করা বন্ধ করে দেয়।

এখন ওরা একে অন্যকে হিংসে করে। উনি যাকে অফিসে ডেকে পাঠান, অন্যেরা তাকে সন্দেহ করে—সে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে অভিযুক্ত হয়। যতোক্ষণ মেয়েটি 'তাঁর' অফিসে থাকে, ততোক্ষণ সময়টা ভারি হয়ে ঝুলে থাকে অন্যদের ওপরে। যে মুহূর্তে মেয়েটি বেরিয়ে আসে, অমনি অন্যেরা যেন কোনো রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টায় তার মুখখানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে।

প্রতিদিন সকালে বাস স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে ওরা পরস্পরকে যাচাই করে নেয়, একে অন্যকে অসাধারণ ফিটফাট আর চটপটে বলে মনে করে।

'ইস, কি সুন্দর! এই শাড়ীটা তুই কবে কিনলি রে?'

'তোর পয়সা রাখার ব্যাগটা কি ভালো! এটা আগে দেখিনি তো?'

'মনে হচ্ছে তোর ব্লাউজটা বানাতে মোটে আধ মিটার কাপড় লেগেছে।'

'পিঠ তো পুরোটাই খোলা। শুধু একটা হুক!'

'ঘাবরাস না, আমি 'ওঁকে' গাঁথবো না।'

পিঠ-খোলা মেয়েটি বোকার মতো বলে ফেলে।

সেদিন ওরা শুধু মেয়েটির ব্লাউজ নিয়েই আলোচনা করে। এমন কি বড়ো সাহেবের কাছেও খবরটা পৌঁছে যায়।

ছটা মাস কেটে গেলো। তারপর একদিন মেয়েরা সবাই জানলো, 'তিনি' এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছেন। শুনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ওরা। সঙ্গে সঙ্গে রঙীন ফাইলগুলো যেন কালো হয়ে খসে পড়লো ওদের হাত থেকে।

সন্ধ্যাবেলা কোনো এক বিদেশিনী, হয়তো বা 'ওঁর' দ্বিতীয় স্ত্রী, গাড়ি নিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলেন, এক মুহূর্ত নেমে দাঁড়ালেন গাড়ি থেকে, তারপর 'ওঁকে' নিয়ে চলে গেলেন গাড়ি হাঁকিয়ে।

'এবারে বিদেশী সংস্কৃতি!'

একটি মেয়ে অস্ফুটে করুণ সুরে বললো। কিন্তু তার জবাবে আর কেউ কিছু বললো না। যেন কিছু বলার মতো শক্তি ওরা হারিয়ে ফেলেছে।

ক্লান্তভাবে পাগুলোকে বাস স্ট্যাণ্ডে টেনে নিয়ে যেতে যেতে ওরা অনুভব করলো, আচমকা ওরা যেন বুড়ো হয়ে গেছে।

আমার পড়শীর পড়শীর পড়শী—তার বুড়ো চাকরের নতুন বউ, অঙ্গুরি। একদিক দিয়ে সব বউই নতুন, কিন্তু ওর নতুনত্বটা একটু আলাদা। দোজবরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে ওর স্বামীকে কখনই নতুন বলা চলে না—কারণ ইতিমধ্যেই একবার সে দাম্পত্যের কুয়ো থেকে জল পান করে ফেলেছে। অতএব নতুনত্বের মর্যাদাটুকু শুধুমাত্র অঙ্গুরিরই থেকে যায়। বিয়ের পরেও ওদের পরিপূর্ণ মিলন হতে আরও পাঁচটা বছর কেটে গেছে—এটা হিসেবে ধরলে ওই উপলব্ধিটা আরও ঘন হয়ে ওঠে। তাছাড়া মাত্র কয়েক মাস হলো ও এখানে এসেছে। এখনও ওর মধ্যে খানিকটা গ্রামীণ বিশুদ্ধতা আর বালিকাসুলভ লজ্জা রয়ে গেছে।

বছর ছয়েক আগে প্রথমা স্ত্রীর সৎকারের জন্যে প্রাভাতি দেশের বাড়িতে গিয়েছিলো। কাজটা শেষ হবার পর অঙ্গুরির বাবা প্রাভাতির ভিজে গামছাটাকে নিঙরে শুকনো করে দিয়েছিলেন—যেটা কিনা গামছা-ভেজানো শোকাশ্রু মুছিয়ে দেবার একটা প্রতীক ভঙ্গিমা। অবিশ্যি কোনো পুরুষ মানুষ কোনোদিনও এতো কান্না কাঁদেনি যাতে দেড়গজ ক্যালিকো কাপড় ভিজতে পারে। আসলে গামছাটা ভিজেছিলো প্রাভাতি স্নান করার পরে। একটি বিবাহ যোগ্য মেয়ের পিতা হিসেবে অশ্রুসিক্ত গামছাটা শুকিয়ে দেবার অর্থ এটুকুই হতে পারে : 'যে মারা গেছে তার জায়গা নেবার জন্যে আমি আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। আর কেঁদো না। দ্যাখো, আমি তোমার গামছাটাও শুকিয়ে দিয়েছি।'

এভাবেই অঙ্গুরির সঙ্গে প্রাভাতির বিয়ে হয়। দুটো কারণে ওদের প্রকৃত মিলনটা পাঁচ বছরের জন্যে স্থগিত ছিলো : অঙ্গুরির কাঁচা বয়েস এবং ওর মার ওপরে বাতব্যাধির আক্রমণ। অবশেষে প্রাভাতিকে যখন বউ নিয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো তখন মনে হয়েছিলো প্রাভাতির পক্ষে হয়তো তা সম্ভব হবে না—কারণ তার মনিব নিজের রান্নাঘর থেকে অন্য একটা মুখে অন্ন জোগাতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু প্রাভাতি যখন বললো যে নতুন বউ তাঁর ঘরসংসারের দেখাশুনো করতে পারবে, তখন তিনি রাজি হয়ে গেলেন :

প্রথম দিকে অঙ্গুরি মেয়ে-পুরুষ প্রত্যেকের কাছেই পর্দাপ্রথা মেনে চলতো। কিন্তু শীগগিরি ওর ওড়নার আবরণ ছোটো হতে হতে গোঁড়া হিন্দু রমণীর মতো মাথার চুলে গিয়ে ঠেকল্লো। চোখ এবং কান দুয়ের কাছেই অঙ্গুরি এক মূর্তিমতী আনন্দ। ওর নুপূরের শতেক ঝুনঝুনিতে গুনগুন হাসির ঝংকার। হাজারো ঘুঙুর যেন বেজে ওঠে ওর হাসির গুঞ্জনে।

'ওটা তুই কি পরেছিস রে, অঙ্গুরি ?'

'পায়েল। সুন্দর না ?'

'আর তোর পায়ের আঙ্গুলে ওটা কি ?'

'চুটকি।'

'আর হাতে ?'

'বাজুবন্ধ।'

'কপালের ওটাকে কি বলে রে ?'

'এটাকে বলে আলিবন্ধ।'

'আজ তুই কোমরে কিছু পরিস নি কেন রে, অঙ্গুরি ?'

'ওটা বড্ডো ভারি! কাল পরবো। আজ আমার গলাতেও হার নেই। দ্যাখো না, আঙ্‌টাটা ভেঙে গেছে। কাল নতুন আঙ্‌টা গড়াতে শহরে যাবো।…আর একটা নাকচাবি কিনবো। আমার একটা বিরাট নথ আছে। কিন্তু শাশুড়ি ঠাকুরুণ সেটা তুলে রেখেছেন।'

নিজের রূপোর গয়নাগুলো সম্পর্কে অঙ্গুরির ভীষণ গর্ব। তুচ্ছ একটা অলঙ্কারের স্পর্শও ওকে উদ্দীপ্ত হয়ে তোলে। ও যা কিছু করে, তাতেই যেন অলঙ্কারগুলোর সৌন্দর্য আরও অপরূপ হয়ে ওঠে।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়াটা উষ্ণ হয়ে উঠেছিলো। অঙ্গুরিও নিশ্চয়ই তা অনুভব করতো। কারণ আগে দিনের বেশির ভাগ সময়টা ও নিজের কুঁড়ে ঘরেই কাটাতো আর এখন বাইরেই অনেকটা সময় থাকে। আমার বাড়ির সামনের দিকে গোটা কতক বিশাল নিমগাছ। তার তলায় একটা প্রাচীন কুয়ো। কচিৎ কখনো রাজমিস্ত্রিরা ছাড়া আর কেউই কুয়োটাকে ব্যবহার করে না। ছলকে পড়া জল কিছু কিছু জায়গায় জমে থাকে বলে কুয়োর চারপাশটা বেশ ঠাণ্ডা। একটু আয়েস করার জন্যে অঙ্গুরি প্রায়ই কুয়োটার সামনে গা এলিয়ে বসে।

'কি পড়ছো, বিবি ?' একদিন আমি নিম গাছের তলায় বসে বই পড়ছি, অঙ্গুরি এসে প্রশ্ন করলো।

'তুই পড়বি ?'

'আমি পড়তে জানিনে।'

'শিখবি ?'

'না, না!'

'কেন ? শিখলে কি হবে ?'

'মেয়েদের পড়াশুনো করা পাপ!'

'আর পুরুষমানুষের ?'

'পুরুষের তাতে পাপ হয় না।'

'এ সমস্ত বাজে কথা তোকে কে বলেছে, শুনি ?'

'আমি জানি।'

'আমি তো পড়ি। তা হলে আমি নিশ্চয়ই পাপ করছি ?'

'শহুরে মেয়েদের ওতে পাপ হয় না। পাপ গাঁয়ের মেয়েদের।'

মন্তব্যটায় আমরা দুজনেই হেসে ফেলেছিলাম। ওকে যা কিছু বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, ও তা নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করতে শেখেনি। আমার মনে হয়েছিলো, ওর বিশ্বাস নিয়ে ও যদি শান্তিতে থাকে তবে আমি তাতে প্রশ্ন তোলার কে ?

ওর শরীরটা ওর কালো রঙটাকে পুষিয়ে দিয়েছে। আবেশের এক নিবিড় অনুভূতি, অনিবার্য এক মাধুরী, সর্বদা ওর ভেতর থেকে ঠিকরে বেরোয়। সবাই বলে, মেয়েমানুষের শরীর এক তাল ময়দার মতো। কিছু কিছু মহিলা অল্প দলাই-মলাই করা ময়দার তালের মতো ঢিলে ঢালা, অন্যেরা খমির মেশানো ময়দার তালের মতো নরম। রুটি তৈরির কারিগররা যা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে পারে, তেমনি সঠিকভাবে মাখা ময়দার তালের মতো শরীর খুব কম মেয়েরই থাকে। অঙ্গুরির শরীরটা ছিলো এই শ্রেণীর। ওর ঢেউ দোলানো পেশীগুলোর মধ্যে ছিলো গুটিয়ে রাখা স্প্রিঙের মতো ধাতব স্থিতিস্থাপকতা। ওর মুখ, বাহু, বুক আর পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি এক অসহায় অবসন্নতা অনুভব করতাম। প্রাভাতির কথা ভাবতাম আমি--জরাগ্রস্ত, ছোটোখাটো, ঝুলে পড়া চোয়ালের একটা মানুষ—যার দৈহিক উচ্চতা এবং ভাঙচুরের হিসেব করা ইউক্লিডেরও চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে। হঠাৎ একটা মজার কথা মনে হলো আমার। মনে হলো, অঙ্গুরি হচ্ছে ময়দার তাল আর প্রাভাতি ওকে জড়িয়ে রাখার গামছা। প্রাভাতি ওকে জড়িয়ে রাখে, উপভোগ করে না। অনুভব করলাম, একটা প্রচণ্ড হাসির দমক আমার ভেতরে ফুঁসে উঠেছে। কিন্তু পাছে অঙ্গুরি বুঝে ফেলে আমি কি জন্যে হাসছি, সেই ভয়ে নিজেকে সামলে রাখলাম। ওদের দেশে কিভাবে বিয়েটিয়ে ঠিক করা হয়, তাই নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলাম অঙ্গুরিকে।

'পাঁচ-ছ বছরের মেয়েরা যখন কারুর পায়ে পুজো দেয়, তখন সেই মানুষটাই মেয়েটির স্বামী হয়।'

'ওরা তা কি করে জানবে ?'

'মেয়ের বাবা টাকা-পয়সা আর ফুল নিয়ে মানুষটার পায়ে রাখে।'

'তার মানে বাবাই পুজো করে, মেয়েটা না।'

'বাবা মেয়ের হয়ে পুজো দেয়। তাহলে মেয়েটিরই পুজো দেওয়া হলো।'

'কিন্তু মেয়েটা তাকে আগে কখনো দেখে না ?'

'না, দেখে না।'

'কোনো মেয়েই তার ভাবী স্বামীকে আগে দেখে না ?'

'না…' অঙ্গুরি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তারপর এক দীর্ঘ বিষণ্ণ বিরতির পর বলে, 'যারা প্রেমে পড়ে…তারা দেখে।'

'তোর গাঁয়ের মেয়েরা প্রেমে পড়ে?'

'খুব কম।'

'যারা প্রেমে পড়ে, তাদের পাপ হয় না?' স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অঙ্গুরির মতামতের কথা মনে পড়লো আমার।

'পাপ বই কি, ভীষণ পাপ,' দ্রুত জবাব দিলো ও। 'আসলে কি হয় জানো? ছেলেটা মেয়েটাকে লতাপাতা আগাছা খাইয়ে দেয় আর মেয়েটা তখন ছেলেটাকে ভালোবাসতে শুরু করে।'

'কোন্ লতাপাতা?'

'বুনো আগাছা।'

'মেয়েটা বুঝতে পারে না যে তাকে ওই সব আগাছা খেতে দেওয়া হয়েছে?'

'না। ছেলেরা পানের সঙ্গে ওসব দিয়ে দেয়। তারপর থেকে মেয়েটার আর কিছুই ভালো লাগে না, শুধু ওই ছেলেটার সঙ্গে—তার মরদের সঙ্গে থাকতে চায়। আমি এসব জানি—আমার নিজের চোখে দেখেছি।'

'কাকে দেখলি?'

'আমার এক বান্ধবীকে। ও আমার চাইতে বয়সে বড়ো।'

'তারপর কি হলো?'

'মেয়েটা পাগল হয়ে গেলো, ছেলেটার সঙ্গে শহরে পালিয়ে গেলো।'

'সেটা যে ওই আগাছার জন্যে হয়েছে তা তুই কি করে জানলি?'

'তা ছাড়া আবার কি হবে? তা না হলে মেয়েটা ওর বাবা মাকে ছেড়ে চলে যাবে কেন? ছেলেটা ওর জন্যে শহর থেকে অনেক জিনিস নিয়ে আসতো ..জামা-কাপড়, গয়না মিঠাই।'

'তা ওই আগাছাটা এলো কি ভাবে?'

'মিঠাইয়ের মধ্যে ছিলো। তা না হলে মেয়েটা ওকে ভালোবাসবে কেন?'

'ভালোবাসা অন্যভাবেও তো আসতে পারে। আর কি কোনো পথ নেই?'

'না, নেই। মেয়েটা অমন করলো বলেই তো ওর বাবা মার অতো রাগ।'

'তুই ওই আগাছাটা দেখেছিস?'

'না। সেটা ওরা এক দূরদেশ থেকে নিয়ে আসে। আমার মা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো, আমি যেন কারুর কাছ থেকে পান বা মিঠাই না খাই। পুরুষ মানুষরা ওর মধ্যেই ওষুধ পুরে দেয়।'

'তোর খুব বুদ্ধি! কিন্তু তোর বন্ধু ওটা খেলো কি বলে?'

'নিজেকে কষ্ট দেবার জন্যে খেলো,' কঠিন সুরে বললো অঙ্গুরি।

পরমুহূর্তেই, হয়তো বান্ধবীর কথা মনে করে, ওর মুখে মেঘ ঘনালো। 'পাগল…বেচারী পুরো পাগল হয়ে গিয়েছিলো। কক্ষনো চুল আঁচড়াতো না…সারা রাত শুধু গান গাইতো…'

'কি গাইতো রে?'

'জানিনে। বুনো আগাছা খেলে সবাই অমন করে গান গায়। আবার কাঁদেও।'

আলোচনাটা সামান্যই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছিলো। তাই আমি ঘরে চলে গেলাম।

একদিন দেখি, অঙ্গুরি উদাস মনে নিম গাছগুলোর তলায় বসে রয়েছে। সাধারণত শব্দ শুনে বোঝা যায়, অঙ্গুরি কুয়োর পারে আসছে। ওর ঘুঙুরের গুঞ্জনই ওর আসার খবরটা জানিয়ে দেয়। কিন্তু সেদিন ওর নুপূর নিশ্চুপ ছিলো।

'কি হয়েছে রে, অঙ্গুরি?'

আমার দিকে এক ঝলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন নিজেকে খানিকটা ফিরে পেলো ও।

'আমাকে পড়তে শেখাবে, বিবি?'

'কেন, কি হলো?'

'আমাকে আমার নামটা লিখতে শিখিয়ে দেবে?'

'কিন্তু তুই লিখতে চাইছিস কেন? চিঠি লিখবি বলে?'

অঙ্গুরি কোনো জবাব দিলো না। ফের নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো।

'তাতে তোর পাপ হবে না?' ওর বিষণ্ণতা দূর করার চেষ্টায় জিগেস করলাম। কিন্তু অঙ্গুরি তাতে সাড়া দিলো না। দুপুর বেলাটা একটু গড়িয়ে নেবার জন্যে আমি বাড়ির ভেতরে চলে গেলাম। সন্ধ্যেবেলা যখন ফের বেরিয়ে এলাম, তখন দেখি অঙ্গুরি সেই একই জায়গায় বসে রয়েছে—মনের দুঃখে গান গাইছে আপন মনে। আমার আসার শব্দ শুনেই ও ঘুরে তাকিয়ে, আচমকা গান থামিয়ে দিলো। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাস বইছিলো বলে কাঁধ দুটো কুঁজো করে বসেছিলো ও।

'তুই তো বেশ গাইতে পারিস রে, অঙ্গুরি!'

লক্ষ্য করলাম প্রাণপণে চোখের জল ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মেয়েটা। ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়লো ওর ঠোঁটের পাতায়।

'আমি গাইতে জানি নে।'

'কিন্তু গাইছিলি তো!'

'এই গানটা…'

'এই গানটা তোর বন্ধু গাইতো,' ওর হয়ে কথাটা সম্পূর্ণ করে দিলাম আমি।

'আমি ওর মুখে গানটা শুনেছিলাম।'

'আমাকে শোনাবি?'

ও গানের বাণীগুলো আবৃত্তি করতে শুরু করলো:

'এবার এসেছে ঋতু বদলের পালা—চার মাস শীত, চার মাস দাহ, আর বাদলের ডালা।'

'ওভাবে নয়। তুই আমাকে গেয়ে শোনা।'

ও তা শুনলো না। শুধু বাণীগুলো বলতে লাগলো :

'চার মাস শীত আমার হৃদয়ে কাঁপন জাগায়, শোনো
গ্রীষ্ম চার মাস তপনের তাপে বাতাসও দীপ্ত জেনো।
চার মাস ঝরে বাদলের ঘন ধারা—
আকাশের বুকে পুঞ্জিত মেঘ
কেঁপে কেঁপে হয় সারা।'

'অঙ্গুরি!' আমি জোর গলায় ওকে ডাকলাম।

মোহাবিষ্টের মতো ফিরে তাকালো ও। ইচ্ছে করছিলো, দু কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জিগেস করি, ও কোনো বুনো আগাছা খেয়েছে কিনা। কিন্তু তার বদলে ওর দুকাঁধে হাত রেখে জানতে চাইলাম, নিয়মিত খাওয়া দাওয়া করছে কি না। খায়নি। প্রাভাতি তার মনিবের কাছে খায় বলে, ও শুধু নিজের জন্যেই রান্না করে। জিগেস করলাম, 'আজ রান্না করেছিলি?'

'এখনও করিনি।'

'সকালে চা খেয়েছিলি?'

'চা? আজ দুধ নেই।'

'আজ দুধ নেই কেন?'

'পাইনি। রামতারা⋯'

রামতারা রাতের পাহারাদার। প্রাভাতি অঙ্গুরিকে বিয়ে করার আগে রামতারা পাহারা শেষ করে কুয়োতলায় তার খাটিয়াতে গিয়ে শোবার আগে, আমাদের বাড়ি থেকেই এক পেয়ালা করে চা পেতো। অঙ্গুরি আসার পর থেকে সে ওদের সঙ্গেই চা খায়। আগুনের সামনে গোল হয়ে বসে সে, অঙ্গুরি আর প্রাভাতি নিয়মিত চা পান করে। তিন দিন আগে রামতারা তার দেশে বেড়াতে গেছে।

'তিন দিন তুই চা খাসনি?' জিগেস করলাম ওকে।

ফের মাথা নাড়লো ও।

'কিছু খাসওনি বোধহয়?'

অঙ্গুরি কোনো জবাব দিলো না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো : খেলেও, তা না খাওয়ার মতোই খেয়েছে।

রামতারাকে মনে পড়লো আমার—সুদর্শন, চটপটে, রসিক মানুষ। কথা বলার সময় সর্বদা ওর ঠোঁটের কোণে এক টুকরো অস্পষ্ট হাসি লেগে থাকে।

'অঙ্গুরি ?'

'বলো, বিবি।'

'বুনো আগাছার জন্যেই কি এমন হলো ?'

ওর দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে, ছোটো ছোটো দুটি বিন্দু হয়ে জমে থাকে ঠোঁটের দু কোণে।

'ধিক্ আমাকে !' কান্না কাঁপা গলায় বলতে শুরু করে ও, 'আমি কোনোদিনও ওর কাছ থেকে মিঠাই নিইনি…একটা পানও নিইনি…কিন্তু চা…'

অঙ্গুরি ওর কথা শেষ করতে পারে না। দ্রুত নেমে আসা অশ্রুর স্রোতে ওর কণ্ঠস্বর ডুবে যায়॥

সূর্যের কিরণ আলোকিত করে তোলে গোলাপের ছোট্ট চারাকে। তরুণ-যুবক আকুল আগ্রহী দৃষ্টি মেলে রাখে তরুণীর ঠোঁটে চুপি চুপি চুমু এঁকে দেবে বলে। ছোট্ট চারাগাছে ফুলের কুঁড়ি ফুটে ওঠে। স্মিত হাসি ফুটে ওঠে তরুণীর ঠোঁটের পাতায়। গোলাপটা তুলে নিয়ে ও সেটাকে যুবকের কোটের কলারে লাগিয়ে দেয়, তারপর নিজের ঠোঁটের হাসিটা ছড়িয়ে দেয় যুবকের ঠোঁটে। নিবিড় আলিঙ্গনে যুবকের কঠিন বাহু তরুণীর বাহুতে চেপে বসে। তার ঠোঁট মেয়েটির কানের কাছে নিজের প্রাণের সমস্ত আলোড়ন উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়, বলতে চায় সেই সমস্ত নরম অনুভূতির কথা, যা মেয়েরা প্রেমিক-পুরুষের মুখ থেকে শুনবে বলে উন্মুখ হয়ে থাকে চিরদিন।

চমকে উঠে ঘুম ভাঙে রাণীর। আনন্দের বহুমূল্য মুহূর্তগুলোকে নতুন করে ধরে রাখার বাসনায় চোখ দুটো বন্ধ করে রাখে ও। কিন্তু ওর সচেতন মন তাতে বাধা দেয়। ফিসফিসিয়ে বলে, ওটা স্বপ্ন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠে হালকা পায়ে দেরাজ-আলমারিটার দিকে এগিয়ে যায় রাণী। সেখান থেকে একটা চিঠি বের করে এগিয়ে যায় জানলার কাছে। ভোরের নরম আলোয় প্রাণ ভরে চিঠির বিষয় বস্তুটুকু পান করে ও। তারপর পরিপূর্ণ দৈহিক সুষমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জানলার কাছেই। সাইপ্রেস গাছের মতো শরীর, চন্দনগাছের গুঁড়ির মতো বাহু, সীমের মতো আঙুল, আমের ফালির মতো চোখ, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট···নিজের অজান্তেই স্বপ্নের ঘোর থেকে মুক্ত হয়ে রাণীর মনে হয়, এই সমস্ত উপমাগুলো শুধু ওর সম্পর্কেই বলা যেতে পারে।

বাগানে বেরিয়ে আসে রাণী। গাছ থেকে একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে গোলাপের শিশির-ভেজা পাপড়িগুলোতে সোহাগের ঠোঁট বুলিয়ে দেয় ও। গোলাপের নির্যাস আর ওর ঠোঁটের আনন্দটুকুর আস্বাদ নেবার জন্যে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসা মানুষটাকে অভ্যর্থনা জানাতে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে দিগন্তের দিকে তুলে ধরা ওর মুখখানিতে। কিন্তু তারপরেই পেছন থেকে ছুটে আসা একটা যন্ত্রণাকাতর আহ্বানে কল্পনার জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ও।

'রাণী, রাণী!' ওর দিদি মালিকা ডাকছিলো ওকে।

'এক্ষুনি যাচ্ছি, মালিকা,' বলতে বলতে বাগান থেকে চলে আসে রাণী।

'দরজাটা বন্ধ করে দে···বন্ধ করে দে দরজাটা। বাতাসটা আমার পক্ষে বড্ড জোরালো,' রাণী ঘরে ঢুকতেই মালিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো।

'বাতাসটা কিন্তু ভারি সুন্দর, মালিকা,' দরজা বন্ধ করে শান্ত সুরে বললো রাণী।

'এ বাতাস আমার হাড়ে শিরিষ-কাগজ বুলিয়ে দেয়। আমি মোটে সহ্য করতে পারি নে।' গায়ের চাদরটা চিবুক অব্দি টেনে নেয় মালিকা।

'ঘুমটা ভালো হয়েছিলো ?'

অন্য রাতগুলোর তুলনায় ঘুমটা আলাদা হওয়ার কথা ছিলো কি ? প্রতি রাতেই তো সেই একই ভাবে কেঁপে কেঁপে চমকে ওঠা !

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে রাণী আচমকা জিগেস করলো, 'তুমি কখনও স্বপ্ন দ্যাখো ?'...তখনও নিজের স্বপ্নটার কথা ভাবছিলো ও।

'স্বপ্ন ?' মালিকা অবাক হয়ে ওঠে। 'জীবনটা স্বপ্ন ছাড়া আর কি ? পরপর কতকগুলো স্বপ্ন, জাগরণ, আর ঘুমিয়ে পড়া।'

'ভোরের স্বপ্ন কি সত্যি হয় ?'

'মেয়েদের কাছে ভোরের বেলাটা একটা অনন্ত সান্ত্বনা। ভোর আমাদের পরম বন্ধু। আমাদের দিনগুলোর আগে আগে আসে ভোর।'

'স্বপ্ন কি কখনও সত্যি হয় না ?'

'না, সত্যি হয়ে ওঠার পক্ষে ওরা বড়ো শীর্ণ।'

'মালিকা ?'

'স্বপ্নরা যেমন আছে, থাক। ওদের কথা বলতে গিয়ে আমি জিভটা প্রায় খসিয়ে ফেলেছিলাম, আর কি !'

'বাগানে চলো, মালিকা। দ্যাখো, আজকের দিনটা কি সুন্দর !'

'এটা কি ঋতু ?'

'বসন্ত।'

'বাজে কথা।'

'না, মালিকা, না। এটা বসন্ত।'

'বসন্ত বলে কিছু নেই, রাণী। জীবন একটা বিরাট ধূসর অঞ্চল, মাঝে মাঝে সেখানে বসন্তের মরীচিকা দেখা দেয়।'

মালিকার কথায় রাণী চঞ্চল হয়ে ওঠে। দুই স্তনের মাঝখানে গুঁজে রাখা চিঠিটাকে স্পর্শ করার জন্যে ওর ডান হাতটা বুকের কাছে উঠে আসে।

'ওটা কি ?'

'একটা চিঠি,' রাণী স্বীকার করে নেয়।

'ভালোবাসার চিঠি ?'

'হ্যাঁ, সব চাইতে ভালোবাসার জনের চিঠি।'

'জীবনের সব কিছু প্রতিশ্রুতি ভরা ?'

'হ্যাঁ, সমস্ত প্রতিশ্রুতি।'

'ওসব তুই আগেও জানতিস।'

'কিন্তু মালিকা...'

'ওগুলো শুধু কথা, হাজারো কথা।'

'কিন্তু না বলা কথা।'

'বললে, ওদের অর্থ হারিয়ে যায়।'

'মালিকা ?'

'আমার বালিশের তলা থেকে চাবিটা নিয়ে, ওই দেরাজটা খোল। ওতে চিঠিগুলো রয়েছে, তোর চিঠিটার মতো অনেক চিঠি।'

'তুমি যা-ই বলো না কেন, আজ আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো,' মালিকাকে থামিয়ে দিয়ে রাণী বলে। 'তুমি এভাবে নিজেকে মেরে ফেলবে, আমি তা কিছুতেই হতে দেবো না।' রাগের সুরে কথাটা বলেই রাণী অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। মালিকার ক্লান্ত জীর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে ওর আগেকার সৌন্দর্যের কথা মনে পড়ে রাণীর।

রাণীর চাইতে অনেক বেশি সুন্দরী ছিলো মালিকা। মনটাও সমান সুন্দর হওয়ায়, যেন এক দিব্যজ্যোতি ফুটে বেরুতো ওর মুখ থেকে। এখন রাণীর চোখের সামনে যে পড়ে রয়েছে, সে মালিকা নয়—সে এক অপরূপা নারীর পায়ের কাছে অনিবার্যভাবে স্তূপীকৃত হয়ে থাকা কিছু কোমল বিশেষণ আর আকর্ষণীয় রূপকের এক করুণ শব-শোভাযাত্রা।

রাণী চা বানায়। চা খেয়ে ওরা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বহির্বিভাগে ভীষণ ভিড়। রাণী এর আগে কোনোদিন হাসপাতালে আসে নি। ওর মনে হয়, সমস্ত মানুষ জাতিটাই বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মালিকাকে ও ডাক্তার শ্রী চাঁদের অফিস-ঘরে নিয়ে যায়। তারপর এক কোণে ওকে বসিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে শুরু করে।

'তুই কেন চাইছিস, আমি একটা অচেনা বিছানায় শুয়ে মরি ?' দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রশ্ন করে মালিকা। 'হাসপাতালের দরজায় থাকার চাইতে বাড়িতে থাকা অনেক ভালো।'

'এবারে আমাদের পালা,' মালিকার কথায় বাধা দিয়ে রাণী মালিকাকে ডাক্তারের ঘরে নিয়ে যায়।

সামনের কাগজের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে ডাক্তার রোগিনীর নাম জিজ্ঞেস করলেন।

'মালিকা।'

'মালিকা ?' রোগিনীর অপরিচ্ছন্ন বেশ-বাস আর শীর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে নামটা পুণরাবৃত্তি করলেন ডাক্তার। নামটা লিখতে গিয়ে একটা কৃত্রিম হাসি মুখে ফুটে উঠলো তাঁর। মালিকার কপালে কুঞ্চন রেখা জেগে উঠলো। একটু পরেই তার জায়গায় এলো প্রশ্রয়ের হাসি।

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমার একটা বিশাল সাম্রাজ্য আছে। তাই আমার নাম, মালিকা।'

ডাক্তার কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও মত বদলে মালিকার অসুখের বিষয়ে কিছু জানতে চাইলেন।

'আমার খিদে কখনও মেটেনা, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না।'

'ওটা মিথ্যে খিদে,' স্বয়ংক্রিয়ভাবে জবাব দেন ডাক্তার।

'তা জানিনে, তবে লেবেলগুলোতে ভুল থাকতেই পারে।'

রোগিনীর মন্তব্যে ডাক্তার চমকে উঠলেন। মালিকাকে পরীক্ষার টেবিলে উঠতে বলে নিজেকে সামলে নিলেন উনি। মালিকা টেবিলে উঠে শক্ত তোষকে পিঠ রেখে শুয়ে পড়লো। ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক্তার দরজার দিকে দৃষ্টি মেলে রাখলেন। কেউ এলো না। ফের অনেকক্ষণ ধরে জোরে ঘণ্টি বাজিয়ে ডাক্তার ক্লান্ত সুরে বলে উঠলেন, 'আমার 'স্টাফ' কোথায় গেছেন, জানি না।'

একটা পিয়ন ঘরে এসে ঢুকতেই ভদ্রলোক তাকে তীক্ষ্ণ গলায় 'স্টাফ'কে ডেকে দিতে বললেন।

'আমার নার্স লাগবে না, ডাক্তার বাবু,' মালিকা বললো।

'একজন নার্স এখানে উপস্থিত না থাকলে আমি আপনাকে পরীক্ষা করতে পারি না। হাসপাতালের নিয়ম।'

'শুধু রোগ নির্ণয় ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে একজন সুস্থ ডাক্তার একটি অসুস্থ মহিলার শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন নি—এটা তারই সাক্ষী বিশেষ।' মালিকা মৃদু হাসলো। অসুস্থতা সত্ত্বেও ওর হাসিটা বেশ সজীব।

'সংক্ষেপে তাই।'

'তার অর্থ আপনি বলতে চাইছেন, একটা পুরুষ মানুষের হাত একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই মেয়েদের শরীর পরীক্ষা করে? তা সে হাতের মালিক একজন ডাক্তার আর শরীরটা একটি রোগিনীর হলেও, তা-ই?'

এটা চিকিৎসা বিষয়ক রীতি—বুঝতেই তো পারছেন!'

'এ দেশে আমরা খাদ্যশস্যের ফসল ততোটা তুলি না, যতোটা ন্যায় আর নৈতিকতার ফসল তুলি।'

ডাক্তার মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ তুলে মালিকার দিকে তাকালেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই স্টাফ নার্স ঘরে এসে ঢুকলেন। আসন ছেড়ে মালিকার দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। জিজ্ঞেস করলেন, ওর শরীরের কোনো অংশে ব্যথা-বেদনা আছে কি না।

'আমার শরীরের প্রতিটা স্নায়ুতেই যন্ত্রণা,' বললো মালিকা।

স্টেথোস্কোপটা ঠিকঠাক করে নিয়ে সেটা মালিকার বুকে চেপে রেখে, ওকে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে বললেন ডাক্তার।

'নিচ্ছি, ডাক্তারবাবু। ওটা এখন আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'নিঃশ্বাস নিতে কোনো কষ্ট হয়?'

'প্রতিটা নিঃশ্বাসেই কষ্ট।'

ওর যকৃৎ পরীক্ষা করে ডাক্তার অস্ফুটে বললেন, 'কোনো দোষ নেই। বড়োও হয়নি।'

'নিশ্চয়ই ওতে অনেক কিছু জমে আছে।'

নার্সের দিকে মুখ ফেরাবার আগে ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মালিকার দিকে তাকালেন।

নার্সকে বললেন, 'রক্তের প্রলেপটা পরীক্ষা করতে পাঠাবেন।' তারপর কুর্সিতে বসে সামনের ফর্মটা ভর্তি করতে শুরু করলেন।

'বয়েস?'

'ধরুন বত্রিশ।'

'আপনার ইয়ের নাম…'

'আমি ঘড়ি বা সাইকেল নই, যে আমার কোনো মালিক থাকবে।'

'আমি আপনার স্বামীর নাম জানতে চাইছিলাম।'

'আমি চাকরি করি না।'

'আমি সে কথা জিগেস করিনি।'

'আমি বলতে চাইছি যে আমি স্ত্রী হিসেবে কোনো চাকরি করছি না।'

'স্ত্রী হিসেবে চাকরি?'

'শুনুন, ডাক্তারবাবু—আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত। আপনি একজন ডাক্তার, উনি একজন নার্স, আপনার অফিস-ঘরের বাইরে ওই লোকটা একজন পিয়ন। তেমনি বিবাহিত মানুষরাও স্বামী আর স্ত্রীর চাকরিতে নিযুক্ত থাকে।'

যেন কালির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যেই ডাক্তারবাবু কলমটা একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন।

'আমি ঠিক বলি নি, ডাক্তারবাবু? তবে কি না, এ চাকরিতে কোনো পদোন্নতি নেই। অন্য যে কোনো পেশায় মানুষ উঁচু পদে উঠে যাবার সুযোগ পায়। কিন্তু একটি স্বামী বা একটি স্ত্রী সারাটা জীবন স্বামী বা স্ত্রী হয়েই থাকে।'

'তাদের আবার কি পদোন্নতি হতে পারে?' রোগীদের সঙ্গে ছোটাখাটো কথাবার্তা বলা পছন্দ না করলেও বিবেকের বিরুদ্ধে ডাক্তার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করার লোভ সামলাতে পারলেন না।

'আছে, তবে কারুরই তা হয় নি।'

'যেমন?'

'স্বামী প্রেমিক হয়ে উঠতে পারে, প্রেমিক দেবত্ব অর্জন করতে পারে। সাময়িক সম্পর্ক হয়ে যেতে পারে আত্মিক সম্পর্ক।'…

ডাক্তার চুপ করে রইলেন। টেবিলের টানা থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালেন। বিশ্লেষক এসে রক্তের নমুনা নিয়ে গেলেন পরীক্ষা করার জন্যে।

ইতিমধ্যে ডাক্তার ফর্মটা ভর্তি করে ফেলেছিলেন। নার্সের দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'কুড়ি নম্বর ওয়ার্ড, আট নম্বর বেড।'

নার্স মালিকার হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার বললেন, 'রোগীদের সঙ্গে দামী জিনিস রাখা বারণ।'

'আমার কাছে কয়েকটা দামী মুদ্রা রয়েছে,' চাদরের একটা গ্রন্থি দেখিয়ে মালিকা দরজার কাছ থেকে বললো।

'ওগুলো আপনি ওয়ার্ডে রাখতে পারবেন না।'

এগুলো আমি সারা দুনিয়ায় কোথাও রাখতে পারবো না,' মালিকার কণ্ঠস্বর এতো অস্ফুট যে তা প্রায় শোনাই যায় না। চাদরের গ্রন্থি থেকে ছোট্ট একটা লাল থলে বের করে সেটা রানীর হাতে তুলে দেয় ও 'এগুলো বড্ড দামী রে! যত্ন করে রাখিস।'

মালিকাকে শয্যার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গের নার্সটি ওকে বিছানায় উঠতে সাহায্য করার সময় অন্য একটি নার্সকে বলেন, 'আট নম্বর।'

'সংখ্যা দিয়ে নামকরণ আমার ভালো লাগে', মালিকা রানীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো।

'কেন ?'

'কারণ সংখ্যার মধ্যে ঈর্ষার কোনো স্থান নেই। নয়, দশ, সাত—সবই সমান। নম্বরের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা তুলনা চলে না। নামের মতো ওরা মিথ্যে নয়!'

রানী ওর দিকে একটা চুমু ছুঁড়ে দিয়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে যায়।

ওয়ার্ডে ছজন রোগী। অন্য পাঁচটি রোগিনীকে লক্ষ্য করে দেখলো মালিকা। ওদের অসুস্থতার কারণ ও বুঝে ফেললো নিমেষেই। ওই ফ্যাকাসে মেয়েটিকে বাদ দিলে বাকি চারজন জরা এবং দারিদ্রের রোগে ভুগছে। ওদের অবস্থা প্রায় বেঁচে না থাকারই মতো। ওরা কিছু খেতে বা পান করতে পারে না। খাওয়ার প্রচেষ্টাতেই ওদের প্রচণ্ড বমি এসে যায়।

সন্ধ্যা বেলা ডাক্তার এসে মালিকাকে একটা ঘুমের ওষুধ খেতে বললেন।

'আমার দরকার নেই, ডাক্তারবাবু,' মালিকা বললো।

'কিন্তু আপনার চারদিকে এতো গোঙানি যে সারারাত আপনি হয়তো ঘুমোতেই পারবেন না।'

'সে আমি সামলে নেবে খন। জ্বালা-যন্ত্রণা যে কি, তা আমি জানি, ডাক্তারবাবু। এই বিশাল দুনিয়ায় আপনি এতোটুকু জায়গা খুঁজে পাবেন না, যেখানে মানুষ একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারে। ওই জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাকিয়ে দেখুন পীড়িত মানুষজাতির দিকে'—

ডাক্তার মালিকার আবেগপ্রবণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন! তারপর ওর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় বললেন, 'এই যে,আপনার রক্ত পরীক্ষার ফলাফল। লোহিত আর শ্বেত রক্ত কণিকা যেমন থাকার কথা, তেমনি আছে। কোনো সংক্রামক রোগ বা তেমন কোনো রোগের বীজও নেই। তবে কয়েকটা নাম না জানা জীবাণু রয়ে গেছে।'

মালিকা স্মিত মুখে অস্ফুটে বললো, 'আপনি ওদের পরিচয় জানতে ইচ্ছেমতো সময় নিন, ডাক্তার বাবু। তবে বিফল হলে, আমার কাছে আসবেন। আমি বলে দেবো।'

ডাক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললেন, 'আপনি এই জীবাণু-গুলোকে চেনেন ?'

'চিনি।'

'আপনি তো আমাদের, মানে ডাক্তারদের, অবাক করে তুলছেন। আরও বিশদ অনুসন্ধানের জন্যে আপনার রক্তের নমুনাটা আমরা বিদেশে পাঠাচ্ছি।'

'বিদেশে এর চাইতে বেশি কিছু হবে না।'

'ভারি অদ্ভুত তো!'

'সত্যি তাই।'

'কিন্তু আপনি ওগুলোকে চেনেন।'

'চিনি।'

'তাহলে আমাদের বলুন।'

'আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

'এর চিকিৎসাও আপনি জানেন?'

'জানি।'

'তাহলে নিজেই নিজের চিকিৎসা করছেন না কেন?'

'কারণ আমি নিজেকে অপারেশন করতে পারি না। সে জন্যে আমার সহায্যের প্রয়োজন।'

'আপনার নিজের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে আপনি যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন, তবেই আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করবো।'

'চেষ্টা করে দেখুন।'

'ওই জীবাণুগুলো কি?'

'আপনি কখনও পার্বতীর সেই কাহিনীটা শুনেছেন কি? একবার শিব কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরতে ভীষণ দেরি হচ্ছিলো বলে, পার্বতী বড়ো নিঃসঙ্গ আর নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছিলেন। তাই তিনি তখন নিজের গায়ের চামড়া থেকে ময়লা তুলে, তাই দিয়ে একটি সন্তান গড়ে নিলেন।'

রোগিনীর সঙ্গে এহেন একটা আলোচনা শুরু করার জন্যে অনুতাপে ডাক্তারের মুখটা কুঁচকে ওঠে। কুব্ধ হয়ে তিনি ভাবলেন, কেন তিনি এ সমস্ত আজেবাজে কথা শুনে এভাবে সময় নষ্ট করছেন।

'আমি তো বলেছি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

'এতে বিশ্বাস করার আছেই বা কি?'

'ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছেমতোই তাহলে চলুক।'

ডাক্তারকে বিভ্রান্ত দেখায়। মহিলার কথাবার্তা শুনে ওঁকে স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে উনি তা নন। প্রকাশ্যে ডাক্তার প্রশ্ন করলেন, 'বেশ, তারপর কি হলো?'

'আপনাকে তো বললাম, কিভাবে পার্বতী নিজের গায়ের ময়লা দিয়ে একটি সন্তান গড়ে নিয়েছিলেন। তেমনিভাবে নারীজাতির হৃদয় থেকে আজ অব্দি যতো রক্ত ঝরেছে, কপাল দিয়ে যতো ঘাম নেমে এসেছে, দু চোখ থেকে যতো অশ্রু বয়েছে—তার সব কিছু

দিয়ে তৈরি হয়েছি আমি। তাই আমার রক্তের মধ্যে আপনি কিছু অপরিচিত জীবাণু দেখতে পেয়েছেন।'

ঘামের আস্তরণ মুছে ফেলার জন্যে ডাক্তার নিজের কপালটা স্পর্শ করে প্রশ্ন করলেন, 'এই রোগটাকে আপনি কি নাম দিয়েছেন ?'

'চিন্তা রোগ।'

'আর এর চিকিৎসা ?'

'মানুষের শরীরে অ্যাপেন্ডিক্স্ বলে একটা জিনিস আছে, জানেন তো ? খাদ্যে ঠাসা হলে ওটা পচে যায়। তখন ওটা থেকে যে বিষ সৃষ্টি হয়, তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'তেমনি মাথার মধ্যেও একটা অ্যাপেন্ডিক্স্ আছে! অনেক চিন্তা ঠেসে রাখলে, সেটা পচে গিয়ে ফেটে যায়।'

'এর প্রমাণ কি আছে ?'

'এক্স্-রে দিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করে দেখুন। তবে আমার ধারণা, তাতেও কোনো লাভ হবে না। বিজ্ঞান এখনও অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছে।'

'তা সত্যি।'

'তবে আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তো আমাকে অপারেশন করুন। আপনি তাহলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

ডাক্তার কিছুক্ষণ মালিকার দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত পায়ে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে মালিকার অবস্থার অবনতি ঘটলো। ওর কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ।

'ডাক্তার বাবু, আমার কথা শুনুন...আপনি আমাকে অপারেশন করুন। আমার ভয় হচ্ছে, আমার মগজের মধ্যে অ্যাপেন্ডিক্স্টা এবারে ফেটে যাবে।'

ডাক্তার কিছু বললেন না। শুধু কথা দিলেন, ওকে তিনি এক্স্-রে করাবেন।

'আপনাদের বিজ্ঞান এখনও অতোটা এগোয়নি...' মালিকা ওর কথা শেষ করতে পারলো না।

ডাক্তার নিজের অফিস ঘরে গিয়ে তাঁর উর্ধতন ডাক্তারকে টেলিফোন করলেন। তারপর ফিরে এলেন একটা সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে।

'ওটা কি, ডাক্তার বাবু ?'

'কোরামিন।'

'কেন ?'

'হৃৎপিণ্ডের জোর বাড়াবার জন্যে।'

এক টুকরো উজ্জ্বল হাসিতে মালিকার মুখখানা ঝলমলে হয়ে উঠলো।

'হৃৎপিণ্ডের জোর বাড়াবার জন্যে !'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার হৃৎপিণ্ডটা এমনিতেই আমার পক্ষে যথেষ্ট বেশি জোরদার।'

ডাক্তার নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

তখন সকাল নটা, দর্শনার্থীদের সময়। কিন্তু রাণী তখনও আসেনি। ও এলো বেলা দশটায়।

'তুই এসেছিস, রাণী!'

'হ্যাঁ, মালিকা।'

'আমি তোর কথাই ভাবছিলাম।'

'এই তো আমি! আজ তুমি কেমন আছো?'

'আরও কাছে আয়—'

'এই তো…'

'ওই লাল থলেটা?'

'নিরাপদেই আছে। তুমি ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না।'

'ওর মধ্যে কতকগুলো দামী মুদ্রা রয়েছে। তুই দেখেছিস?'

'মালিকা, তোমার বিনা অনুমতিতে আমি ওগুলো দেখতে পারি না। তুমি ভালো হয়ে ওঠো, তারপর নিজেই আমাকে দেখিয়ো।'

মালিকার প্রয়াস সত্ত্বেও ওর নিস্তেজ চোখদুটি বুজে আসে। স্রেফ ইচ্ছাশক্তির বলেই জোর করে চোখদুটিকে খুলে ধরে ও।

'আমার সময় এসে গেছে রে, রাণী! আমার মাথার অ্যাপেন্‌ডিক্স্‌টা ফেটে গেছে।'

'আমি তোমার কাছেই আছি, মালিকা।'

'ওই মুদ্রাগুলো…'

'আমি ওগুলো হারাবো না, মালিকা…তুমি চিন্তা কোরো না।'

'তোকে আমার কিছু বলার আছে।'

'এই তো আমি, তোমার কাছেই রয়েছি।'

'ওই মুদ্রাগুলো হয়তো তোর কোনো কাজে আসবে না, কিন্তু…'

'তুমি তো বলেছো, ওগুলো দামী।'

'ভীষণ দামী।'

'আমি কোনোদিনও ওগুলোকে হারাবো না, মালিকা।'

'ওরা…ওই মুদ্রাগুলি…' মালিকার কথা জড়িয়ে আসে, 'ভালোবাসার মুদ্রা, বিশ্বাস আর…'

এক আকস্মিক আতঙ্কে অধীর হয়ে মালিকার কপাল স্পর্শ করে রাণী। তারপর তাকায় ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মালিকার নাড়ি পরীক্ষা করে কম্বলের প্রান্তভাগটুকু ওর মুখের ওপর দিয়ে টেনে দেন।

রাণীর মনে হয়, মালিকা নয়—আজ অব্দি পুরুষ মানুষ কোনো সুন্দরী নারীর কানে কানে যতো সোহাগের কথা শুনিয়েছে, তা সবই মরে গেলো চিরদিনের জন্যে।

সারা রাত ধরে নশো দু নম্বর টেলিফোনটা ডক্টর রবির মনের মধ্যে বেজেছে। অন্য প্রান্তেও সেটা বেজেছে কিনা ভাবতে গিয়ে তাঁর ঠোঁটে এক টুকরো বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো।

শেষ অব্দি একদিন দুপুর নাগাদ দূর-আলাপনীতে নম্বরটা ঘোরালেন তিনি। মিসেস অরোরার বদলে কৌশি নামটা বেরিয়ে গেলো তাঁর মুখ ফসকে। কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁটদুটিকে সামলে রাখলেন ডক্টর রবি।

আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেছে, ওই নামটাকে তিনি মনের নির্জন কোটরে কবর দিয়ে রেখেছেন। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিলো, ওটা চিরকাল কবরস্থ হয়েই থাকবে। কিন্তু আজ নম্বরটা ঘোরাতে গিয়ে তাঁর মনে হলো, নামটা চিরদিনই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে। আর আজ একেবারে আচমকা তা উঠে এসেছে ঠোঁটের পাতায়।

'কে বলছেন, জানতে পারি ?' একটা নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করলো।

'আমি, রবি বলছি।'

'রবি ? কোন রবি ?'

মুহূর্তের জন্যে নিজের অনস্তিত্ব অনুভব করলেন রবি। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিজের পরিচয় হাতড়াতে হাতড়াতে বললেন, 'আমি দিল্লীর অধ্যক্ষ সূরজভানের ছেলে।'

অন্য প্রান্তে কণ্ঠস্বরটা নীরব হয়ে ওঠে। কিন্তু রবির কাছে এ নীরবতার অর্থ, পূর্ব-পরিচয়কে স্বীকার করে নেওয়া। এই নিশ্চুপতাই আশা করছিলেন তিনি। তবু তা ভাঙার জন্যে অর্থহীন ভাবে প্রশ্ন করলেন, 'মনে পড়ে আমাকে ?'

'হ্যাঁ,' মৃদুভাষে জবাব এলো।

'কৌশি, ধরো আজ রাত্তিরে আমার বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করার জন্যে আমি যদি তোমাকে, মানে আমি বলছি মিঃ অরোরার সঙ্গে তোমাকে, আমন্ত্রণ জানাই—তাহলে তুমি কি তা গ্রহণ করবে ?'

'ওঁকেই জিগেস করো না কেন ?'

রবি মিঃ অরোরাকে টেলিফোন করে নিমন্ত্রণ জানালেন। মাত্র আগের দিনই এক বন্ধুর বাড়িতে মিঃ অরোরার সঙ্গে তার প্রথম দেখা। কিন্তু রবির ধারণা, বিদেশে এ ধরনের সামান্য আলাপ-পরিচয়ই আমন্ত্রণ পাঠাবার পক্ষে যথেষ্ট। মিঃ অরোরাও ওঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

অনেক বছর আগে, নিজের যৌবন বয়সে ডক্টর রবি লণ্ডনে এসেছিলেন। এদেশে প্রতিশ্রুতিময় ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পেয়ে আর তিনি স্বদেশে ফিরে যাননি।

আজ সামনের দিকে তাকাবার বদলে তিনি পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন…প্রায় চল্লিশ বছর পেছনে।

তখন রবির বয়েস ছিলো কুড়ি, কৌশির বয়েস বড়োজোর আঠারো, আর ওদের দুজনার মাঝখানে ছিলো অনড় এক প্রাচীর। কৌশিকে পড়াতে পড়াতে রবির বাবা সুরজভান হয়ে উঠলেন ওর মন্দিরের দেবমূর্তি আর কৌশি দেবদাসীর মতো নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিলো তাঁর কাছে। রবি দূর থেকে অনড় হয়ে শুধু লক্ষ্য করেছেন সবকিছু।

পাশের ঘরে কৌশিকে পড়াবার সময় বাবার কণ্ঠস্বর মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনির মতো রবির কাছে ভেসে আসতো। আর কৌশির কণ্ঠস্বর ওর কানে বেজে উঠতো দেবদাসীর নূপুর নিক্কণের মতো।

একটা গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিলো, কৌশির বাবা-মা নাকি ওকে কার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন। তখন বাবার দিকে তাকিয়ে রবির মনে হতো, একটা দেবালয় যেন মহম্মদ ঘোরির আগমন বার্তা পেয়ে গেছে। কিন্তু দেবালয়ের প্রাচীরগুলো ভেঙে পড়ার আগেই দেবমূর্তির অঙ্গের ভেতর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেলো।

রবির কাছে নিশ্চিত আর অনিশ্চিতের অর্থ বদলে গিয়েছিলো। তাঁর বৃদ্ধ বাবার মনের খবরটা কৌশির কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলে, কিন্তু রবির যৌবনের উত্তাপ কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি ওর মনে। তবু নিজেকে সামলে রাখতে হয়েছে রবির, বাবার চোখে তিনি নিজেকে মহম্মদ ঘোরি করে তুলতে পারেননি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতি তাঁর তীব্র আকুলতাও যেন শূন্য হয়ে গেছে।

নিবিড় প্রশান্তি নিয়ে লণ্ডনে চলে এসেছেন রবি।

কিছুদিন বাদেই, যেন পত্রিকা পড়ে, কোনো এক মিস্টার অরোরার সঙ্গে কৌশির বিয়ের খবরটা জানতে পেরেছেন তিনি। এবং তার অল্প কয়েক মাস পরেই জেনেছেন পক্ষাঘাতে পিতার মৃত্যু সংবাদ।

মসৃণভাবে স্বাভাবিক গতিতে জীবন চলেছে রবির। লেখাপড়া শেষ করে এক ইংরেজ ললনাকে বিয়ে করেছেন। প্রতি গ্রীষ্মে অনেক দূর দেশে ভ্রমণে যান। দুটি সন্তানকেও লেখাপড়া শিখিয়ে বড়ো করে তুলেছেন। কিন্তু আজ কৌশির নাম ঠোঁটে আসতেই তাঁর মনে হলো, হৃদয় থেকে ঠোঁট অব্দি আসতে নামটার পুরো চল্লিশ বছর সময় লেগেছে।

আচমকা এক নিবিড় উষ্ণতা ঘিরে ধরে রবিকে। তিনি অনুভব করেন, আজ অব্দি তিনি যা কিছু অর্জন করেছেন তা সবই এক ঘন অরণ্যের মতো—জীবনের চল্লিশটা বছর তিনি ওই অরণ্যেই কাটিয়ে দিয়েছেন এবং ওই অরণ্য তাঁর মজ্জা অব্দি হিমশীতল করে তুলেছে।

একদিন যে কৌশি রবির কাছে ছিলো সূর্য কিরণের মতো, আজ আবার তাঁরই জন্যে সে কিরণ ঝিলমিলিয়ে উঠেছে আর তিনি যেন সেই কিরণেই সতেজ হয়ে ফুটে উঠছেন আবার।

রবির ইংরেজ স্ত্রী সব চাইতে সুন্দর রেশমি কাপড় টেবিলে পেতে, সব চাইতে দামী ফুল দিয়ে টেবিল সাজালো। রবি বাবুর্চিকে চাইনিজ চিকেন, উজবেক ভাত আর রাশিয়ান

স্যালাড তৈরি করার নির্দেশ দিলেন। রবির স্ত্রী মাত্র কিছুদিন হলো একজন জর্জিয়ানের কাছ থেকে পণিরের বুটি বানাতে শিখেছে—রবি ওঁর স্ত্রীকে সেটাও তৈরি করতে অনুরোধ জানালেন। এর আগে কোনো পার্টিতেই রবি এতো ভালো সাজগোছ করেননি। আজ তাঁর অঙ্গে ফরাসী স্যুট। এতোদিন ধরে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখা রেকর্ডগুলো বের করলেন তিনি—বিথোফেনের সিম্ফনি, রবিশংকরের সেতার, চাইকোভস্কি।

অপরাহ্ণ আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু রবিকে উষ্ণ করে তোলা সূর্যটা এখনও উজ্জ্বল—যেন সূর্য কিরণকে রবি নিজের শরীরে ধরে রেখেছেন, লুকিয়ে রেখেছেন নিজের পোশাকের আড়ালে।

ফের স্ত্রীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে রবি লক্ষ্য করলেন, সূর্যের আলোটাকে তিনি সত্যিই স্ত্রীর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন। অথচ একই সঙ্গে মনের গভীরে এক বিচিত্র আতঙ্ক জেগে ওঠে তাঁর—এ আলো যদি কৌশির চোখও এড়িয়ে যায়!

না. সূর্যের আলো সূর্যের আলোকে চিনে নিতে পারবে। রবির নিশ্চিত বিশ্বাস—কৌশিকে দেখেই আলোটা তাঁর চোখে ঝিলমিলিয়ে উঠবে, ওর সঙ্গে কথা বলার সময় তা বেজে উঠবে দুজনের কণ্ঠস্বরে···ওর সঙ্গে করমর্দনের ব্যাপারটাকে নেহাতই সামাজিকতা বলে ধরে নেওয়া হবে···আর তখন সূর্যটা রবির হাতে এসে, ওর হাত স্পর্শ করবে।

কিন্তু ডক্টর রবি অনুভব করলেন, তাঁর আঙুলগুলো উষ্ণ হয়ে ওঠার বদলে আচমকা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। অবাক হয়ে তিনি কলঘরে গিয়ে আয়নাটার সামনে দাঁড়ালেন।

তাঁর চোখে কৌশির মুখখানা চল্লিশ বছর আগে যেমনটি ছিলো, আজও ঠিক তেমনি রয়ে গেছে। পাতলা চেহারা, নিজের সৌন্দর্য সচেতনতায় মুখখানা রক্তিম, নিচের ঠোঁটখানি কেঁপে কেঁপে উঠে ওপরের ঠোঁটের সঙ্গে মিলেমিশে যায়, মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা চুল—মাঝে মাঝে তারা বিদ্রোহী হয়ে ঘাড়ের কাছে গুটিয়ে রাখা খোঁপার বাঁধন থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু রবি আয়নায় নিজের দিকে তাকাতেই, তাঁর বাবার মুখটা তাঁর দিকে তাকালো। সেই চওড়া কপাল, মাথায় রূপোলি-ধূসর চুল, সেই ঝুলে পড়া চামড়া··· কিন্তু চোখদুটো···চোখদুটো দুরন্ত প্রেমে উজ্জ্বল।

হায় ঈশ্বর! ডক্টর রবি অনুভব করলেন, বাবা তাঁর অস্তিত্বটাকে দখল করে নিচ্ছেন। বাবার প্রতি তাঁর যে তীব্র আকুলতা ছিলো, আজ তা আবার ফিরে এসেছে তাঁকে যন্ত্রণা দেবার জন্যে।

না! একটা নিবিড় আতঙ্ক রবির হৃৎপিণ্ডটাকে চেপে ধরলো। আজ বাবা তাঁকে সম্পূর্ণ মুছে দিয়েছেন। চল্লিশ বছর পরে কৌশিকে এক ঝলক দেখার জন্যে তিনি রবির জায়গাটা অধিকার করে নিয়েছেন।

সেই একই বয়েস, সেই একই শুভ্র চওড়া কপাল, মাথায় সেই একই রূপোলি-ধূসর চুলের মুকুট, সেই একই রকম ঝুলে পড়া চামড়া.. আর দুচোখে সেই একই দুরন্ত প্রেম...

আজ, যেন স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই, তিনি তাঁর বাবায় রূপান্তরিত হয়েছেন। কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলার জন্যে রবি হাত তুললেন...কিন্তু হায়। হাতটা প্রাণহীন···যেন বাবার পক্ষাঘাত তাঁকেও আক্রমণ করেছে।

আলমারির কপাটে লাগানো আয়নাটা প্রায় মানুষটার সমান লম্বা। মানুষটা তার কোটের বোতাম খুলতে যাচ্ছিলো। আচমকা প্রথম বোতামেই তার হাতটা স্থির হয়ে রইলো, যেন আয়নার হাতটা থামিয়ে দিলো তাকে।

'তুমি পোশাক পালটাবে না ?' একটি নারীকণ্ঠ জিগেস করলো।

মানুষটা বিষণ্ন হাসলো। আয়নায় কি যেন নড়েচড়ে উঠলো। মানুষটা প্রশ্ন করলো, 'তুমি পোট্রেট অফ ডোরিয়ান গ্রে পড়েছো ?'

'পোট্রেট অফ ডোরিয়ান গ্রে ?'

'অস্কার ওয়াইল্ডের সব চাইতে স্মরণীয় গল্প।'

'কলেজ জীবনে পড়েছিলাম বোধহয়, ঠিক মনে করতে পারছি না। কাহিনীটা একটা ছবি নিয়ে, তাই না ?'

'হ্যাঁ, একটা ছবির কাহিনী—এক দারুণ সুদর্শন মানুষের ছবি।'

'তারপর মানুষটা আর আগের মতো রইলো না আর তার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটাও বদলে গেলো। গল্পটা অনেকটা এই ধরনের কিছু।'

'না—মানুষটার চেহারা বদলায়নি। কিন্তু তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা প্রতিদিন বদলে যেতো।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এবারে মনে পড়েছে। মানুষটাকে আগের মতোই প্রাণবন্ত দেখাতো, কিন্তু তার মানসিক চিন্তার সঙ্গে মিল রেখে ছবিটার মুখে বলিরেখা ফুটে উঠলো। এবারে পুরো কাহিনীটাই আমার মনে পড়ে গেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে, এই আয়নাটা···আয়নাটার দিকে তাকাও···দ্যাখো, আমার মুখটা বদলে গেছে।'

'মনে হচ্ছে, আজকে রাতের পার্টিতে তুমি খুব বেশি মদ খেয়েছো।'

'না—সত্যিই না। তবে ইচ্ছে করছে, এখানে এই একান্তে—এই আয়নাটার সামনে বসে একটু পান করি আর দেখি, আমার মুখটা কতোখানি বদলাতে পারে।'

মহিলাটি একটু দূরে, খাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটার কাছে এগিয়ে গিয়ে ও বিজয়িনীর কণ্ঠস্বরে বললো, 'পার্টিতে তুমি ছিলে সব চাইতে আকর্ষণীয় পুরুষ। আর যারা ওখানে উপস্থিত ছিলো, তুমি তাদের মুখগুলো লক্ষ্য করেছিলে ? ঠিক যেন মাংসপিণ্ড ..'

'আমি তাদের সম্পর্কে কিছু বলছি না, বলছি নিজের সম্পর্কে।'

'হ্যাঁ, একবারটি তাকিয়ে দ্যাখো...আকর্ষণীয় চেহারা, কপাল, চোখ, নাক—সবকিছুই

যেন ঈশ্বর তাঁর অবসর সময়ে সৃষ্টি করেছেন।' মুগ্ধকণ্ঠে মহিলা বলতে থাকে।

'ও সব বাঁধানো বুলি কবিদের জন্যে রেখে দাও', মানুষটার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির সুর।

'মনে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত। আর যাই হোক, এখন মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তুমি আয়নাটার দিকে তাকাতে চাইছো না কেন ? ভয় পাচ্ছো ?'

'আয়নাতে মুখটা কি বদলে যাবে ?'

'বদলে যাবে না, ইতিমধ্যেই বদলে গেছে।'

'কিন্তু আমি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না।'

'এইমাত্র হয়েছে, আমি তক্ষুনি দেখেছি। আমি যখন হাসছিলাম, আয়নায় আমার মুখটা কাঁদছিলো। হয়তো এই আয়নাটা ডোরিয়ান গ্রের ছবির মতো।'

'আমি কলঘর থেকে তোমার রাতের পোশাকটা নিয়ে আসছি, তুমি পোশাকটা পালটে নাও।'

'পোশাক হচ্ছে সভ্যতার প্রতীক। এই পার্টিটার জন্যে তুমিই আমাকে নতুন স্যুট করাতে বলেছিলে।'

'আমি ঠিকই করেছিলাম, তাই নয় কি ? আজ সকলের মনেই তুমি খানিকটা ছাপ ফেলতে পেরেছো।'

'তাই তো পোশাকটা পালটাতে চাইছি না।'

'কিন্তু এখন তো কাছে-পিঠে কেউ নেই।'

'আমি তো রয়েছি।'

মহিলার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, মানুষটা সম্পূর্ণ মাতাল হয়ে গেছে। তাই ও চুপ করে থাকে। মানুষটা ফের বলতে থাকে :

'তখন আমি ওদের মনে ছাপ ফেলেছিলাম, এখন নিজের মনে ছাপ ফেলতে চাই। তাই পোশাক পালটাবো না।'

মহিলা নিশ্চুপ হয়ে থাকে। মানুষটা জিগেস করে, 'একটু হুইস্কি আছে নাকি ?'

মহিলার মুখের ওপর দিয়ে একটা ছায়া সরে যায়। ঘামের মতো সেটাকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় ও জবাব দেয় :

'না।'

'জানো তো, তুমি খুব জবরদস্ত মিথ্যেবাদী নও!'

'আমি তোমাকে আর মদ খেতে বারণ করছি।'

'রাখো তো ওসব কথা! মাত্র এক পেগ—'

'না।'

'ওদের মদ দেবার সময় আমি তোমাকে আপত্তি করতে দেখিনি তো ?'

'ওরা ছিলো আমার অতিথি।'

'সম্মানীত অতিথি! কিন্তু শুধু ওরাই কি সম্মানীত ? আর আমি ?'

'আমি সম্মানীত অতিথি বলিনি, শুধু অতিথি।'

'বেশতো, তাহলে আমাকেও তোমার একজন অতিথি হিসেবে ধরে নাও!'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ধরো, এটা তোমারই বাড়ি আর আমি তোমার অতিথি।'

'শুধু আমার?'

'ঘর চিরদিনই ঘরনীর, তাই নয় কি?'

মহিলা চিন্তা করে দেখে, চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। শোবার সময় হয়ে গেছে মনে করে ও নিঃশব্দে মানুষটার রাত-পোশাকটা নিয়ে এসে বিছানায় ছড়িয়ে রাখে।

মানুষটার দৃষ্টি হালকা নীল রঙের দেয়াল আর ধূসর রেশমি বিছানার চাদরটা হয়ে, বাতিদানের নীলরঙা ঘেরাটোপটার ওপরে স্থির হয়। তার বলতে ইচ্ছে হয়, 'বহু বছর এই ঘর আর অন্যান্য সমস্ত কিছুই তোমার স্বপ্ন ছিলো।' কিন্তু নিজেকে সামলে রাখে সে। এই সমস্ত জিনিসের জন্যে নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেও এটা ও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অফিসটা তার রাজত্ব, কিন্তু বাড়িটা হবে ওর নিজের রুচিমাফিক। রাত-পোশাকটার দিকে তাকায় মানুষটা। অস্ফুটে বলে, 'গৃহস্বামী…থুড়ি, গৃহকর্ত্রী হিসেবে তুমি অপূর্ব!'

মহিলা তবু নিশ্চুপ হয়ে থাকে।

মানুষটা ফের বলে, 'লক্ষ্মীটি, আর একটা পেগ!'

উপেক্ষা করার অর্থহীনতা অনুভব করে মহিলা। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পানীয়টা নিয়ে ফিরে আসে ও। তৃতীয় বার চুমুক দিয়ে মানুষটা বলে:

'তুমি সত্যিই ভারি লক্ষ্মী!'

কি একটা মনে পড়তেই রাগে ঝলসে ওঠে মহিলা:

'ওই কথাগুলো আমার পছন্দ নয়।'

'কেন?'

'পার্টিতে কে একটা লোক তোমার সেক্রেটারীকে ঠিক ওই কথাগুলোই বলছিলো।'

'কিন্তু মেয়েটি তাতে কিছু মনে করেনি।'

'হতে পারে। তবে ও একটা সেক্রেটারী আর আমি একজনের স্ত্রী।'

'প্রভেদটা কি রকম বলে মনে হচ্ছে?'

'বিরক্তিকর।'

'স্ত্রী হওয়া বিরক্তিকর? না কি সেক্রেটারী?'

'আমার দিক থেকে বলতে গেলে, সেক্রেটারী।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

আরও একটা চুমুক দিয়ে মানুষটা বলে, 'একজন বিবাহিতা মহিলার পক্ষে পরিস্থিতিটা

অনেক বেশি সুবিধেজনক। সে যে কোনো সময়ে, যে কোনো কারণে, ইচ্ছে হলেই রাগ করতে পারে। কিন্তু সেক্রেটারী বেচারী…'

'এ ধরনের বিদ্রূপের অর্থ ?'

'আমি বিদ্রূপ করতে চাইনি।'

'তাহলে এটাকে আর কি বলবে ?'

'বাস্তব ঘটনা।'

'ওর জন্যে তোমার এতো সহানুভূতি কেন ?'

'ওর জন্যে নয়, ও একটা সেক্রেটারী হওয়ার জন্যে।'

'এই জন্যেই কি প্রতি মাসে ওর পদোন্নতি হয় ?'

'ওটা পদোন্নতি নয়, সোনা--ওটা ঘুষ, এক নতুন ধরনের ঘুষ।'

'কিসের জন্যে ?'

'কোনো এক বড়ো সাহেবের বিজ্ঞাপনের দিকটা আমরা দেখি। উনি আমাদের সঙ্গে কতকগুলো শর্ত করে নিয়েছিলেন। এটা তার মধ্যেই একটা।'

'মেয়েটা তাঁর কে ?'

'একটি রক্ষিতা।'

'ইস! কি জঘন্য!'

'হ্যাঁ, ভারি জঘন্য।'

'কিন্তু ওর ওপরে তোমার কেন সহানুভূতি থাকবে ?'

'কারণ, এক হিসেবে ও একজন সহকর্মী।'

'সহকর্মী বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছো ?'

'আমরা সবাই ওর সহকর্মী।'

'কি ভাবে ?'

'আমরা কেউই আমাদের কাজের সঙ্গে বিবাহিত নই। আমরা সবাই রক্ষিতাদের মতো।' মানুষটা বিকৃত মুখে বলতে থাকে, 'পার্টিতে এটা স্পষ্ট বোঝা গেছে যে আমার আসল উদ্দেশ্য, বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের নজরে পড়া। আমার পক্ষে পার্টিটা ছিলো বছরে পাঁচ লাখ টাকা ব্যবসা আদায়ের ব্যাপার।'

পানীয়ের শেষ চুমুকটা গলা দিয়ে নামিয়ে আয়নার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো মানুষটা। সেখানে সে কি দেখলো কে জানে, কিন্তু চোখদুটো বন্ধ করে ফেললো তৎক্ষণাৎ। ফের যখন চোখ খুললো, তখন তার দৃষ্টি শূন্য গ্লাসটার দিকে।

'আর একটা দাও'--

'না, যথেষ্ট হয়েছে।'

'আজ আমি ক্রীতদাসত্বের উৎসব পালন করছি।'

মহিলা ঘাম মোছার মতো মুখ থেকে সবটুকু উদ্বেগ মুছে ফেলে।

'শোনো লক্ষ্মীটি, আজকে রাতের পার্টিটা আমাকে আসছে বছরেরও নিশ্চিত ব্যবসা এনে দিয়েছে। তার মানে, আসছে বছরেও আমি পাঁচ লাখ টাকার ব্যবসা পাচ্ছি। সেই জন্যেই আমি নিজেকে নতুন স্যুটে সাজিয়েছিলাম—ঠিক যেন ওই সমস্ত মেয়েমানুষদের... মানে রক্ষিতাদের মতো, যারা নতুন নতুন শাড়ী পরে সর্বদা ওদের নাচায়। ওদের কিছু মনে করার অধিকার নেই। আমিও কিছু মনে করিনি।'

মহিলা মানুষটার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে কোটের বোতামগুলো খুলতে শুরু করে। অন্তরঙ্গ নৈকট্যে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ, হয়তো বা মানুষটার কাছ থেকে সাড়া পাবার প্রত্যাশায়। কিন্তু মানুষটার বাহু দুটি নিথর, নিস্পন্দ—ঠিক বাইরের রাত্রিটার মতো।

আচমকা একটা কুকুরের চিৎকার সবটুকু নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দেয়। মহিলার মনে হয়, ওর হৃৎপিণ্ডটা...

বাঁ দিক দিয়ে কুকুরের ডাকটা ভেসে আসে। তারপর ডানদিকের কুকুরটাও তাতে সাড়া দেয়।

'কি অপূর্ব দ্বৈত সংগীত!' মানুষটা শূন্য গ্লাসটার দিকে তাকায়। তারপর মহিলার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পানপাত্রটা ভরে আনার জন্যে উঠে যায়। গ্লাসটা কাণায় কাণায় ভরে নেয় সে, ওপরের দিকে ভাসতে থাকা বরফের টুকরোগুলো প্রায় উপছে ফেলে পানীয়টাকে। ঘরে ঢোকার পথে দোরগোড়াতেই একটা চুমুক খেয়ে নেয় সে।

'আমি এই দ্বৈত সংগীতের উৎসব পালন করছি', মন্তব্য করে মানুষটা। কুকুরগুলো চিৎকার করতে থাকে প্রত্যুত্তরে।

'কুকুরদের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে', ফের একটা চুমুক খেয়ে নেয় সে।

মহিলা বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকের দেয়ালে ফিরে ফিরে তাকায় ও। দুদিক থেকে ভেসে আসা কুকুরের চিৎকার যেন দুটো দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে বলে মনে হয় ওর।

'দ্বৈত সংগীত হয় রাত্রিবেলা, আর সকালে পুরো সম্মিলিত সংগীত।.. বাঁদিকে আমেরিকান পরিবারের বাড়িটা পুরোপুরি বাতানুকূল। কাজেই গোলমালে ওদের কিছু এসে-যায় বলে মনে হয় না। সকালবেলা রাঁধুনি, বেয়ারা আর জমাদার যখন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, একে অন্যকে গালিগালাজ করে, তখন মনে হয় একটা নয়—চারটে কুকুর যেন এক সুরে চেঁচাচ্ছে।''

'শোনো লক্ষ্মীটি, তুমি কেন ঘুমোবার চেষ্টা করছো না, বলো তো?'

'আমি কুকুরদের স্বাস্থ্য পান করছি।'

মহিলা হতাশ হয়ে বিছানার ধার ঘেঁষে বসে।

'তুমি আমার কথা শুনছো না। আমি বলছিলাম, প্রতিদিনই সকালে এই সম্মিলিত গান হয়—শুনেছো?...ডান দিকের প্রতিবেশী একজন ভারতীয়, তাঁর বাড়িটা বাতানুকূল

নয়। সেখানে প্রতিটা ঘর থেকেই গোলমাল শোনা যায়—বাড়ির গিন্নী হয় চাকর-বাকরদের সঙ্গে, নয়তো ভদ্রলোকের সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি করেন...বলতে গেলে কুকুরের মতোই চিৎকার করেন মহিলা। ওহ্, ভগবান! শুধু কুকুর আর কুকুর, সর্বত্রই কুকুর—আমাদের চারদিকে শুধু কুকুর। প্রতি দিনই অফিসে নিত্য নতুন অভিযোগ, অনুস্মারক, বড়ো সাহেবের কাছে চাহিদা। ওহ্ ঈশ্বর, এতো কুকুর আমি আর গুণে শেষ করতে পারি নে।'

'লক্ষীটি, শোনো—'

মহিলা উঠে গিয়ে মানুষটার হাত থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে, সেটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখে। তারপর মানুষটাকে টানতে থাকে বিছানার দিকে।

'কেন তুমি এভাবে তোমার রাতটা নষ্ট করছো?' অস্ফুটে প্রশ্ন করে ও।

'একটা রাত নয়, একটা জীবন।'

'জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে, তা তুমি বলছো কি করে?' মহিলা উঁচু গলায় প্রশ্ন করে। 'তুমি সবেমাত্র জীবন শুরু করেছো। প্রথমটাতে কিছুটা ঘুষ, কিছুটা স্তাবকতা—এসব থাকতে বাধ্য। কিন্তু একবার এটা চলতে শুরু করলে...'

'কখনও কি এটা নিজের পায়ে দাঁড়াবে? আমি কি কোনোদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো? না সোনা, তেমনটি কক্ষনো হয় না—এখানে কাউকে চলতে হলে ধার করা পা নিয়ে চলতে হয়। প্রথমজন দ্বিতীয়জনের কাছ থেকে, দ্বিতীয় তৃতীয়ের কাছ থেকে আর তৃতীয় চতুর্থের কাছ থেকে···অশক্ত, পঙ্গু···সবাই তাই। মেনে নিচ্ছি, আমার ব্যবসাটা নতুন। কিন্তু অন্যদের ব্যবসার ব্যাপারটা তুমি কি করে বোঝাবে, বলো?'

'শোনো—'

'আমার পা', লোকটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে গিয়ে আয়নাটার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর চিৎকার করে বলে, 'তাকিয়ে দ্যাখো, আমার পায়ের দিকে। জুতো জোড়া খুললে আমি কার পা দেখতে পাবো? ওই বড়ো সাহেবের পা। আয়নাটা আজ সত্যিই ডোরিয়ান গ্রের ছবি হয়ে উঠেছে।'

মানুষটার দৃষ্টি নিজের পা থেকে আয়নার পা দুটোর দিকে ফিরে ফিরে যায়। 'এ বছরে ওরা কারখানা-মালিকের পা, গত বছর নিশ্চয়ই কোনো ব্যাঙ্ক মালিকের পা ছিলো। গত বছর আমি আয়নার দিকে তাকাইনি, তার আগের বছরেও না।···' বিভ্রান্ত চোখে মহিলার দিকে তাকায় মানুষটা, 'কতো বছর হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে?'

'ঠিক পাঁচ বছর', কোমল কণ্ঠে জবাব দেয় মহিলা।

'আর এই পাঁচ বছরে আমার মুখটা বদলে গেছে। আর পাঁচ বছর, তারপর আরও পাঁচ বছর···আমার মুখ···'

'আমার কাছে তুমি একই রকম রয়ে গেছো,' মহিলা প্রায় বলতে গিয়েও বললো না। এ কথা ও আগেও বলেছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

'তুমি এমন চুপ করে রয়েছো কেন?' আচমকা প্রশ্ন করে মানুষটা!

মহিলা তবু নিশ্চুপ হয়েই থাকে।

'তুমি কুকুরের মতো চেঁচাচ্ছো না কেন ?' মানুষটা প্রশ্ন করে।

মহিলাটি কি করবে ভেবে পায় না। ও কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলে না। চরম দুরবস্থায় একটা কুকুরের মতো ও নিজের হাতদুটোকে বুকের কাছে তুলে ধরে। হৃৎপিণ্ডটা চলতে থাকে দ্রুত লয়ে।

'এখন তুমি নিশ্চুপ, তখনও চুপ করেই ছিলে।'

'তখন ? মানে, কখন ?'

'তাহলে তোমার ধারণা আমি কিছু লক্ষ্য করিনি—তাই না ?' মৃদু হেসে মানুষটা বলতে থাকে, 'ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আমার বড়োকর্ত্তা যখন তোমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিলেন, তখন তোমার হাত উনি একটু শক্ত করেই চেপে ধরেছিলেন। তাই নয় কি ? আর তোমার দিকে উনি তাকিয়েছিলেন···একটা শিকারী কুকুরের মতো···'

মানুষটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মহিলা জবাব দেয়, 'আমি ভেবেছিলাম আমি কিছু বললে, হয়তো·· তোমার ব্যবসা···'

ঘামের মতো চোখের জল মুছে ফেলে ও।

'আমিও চুপ করেই ছিলাম'। গ্লাসটা তুলে নিয়ে অবশিষ্ট পাণীয়টুকু গিলে ফেলে মানুষটা, 'কুকুরদের উদ্দেশ্যে পান—পাগলা কুকুর, শিকারী কুকুর, চিৎকৃত কুকুর, আর···' বিষণ্ণ চোখে মহিলার দিকে তাকিয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকায় ও, 'আর নিশ্চুপ কুকুরদের উদ্দেশ্যে···'

'ওই লোকটাকে দ্যাখো···হাঁটছে না তো, যেন দুলছে···' কনট্রাক্টর জৈল সিং একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফোরম্যান তারা সিং-এর দিকে তাকালো। তারপর খানিকটা দূরে মজুরদের দিকে তাকিয়ে গলা চড়িয়ে বললো, 'অ্যাই ! কড়াগুলোকে নিয়ে একটু জলদি করে হাত চালা, বুঝেছিস ? তাতে কড়াগুলোর গায়ে ব্যথা লাগবে না রে, হতচ্ছাড়া···' মজুরদের উদ্দেশ্যে কথা বলতে গিয়ে জৈল সিং-এর কণ্ঠস্বর আরও চড়ে ওঠে, 'এদিকে দিনে আড়াই টাকা করে রোজ চাওয়া হচ্ছে, তাই না ? আড়াই টাকা রোজ, অথচ ঘড়িতে পাঁচটা বাজা অব্দি আর তর সয় না !···সব জানা আছে আমার !' জ্বলন্ত চোখে মজুরদের দিকে তাকিয়ে অন্য দিবে পা চালালো সে।

'আরে, ওই মেয়েছেলে দুটো কি মরে গেলো নাকি ? আমি ওদের কয়েকটা ইট নিয়ে আসতে বলেছিলুম যে !' ফোরম্যান তারা সিং পাঁচিলের ওপর থেকে ঝুঁকে দেখলো. কামিন দুটো মাথায় কড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কড়া থেকে সবেমাত্র রাবিশগুলো ফেলেছে ওরা, এখন দাঁড়িয়ে আছে রাবিশের স্তূপটার কাছে। 'এই যে খুকিরা, এদিকে আয় বলছি !' ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ে তারা সিং।

কামিন দুটো হাতে কড়া নিয়ে নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলের ওপরে উঠে আসে। স্পষ্টতই ওরা রীতিমতো বিক্ষুব্ধ। ফোরম্যানের দিকে তাকিয়েই রাগে ফেটে পড়ে ওরা, 'আমাদের খুকি বলার মানে ? ইস্, আমাদের বলে কি না খুকি !···তাকিয়ে দ্যাখ, ওর মুখটার দিকে···'

'কেন, আমার মুখটা আবার কি দোষ করেছে ?' তারা সিং ভ্রূ কোঁচকায়, 'তোদের মুখের চাইতে আমার মুখ অনেক সুন্দর ! ইচ্ছে হলে একটা আর্শি নিয়ে এসে দ্যাখ না···'

'মরে যাই, সুন্দর মুখের লোকটাকে একটু দ্যাখ লা···' ওরা দুজনে ফুঁসে ওঠে। 'তা তুমি আমাদের খুকি বললে কেন, শুনি ?'

'খুকি কি খারাপ কথা না কি ? খুকি তো খারাপ কথা নয়···'

'খুকিরা এইটুকু হয় !' ওরা নিজেদের হাঁটু অব্দি হাত রেখে দেখায়। 'আর তুমি কিনা আমাদের বললে খুকি ?'

তারা সিং ভেবেছিলো ওরা 'খুকি' শব্দটার অর্থ জানে না, তাই ভেবেছে সে ওদের গালাগাল দিয়েছে। কিন্তু যখন বুঝতে পারলো অর্থটা ওদের জানা এবং ওরা রীতিমতো মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সে খুকি বলায় ওরা চটে গেছে—তখন সে হাসতে শুরু করলো।

'শুনে নাও, আমি হচ্ছি ফুলমোতি আর এ হচ্ছে সোনমতি···' ওদের মধ্যে একজন নিজেদের পরিচয় দেয়।

'শুধু ফুলমোতি ? আমি তোকে ফুলরাণী বলে ডাকবো,' ফোরম্যান সাহসী হয়ে ওঠে।

'যা এবারে গিয়ে কয়েকখানা ইট নিয়ে আয় তো…'

'এখন আমি ইট আনবো কেন, শুনি ?' ফুলমোতি মুখে মুখে জবাব দেয়, 'তুমি আমাদের রাবিশ সরাতে বলেছিলে, বলো নি ? সেই সকাল থেকে আমরা রাবিশ সরাচ্ছি, এখন আর ইট বইতে পারবো না। কেন বইবো ? তাহলে সকালেই আমাদের ইট বইবার কাজে লাগাও নি কেন, শুনি ?'

'সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছে,' ফোরম্যান ফের তর্ক জুড়ে দেয়। 'আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখনই তোদের ইট বইতে হবে। আবার আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন তোদের দিয়ে রাবিশ সাফ করাবো। বুঝেছিস ?'

'হা হা ! ইচ্ছে-বাবুকে দ্যাখ একবার !'

'আমার ইচ্ছেটা কি, তা তোরা শীগগির টের পাবি। আমি কনট্রাক্টর সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করবো…'

'গপ্পো শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, ফোরম্যান সাহেব…আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি…'

'তোরা কাজ না করলে নালিশ আমাকে করতেই হবে…'

'আমরা কাজ করতে ভয় পাই নে। কিন্তু তোমার কথাবার্তা বলার ধরণ…'

'কেন, আমি আবার কি বললুম ?'

'তুমি যদি আমাদের কাজে খুশি হতে চাও, তাহলে বিহান বেলাই আমাদের কাজ ঠিক করে দেবে। আজ সকালে তুমি কালুয়াকে ইট বইতে বলেছিলে…তাহলে এখন ওকেই ইট আনতে বলো…

'কালুয়া পাথর ভাঙতে গেছে…'

'যার সিমেণ্ট করার কথা, সে-ই তো পাথর ভাঙবে…'

ইতিমধ্যে কনট্রাক্টর সিমেন্টের বস্তা নিয়ে ফিরে এসেছিলো। তারা সিং-এর দিকে চোখ পড়তেই সে খেপে উঠলো, 'এই মেয়েছেলেগুলোর সঙ্গে তুমি সময় নষ্ট করছো কেন, শুনি ? বকবক করছিলে, তাই না ? আমি সব জানি…'

'এখানে বেশি ইট নেই যে,' তারা সিং কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করে। 'কালুয়ার হাত ফাঁকা না হওয়া অব্দি আমি এদের দুজনকে কয়েকখানা করে ইট নিয়ে আসতে বলছিলুম…ভাবছিলুম, তাহলে আমি কাজটা চালিয়ে যেতে পারবো…'

'শুনুন, কনট্রাক্টর সাহেব !' ফুলমোতি অভিযোগ জানাতে একটুও দেরি করে না, 'আপনার ফোরম্যান আমাদের খুকি বলেছে।'

'বিষে-ভরা এই আড্ডাবাজগুলোকে তুমি কোত্থেকে ধরে এনেছো হে, তারা সিং ? এর চাইতে কতকগুলো গাই-গরুকে নিয়ে এলে না কেন ? তারা এদের দুগুণ কাজ করে, কিন্তু একটাও কথা বলে না…'

কনট্রাক্টর জৈল সিং কঠিন দৃষ্টিতে কামিনদের দিকে তাকিয়ে এমন কিছু দেখতে

পেলো, যা গত সাত-আট দিন তার নজর এড়িয়ে গেছে। ফুলমোতির ছ মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। সম্ভবত এই বাক-যুদ্ধটা ও শুরু করেছিলো একটু বিশ্রাম নিতে পারবে বলে। জৈল সিং-এর চোখ দুটো আরও কঠিন হয়ে ওঠে। 'আমি সব জানি,' গর্জন করে ওঠে সে।

'আপনি কি 'সব' জানেন, কনট্রাক্টর সাহেব ?' রীতিমতো আক্রমণাত্মক সুরে প্রশ্ন করে ফুলমোতি।

'যা যা, কাজ করগে যা…কাজের নামে অষ্টরম্ভা, খালি বকবকানি…ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু বকবক আর বকবক…' কনট্রাক্টর ফের ফুলমোতির পেটের দিকে তাকায়।

'কি দেখছেন, কনট্রাক্টর সাহেব ?' মাথার ওপর ওড়নাটা টেনে দিয়ে ফুলমোতি খিলখিলিয়ে হাসতে শুরু করে।

'তোর মরদটা কোথায় ? সে কি কিছু রোজগারপাতি করে, না কি ?' ক্রোধের সঙ্গে করুণা মিশিয়ে প্রশ্ন করে জৈল সিং।

'আমার মরদ ?' ফুলমোতি হাসে, 'সে মরে গেছে। কাজ না করলে আমি খাবো কি ?'

'এখন তোর কাজ করা ঠিক নয়। এখন তুই রাবিশও সাফ করতে পারবি না, ইটও বইতে পারবি না…'

'আমি তা জানি কনট্রাক্টর সাহেব। কিন্তু কি করবো, বলুন ? আগে ক্ষেতিতে কাজ করতুম। কিন্তু ফুলকপির দিন শেষ হয়ে গেছে। এমন শুধু তামাকের ক্ষেতে কাজ করা যায়। কিন্তু তামাকের গন্ধে আমার মাথা ঘোরে…' ফুলমোতি একটু চুপ করে। কনট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলতে বলতেও ও কড়ায় রাবিশ ভরে নিচ্ছিলো। সোনমোতি যাতে কড়াটা ওর মাথায় তুলে দিতে পারে, সেজন্যে এবারে একটু নিচু হলো ও। তারপর ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি তুলে তারা সিং-এর মুখোমুখি হয়ে বললো, 'রাগ কোরো না, ফোরম্যান সাহেব ! রাবিশ সরানো হয়ে গেলেই আমি তোমাকে ইট এনে দেবো।'

'এই তো চাই… !' তারা সিং নরম হয়ে ওঠে। 'তা তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমন কাকের মতো কা-কা করিস কেন ?'

'আমি কা-কা করি ?'

'করিস বই কি ! ফের কথা বললে আমি তোর নাম রাখবো শ্রীমতী কলকলানি।'

'তোমার বউ আছে, ফোরম্যান সাহেব ?' মাথায় বোঝা নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে-নামতে জিগেস করে ফুলমোতি।

'হ্যাঁ, আছে বই কি,' দরজায় পেরেক মারতে ব্যস্ত ফোরম্যান জবাব দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই ফুলমোতি বলে, 'তা হলে তার নামটাই কলকলানি রাখলে পারো ?'

'তুমি বাপু এই মেয়েছেলেটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলে কেন ?' ভৎর্সনার সুরে ফোরম্যানকে বললো কনট্রাক্টর।

'জড়িয়ে পড়ছি ? আমি ?' তারা সিং হাসতে শুরু করে। 'গোলমালের মধ্যে সময় কাটাবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই !'

'আমি সব জানি,' কনট্রাক্টর জৈল সিং বললো। 'এবারে যাও দেখিনি, নিজের কাজ করোগে যাও। আমার আবার আজকে অনেক কাজ…' বলতে বলতে জৈল সিং-এর কি একটা কথা যেন মনে পড়ে যায়। তারা সিং-এর স্ত্রী অসুস্থ। কয়েক মাস ধরেই অসুস্থ। 'তা তোমার স্ত্রী কেমন আছে ? সে তো অসুস্থ ছিলো, তাই না ? এখন ভালো আছে তো ?'

'না, ও ভালো নেই সর্দারজী।' তারা সিং বললো, 'সারাটা দিন ও বিছানাতেই শুয়ে থাকে। ঈশ্বর জানেন, ওর কি হয়েছে !'

'ও কিছুদিন বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকেতে চায় না তো ? অনেক মেয়েমানুষেরই কিন্তু এই অদ্ভুত রোগ আছে…মেয়েমানুষের সব কিছুই আমার জানা…'

'গেলেই পারে। আমি কি ওকে বেঁধে রেখেছি নাকি ?'

'তাহলে মাঝে-মধ্যে ওকে তোমার ঠ্যাঙানো উচিত। ব্যস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'না না, সর্দারজী। আমার পক্ষে ওকে ঠ্যাঙানো সম্ভব নয়…'

'ওটা আমি একটা কথার কথা বললুম। মেয়েমানুষকে ওভাবে পেটানো উচিত নয়। ওরা যখন বাঁধা পড়ে, তখনই ওদের পেটাতে হয়।'

'বাঁধা পড়লে পেটাতে হয় ?' তারা সিং বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

'বোঝার চেষ্টা করো, তুমি…'

'আমি বুঝিনি…'

ঘন গোঁফের আড়ালে কনট্রাক্টরের হাসিটা হারিয়ে যায়।

'বাড়িতে দু-একটা বাচ্চা থাকলে, মেয়েমানুষকে পেটালেও বাড়ি থেকে যাবে না · সব আমার জানা আছে…'

'কিন্তু আপনার তো বাচ্চা আছে, কনট্রাক্টর সাহেব ! আপনি কখনও এই দাবাইটা চেষ্টা করে দেখেছেন না কি ?' গোঁফের আড়াল থেকে তারা সিং-এর হাসিটা চুঁইয়ে বেরোয়।

কনট্রাক্টর জৈল সিং কোনো জবাব দেবার আগেই রাবিশ ফেলার কড়াটা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ফুলমোতি দৃশ্যে এসে হাজির হয়। ইতিমধ্যে ইটের ট্রাকটা এসে পৌঁছে গিয়েছিলো। কনট্রাক্টর কাগজ-পত্র সই করার জন্য নিচে নেমে গেলো।

'এই যে, শ্রীমতি কলকলানি ! এখনও ইট আনলি না ?' গোমড়া-মুখে জিগেস করলো তারা সিং।

'সে তোমার কলকলানিকে গিয়ে জিগেস করো ! আমার নাম ফুলমোতি !'

'যাক, তোর কলকলানি আর আমাকে শুনতে হবে না। ওই যে, কালুয়া এসে গেছে।

হেই, কালুয়া ! কয়েকখানা ইট নিয়ে আয় তো ! দেখিস, ইটগুলো যেন একটু ভেজে ভিজে থাকে ! হাড়ের মতো শুকনো খটখটে ইট নিয়ে আসিসনি যেন !'

'তোর কলকলানি আর আমাকে শুনতে হবে না !' ফুলমোতি ফোরম্যানের কথাগুলো অনুকরণ করে বলে। 'কে তোমার কাছে কলকল করতে চায়, শুনি ?'

'রাবিশগুলো তো সাফ হয়ে গেছে, তাই না ? তা, কাল তুই কি করবি ? কাল তোকে আসতে হবে না, বুঝেছিস ?'

'বা রে ! বলে কিনা, কাল আসিস নে···ঠিক আছে, এবার থেকে আমরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ মতো ফোরম্যান বেছে নেবো। আমি অন্য ফোরম্যানের কাছে যাবো, তার জন্যে ইট বইবো।'

'যা না ! জাহান্নামে যা !'

'জাহান্নামটা কি, ফোরম্যান সাহেব ?'

'এখান থেকে যা বলছি ! নয়তো আমি তোকে সোজা জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেবো।'

'শোনো কথা, এই লোকটা নাকি আমাকে জাহান্নামের পথ দেখাবে ! বেশ, এই আমি বসলুম এখানে !'

'দাঁড়া, কনট্রাক্টর আসুক ! সে তোকে মজাটা টের পাইয়ে দেবে।'

'কনট্রাক্টর আমাকে কি করবে, শুনি ? মারবে ? আমি খাটি, খেটে নিজের রুটি জোটাই। আমি তো কনট্রাক্টরের দয়ায় বেঁচে নেই ! যার দয়ায় ছিলুম, তাকে আমি ছেড়ে এসেছি···'

'তুই না বললি তোর স্বামী মরে গেছে ?'

'আমি যখন তাকে ছেড়েই এসেছি, তখন সে বেঁচে থাকুক বা মরে যাক—তাতে আমার কি এসে-যায় ?'

'স্বামীর কাছে থাকলি না কেন ?'

'ও ভীষণ মদ খেতো। মদ খেয়ে এসে আমাকে মারতো। একদিন ভীষণ পেটালো ।'

'তুই নিশ্চয়ই তেমন কিছু করেছিলি ?'

'ও আমার সমস্ত গয়নাগাটি বিক্কিরি করে দিয়েছিলো। আমি বারণ করেছিলুম, তাই পেটালো...'

ফুলমোতি রাবিশ ভর্তি কড়া নিয়ে উঠতে যেতেই কনট্রাক্টর এসে হাজির হলো। বললো, 'তুমি সাতাই আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করছো, তারা সিং। এটা ন ইঞ্চি পেরেক হবার কথা ছিলো !'

'ন ইঞ্চিই তো আছে, সর্দারজী !'

'যাক গে, সে কথা। আমি তোমাকে বলে গিয়েছিলুম, আজ অনেক কাজ...একটু জলদি করে হাত চালাও !'

'আপনি পাথরের গুঁড়ো আনিয়ে দিন। আমাকে আর শুধু দুটো পরত শেষ করতে হবে। আপনি বরঞ্চ অন্য ফোরম্যানকে পাঠিয়ে দিন।'

'নিচের পরতটাকে খুব বেশি পুরু করতে হবে না। এক পরত লাগিয়ে, তার ওপরে আর এক পরত পাথরের গুঁড়ো চাপিয়ে দাও···তা হলেই চলবে।'

'আচ্ছা।'

'তুমি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছো তো ? সবাই পয়লা নম্বরের কাজ চায়—আর টাকা মেটাবার সময় এলে উলটো-সিধে বকতে শুরু করে। সব আমি জানি...'

'কর্ণেল কি পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়েছে ?' জিগেস করলো তারা সিং।

'ঘণ্টা দিয়েছে ! ওখানে এমন একটা ব্যাপার হয়েছে, যেটা একেবারে আশাই করা যায়নি...'

'কি হয়েছে ?'

'ওর বাড়ির কাছে আর একটা বাড়ি হচ্ছিলো, মনে আছে ?'

'হ্যাঁ—'

'সেখানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়েছে।'

'মারপিট ?'

'মারপিট ? না না, তা হলে তো ভালোই হতো ! সেখানে অনেক ব্যাপার চলছিলো।'

'তারপর ?'

'তখন কর্ণেলের সন্দেহ হলো। বাড়িটা উনি নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।'

'আগে তো বাড়িটা ভদ্রলোকের স্ত্রীর নামে ছিলো, তাই না ?'

'জমিটা ভদ্রমহিলার।'

'তারপর ?'

'মহিলা ব্যাপারটা জানতে পেরে স্বামীর নামে মামলা ঠুকে দিলেন। ওই অ্যাংকেল . বুঝলে, ওই অ্যাংকেলই মহিলাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে।'

'অ্যাংকেল আবার কি, কনট্রাক্টর সাহেব ?'

'আহা, তুমি কিছু বুঝতে চেষ্টা করছো না কেন ? মহিলার অ্যাংকেল নয় ··বাচ্চাগুলো ভদ্রলোককে ওই নামে ডাকতো···'

'ও, তার মানে আংকেল···মামু ?'

'হ্যাঁ, ওই আংকেলই হলো ! আমি তো আর লেখাপড়া শিখিনি, কোনটাকে কি বলে অতোশতো জানি নে। যাই হোক, আমি জানতুম ওই অ্যাংকেলটি একটা কিছু করবে···'

'তারপর কি হলো ?'

'মহিলা কাছারিতে গেলেন···আর মামলা মিটতে যে কতো সময় লাগে, সে তো তুমি জানোই।'

'কিন্তু তারপর কি হলো, কনট্রাক্টর সাহেব ?'

'ভগবান জানেন, তাদের কি হলো। কিন্তু আমি স্রেফ ডুবে গেলাম। এখন না ওই

মাহলো, না ওহ কর্ণেল—কেডহ আমার পাওনা মেটাচ্ছেন না।

'আপনি বরং ওই অ্যাংকেলকেই আপনার পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে বলুন,' তারা সিং চিন্তিত সুরে বললো।

'ও সব অ্যাংকেলদের আমি জানি···অ্যাংকেলরা কক্ষনো পাওনা টাকা মেটায় না। কর্ণেলের উচিত ছিলো মেয়েছেলেটাকে নিজের তাঁবে রাখা।'

ফোরম্যানের হাতের কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কনট্রাক্টর পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে, মজুরদের কড়া ভর্তি করে পাথরের গুঁড়ো নিয়ে আসার হুকুম দিলো।

'পাঁচটা তো বেজে গেছে, কনট্রাক্টর সাহেব! এখন আপনি কাজ চালাবেন কি করে?'

'তোর কি হাতঘড়ি আছে নাকি?' সবেমাত্র ওপরে উঠে আসা ফুলমোতিকে খিঁচিয়ে উঠলো কনট্রাক্টর জৈল সিং।

'আমি হাতঘড়ি ছাড়াই সময় বলে দিতে পারি, কনট্রাক্টর সাহেব! আপনি দেখুন না, কটা বাজে?'

'তুই রোজ সকালে দেরি করে আসিস। আজ আমি ছটা অব্দি তোকে আটকে রাখবো··· সব জানা আছে আমার!'

ছটা নাগাদ দেয়াল-আলমারির তাকগুলো বানানো শেষ হলো। কনট্রাক্টর জৈল সিং কুলি কামিন আর ফোরম্যানদের জানিয়ে দিলো, পর দিন সকাল আটটার আগে সবাইকে অবশ্যই কাজে হাজির হতে হবে। কালকের মধ্যেই দেয়ালগুলোকে ছাদ অব্দি গেঁথে ফেলতে হবে।

পরদিন সকালে আটটা, নটা তারপর দশটা বেজে গেলো। কাজ এগিয়ে চলে, কিন্তু জৈল সিং-এর কোনো চিহ্ন নেই। সব কুলি-কামিন আর ফোরম্যানরা অবাক। কি হতে পারে মানুষটার?

আগের দিন ফুলমোতি বলেছিলো, ও তারা সিং-এর সঙ্গে কাজ করবে না—অন্য ফোরম্যান বেছে নেবে। কিন্তু ফের ও তারা সিংকেই বেছে নিয়েছে। ইটগুলো মাথা থেকে নামিয়ে রেখে ও বললো, 'আজ আমার কেমন যেন ভয় লাগছে, ফোরম্যান সাহেব!'

'কিসের ভয়, ফুলমোতি?'

'ভাবছি কনট্রাক্টর সাহেবের কি হলো।'

'নিশ্চয়ই কোনো কাজে গেছেন, এসে পড়বেন···'

'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই খারাপ কিছু হয়েছে।'

এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে কাজ এগিয়ে চলে। কোথাও তেমন কোনো চেঁচামেচি নেই। ফুলমোতিরও আজ ঝগড়া করার মতো মেজাজ নেই।

সবাই আশা করেছিলো দুপুরে খাওয়ার সময় কনট্রাক্টর এসে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পরে তারা সিং-ও ভাবতে লাগলো, কনট্রাক্টরের কি এমন হতে পারে। কাজের জায়গায় আসতে মানুষটার কোনোদিনও এতো দেরি হয়নি।

[illegible] হতো। এখন কনট্রাক্টরের এখানে থাকা দরকার। তারা সিং বললো, সে সন্ধ্যার সময় গিয়ে জেনে আসবে ব্যাপারটা কি হয়েছে।

পরদিন সবাই কাজের জায়গায় পৌঁছে গেলো, কিন্তু জৈল সিং-এর দেখা নেই। সবাই তখন তারা সিং-এর কাছে গিয়ে হাজির হলো।

'কনট্রাক্টর সাহেব একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন,' তারা সিং সবাইকে বললো। 'তবে খুব সম্ভব আজ উনি আসবেন।'

স্পষ্টই বোঝা গেলো তারা সিং সত্যি কথা বলছে না।

ফুলমোতি আরও কিছুক্ষণ তারা সিং-এর হাতে ইট জুগিয়ে চললো। অবশেষে জিগেস করলো, 'ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কি হয়েছে বলো তো, ফোরম্যান সাহেব?'

'ব্যাপার? ওহ্, না না কিছুই হয়নি…' তারা সিং হাত নেড়ে বললো।

দুপুরে খাওয়ার সময় ফুলমোতি ফের তারা সিং-এর কাছে গিয়ে হাজির হলো, 'তুমি আমাকে বলবে না, ফোরম্যান সাহেব? ব্যাপারটা কি হয়েছে?'

'বললাম যে, কনট্রাক্টর অসুস্থ।'

'তুমি ঝুট বলছো, ফোরম্যান সাহেব।'

'আমি যদি ঝুট বলে থাকি, তাহলে তুই নিজে কনট্রাক্টরের বাড়িতে গিয়ে জেনে এলেই পারিস?'

'জেনেই বা আমার কি লাভ হবে…শুধু একজনের দুঃখে অন্যেরও দুঃখ হয়—এই যা।'

'একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে গেছে, ফুলমোতি।' ফোরম্যান ফুলমোতির দিকে তাকালো, 'কাউকে বলিসনে যেন…'

ফুলমোতি মাথা নাড়লো।

'কনট্রাক্টরের বউ…' কথাটা বলে ফোরম্যান চুপ করে রইলো।

'পালিয়ে গেছে?'

'কোথায় গেছে, জানি নে। হয়তো কনট্রাক্টর সাহেবের ওপর রাগ করে বাপের বাড়িতে চলে গেছে।'

'বাচ্চা-কাচ্চা নেই?'

'আছে, একটা।'

'বাচ্চাটাকে কি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে?'

'না রেখে গেছে।'

'তাহলে বাপের বাড়িতে যেতেই পারে না।'

তারা সিং আগে ভেবেছিলো, কনট্রাক্টরের স্ত্রী হয়তো বাপ-মায়ের কাছেই চলে গেছে। কিন্তু এখন ফুলমোতির কথাটা তার কাছে ঠিক বলেই মনে হলো। বাপের বাড়িতে গেলে বাচ্চাটাকে সে নিশ্চয়ই সঙ্গে করে নিয়ে যেতো।'

'ওদের মধ্যে কি মারপিট হয়েছিলো নাকি?'

'নিশ্চয়ই তাই। হয়তো কনট্রাক্টরও বউকে পিটিয়েছেন।'

'কনট্রাক্টর সাহেব কি মদ খান ?'

'না। তবে তাঁর ধারণা, মেয়েমানুষদের মাঝে-মধ্যে পেটানো উচিত।'

'কোনো দোষ না করলেও ?'

'তাঁর ধারণা, ওই ভাবেই মেয়েমানুষদের তাঁবে রাখা যায়। একদিন উনি আমাকে বলেছিলেন, মেয়েমানুষদের পেটাতে হলে আগে তাদের বেঁধে নেওয়া দরকার।'

'বেঁধে নেওয়া ?'

'ওঁর কথা হচ্ছে, বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে মেয়েমানুষ নিজেকে বাঁধা বলে মনে করে। তখন তাকে পিটলেও সে বাড়ি থেকে পালায় না।'

'আমি একটা কথা বলবো, ফোরম্যান সাহেব ?' ফুলমোতি জিগেস করে।

'বলতে থাক…'

'কনট্রাক্টর সাহেব সব সময়েই বলেন, উনি সব কিছু জানেন—তাই না ? আসলে উনি কিছুই জানেন না।'

তারা সিং চোখ তুলে দেখলো, কনট্রাক্টর তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে সে জিগেস করলো, 'কিছু জানতে পারলেন ?'

কনট্রাক্টর কোনো জবাব দিলো না।

'উনি বাপের বাড়িতে যাননি, এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত।' তারা সিং বললো, 'আপনি তো খবরটা জানার জন্যে সেখানে লোক পাঠিয়েছেন, তাই না ? শীগগিরই জানতে পারবেন।'

'সে লোক ফিরে এসেছে। ও সেখানে নেই। আমি ওদের কুয়োগুলোর জল সেঁচতে বলে এসেছি, যাতে…'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে উনি…'

'ও প্রায়ই কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে ভয় দেখাতো…' কনট্রাক্টরের কণ্ঠস্বর রীতিমতো ক্লান্ত বলে মনে হয়, 'কি করে জানবো যে…'

এই প্রথম জৈল সিং বললো না, 'আমি সব জানি।'

আমার ধড়টা আস্ত রয়েছে, কিন্তু পাগুলো ই'দুরে খ'্টে খ'্টে খেয়ে ফেলেছে। আমি তাই যেখানে পড়ে রয়েছি, সেখান থেকে আর নড়তে পারি নে।

আমার ডানদিকে কতকগুলো ফুটি-তরমুজের খোসা আর বাঁদিকে এক টুকরো বাসি রুটি। কে একজন খেয়ে দেয়ে, খাবারের অবশিষ্ট অংশটুকু আমার সর্বাঙ্গে ছ'্ড়ে দিয়েছে।

একটু আগেই একটা ক্ষুধার্ত গরু এখান দিয়ে চলে গেছে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে নিজের লম্বা জিভটা বুলিয়ে, গরুটা আমাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ফুটি-তরমুজের খোসাগুলোকে তার পছন্দ হয়েছিলো, তাই একবারে অনেকগুলো খোসা খেয়ে নিয়েছে।

তারপর এলো একটা নিঃসঙ্গ কুকুর। লেজ নাড়তে নাড়তে সে আমার সর্বাঙ্গ শ'্কতে শুরু করলো। তারপর সেও আমাকে অপদার্থ বিবেচনা করে রুটির টুকরোটাকে চিবোতে চিবোতে চলে গেছে।

এরপর কার্ণিশে বসে থাকা একটা কাক আমার ওপরে এসে নামলো। ভাবখানা যেন, প্রেমিকের প্রতীক্ষায় থাকা কোনো তরুণী মজা করার জন্যে এক টুকরো মিঠাই ফেলে রেখেছে। কিন্তু শীগগির তার মোহ ভাঙলো, আমার চতুর্দিকে ছড়ানো খাবার-দাবারের অবশিষ্টাংশ থেকে কাকটা তখন খাদ্যকণা খ'্জতে শুরু করে দিলো।

তাই আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই পড়ে রয়েছি।

মৃত্যুর সময় মানুষ হয় ভিক্ষে বিলোয় আর নয়তো একখানা ইষ্টিপত্র রেখে যায়। কিন্তু আমি কি করবো? আমি ভিখিরিদের ভিক্ষে বিলোবার মতো যথেষ্ট ধনী নই, আর জীবনে আমি কোনো পাপও করিনি যে তার প্রতিবিধান করার জন্যে আমাকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমার এমন কোনো বংশধর নেই, যার জন্যে আমি ইষ্টিপত্র রেখে যাবো। অসৎ পথে আমি কোনো অর্থও সংগ্রহ করিনি যা রক্ষা করার জন্যে আমাকে কোনো আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করতে হবে।

কিন্তু কেউ কেউ মৃত্যুর সময় নিজেদের জীবন-কাহিনী লেখেন। সেটা আমি অবশ্যই করতে পারি। যদিও আমি ভালোভাবেই জানি যে আমি কোনো বিখ্যাত মানুষ, কোনো নেতা বা কোনো সম্মানিত পদের অধিকারী নই—আমি সাধারণ একটা নকশামাত্র, একটা সাধারণ বাড়ির নকশা—তবু এটুকু আশ্বাস আমি দিতে পারি যে আমি গান্ধীর মতো একজন আদর্শবাদী, গর্কির মতো বাস্তববাদী আর রুশোর মতো একজন সহজ-বক্তা।

তাই এখন ভাবছি চিরদিনের মতো এ পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে আমার উচিত নিজের জীবন-কাহিনীটা লিখে ফেলা।

ভাগ্যক্রমে আমার মালিক আমার সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট্ট খাতাখানাও ছ'্ড়ে ফেলে

দিয়েছিলো। খাতাটাতে সে প্রেমের কবিতা লিখতো, তাতে এখনও কয়েকটা পৃষ্ঠা খালি পড়ে আছে। আর ফেলে দিয়েছিলো ওর কলমটাকেও, যেটাতে এখনও কালি রয়েছে। কাজেই ওই ছোট্ট খাতাটার খালি পৃষ্ঠাগুলোতে এই কলমটা দিয়েই আমি আমার জীবন-কাহিনী লিখছি।

কোনো এক সময় এক দারুণ সুদর্শন তরুণের সঙ্গে পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দরী মেয়েটির দেখা হয়েছিলো। মেয়েটিকে দেখে ছেলেটি পেন্সিল দিয়ে মনে মনে কতকগুলো রেখা এঁকে ফেললো। সেই রেখাগুলোই আমি। রেখাগুলো ছোট্ট একটা বাড়ির নকশা। প্রতি রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে ছেলেটি রেখাগুলোকে নতুন করে সাজাতো। কিন্তু তারপর একদিন হঠাৎ ওকে সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে উর্দি পরে এমন এক জায়গায় চলে যেতে হলো, যেখানে সর্বদা শুধু বন্দুকের কানে-তালা-ধরানো আওয়াজের প্রতিধ্বনি।

মানুষের চিৎকার তখন আমার কানের মধ্যে গিয়ে বিঁধতো। কিন্তু আমার মালিকের মনের এক কোণে আমি একটু জায়গা খুঁজে পেয়েছিলাম, সেখানেই নিঃশব্দে পড়ে থাকতাম আমি।

তারপর একটা দিন এলো, যেদিন একটা বুলেট এসে আমার মালিকের চওড়া বুকখানাতে বিঁধলো। যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে তিনি আমাকে বললেন, 'যতো শীগগির সম্ভব তুমি এখান থেকে চলে যাও। নয়তো এখানকার মরণ-ধোঁয়ায় তোমার দম আটকে যাবে। তুমি এমন কোথাও যাও, যেখানে কোনো কৃষক নিজ হাতে বীজ বুনে নিজের জীবনের স্বপ্নকে গড়ে তুলছে। কিংবা এমন কোথাও যাও, যেখানে কোনো পরিশ্রমী মজুর মাথায় ঝুড়ি নিয়ে জীবনের স্বপ্নকে সৃষ্টি করে চলেছে।'

মালিকের শেষ ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করার জন্যে আমি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে এলাম—গেলাম এক কৃষকের কাছে, সে ছোট্ট এক গ্রামে কাজ করে। কিন্তু সে আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না বা আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য একটু হাসলোও না। এক জোড়া পুরনো ছেঁড়া জুতোর মধ্যে পা দুটোকে গলিয়ে সে বললো, 'বীজ কেনার জন্যে আমাকে ধার করতে হয়েছে। জমির পাওনা টাকাও আমি শোধ করতে পারিনি। তোমাকে নিয়ে আমি কি করবো ? আমার মেয়েটা গাছের মতো বড়ো হয়ে উঠেছে, তাকে ঠিকমতো বিয়ে দিতে পারলেই আমার তৃপ্তি হবে। তুমি বরঞ্চ অন্য কারুর কাছে যাও।'

ক্লান্ত ও নিঃশেষিত হয়ে আমি তখন একটা বড়ো শহরের দিকে রওনা হলাম। তারপর সেখানকার একটা কারখানায় গিয়ে একজন শ্রমিকের সঙ্গে দেখা করলাম। লোকটা আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে সামান্য দু-একটা কথা পর্যন্ত বললো না। শুধু একটা ছেঁড়া জামায় নিজের হাত দুটো মুছে নিয়ে বললো, 'শীগগির আমাদের কারখানায় অনেক ছাঁটাই হবে। কালকের খাওয়া কি করে জোটাবো, জানি না। কাজেই আমি তোমাকে নিয়ে কি করবো ? আমার ছেলেটা গত কদিন হলো বিছানায় পড়ে রয়েছে। ওর জন্যে ওষুধটুকু জোটাতে পারলেই, আমি খুশি। তুমি বরঞ্চ অন্য কারুর কাছে যাও।'

ক্ষেত থেকে বহিষ্কৃত আর কারখানায় অপমানিত হয়ে আমি খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধ একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে হাত দুটো আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছেন, 'আল্লা, প্রভু আমার! তোমাকে ধন্যবাদ— আমার ছেলে শক্ত সমর্থ আর স্বাস্থবান হয়ে উঠেছে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এখন সে আমাকে সাহায্য করবে। তার সৎ পথের রোজগারকে তুমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করো।'

আমার মনে হলো, যে মানুষটিকে খুঁজছিলাম, অবশেষে আমি তার দেখা পেয়েছি। দ্রুত বৃদ্ধের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি স্বর্গীয় হাসি হেসে বললেন, 'আমার একমাত্র ইচ্ছে আমি যেন দেখতে পাই, আমার ছেলে আর তার স্ত্রী একখানা ভালো ঘরে শান্তিতে বাস করছে আর আমি আমার নাতিকে নিয়ে সে ঘরের ছোট্ট বারান্দাটাতে খেলা করছি।' বৃদ্ধ তাঁর মনের দুয়ার খুলে দিলেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ তার ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

বৃদ্ধ খুবই জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ মানুষ। প্রতি মাসের শেষে ছেলে তাঁকে মাইনের টাকাটা এনে দিতো। তিনি তার অর্ধেকটা সঞ্চয়ে রেখে, বাকি অর্ধেকে সংসার চালাতেন। আমিও আশা করতে শুরু করলাম যে আর কয়েকটা মাস, কিংবা বড়োজোর আর সামান্য কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বাস্তবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারবো। বৃদ্ধ একটু সস্তায় একখণ্ড জমি আর ছেলেকে বিয়ে দেবার জন্যে একটি ভালো মেয়ের সন্ধান করতে শুধু করলেন।

তারপর, কি করে কেউ জানে না, শহরটা একটা নির্মম নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যস্থল হয়ে উঠলো। কয়েকজন পুলিস এসে বৃদ্ধকে পরামর্শ দিলো, 'যদি নিজের প্রাণটা বাঁচাতে চান, তাহলে এক্ষুনি যাত্রীদলের সঙ্গে এখান থেকে চলে যান। আমরা আপনাদের যাত্রীদলের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

বৃদ্ধ বিভ্রান্ত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে পুলিসদের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি ভীষণ বিহ্বল হয়ে জিগেস করলাম, 'কিন্তু আমার কি হবে? আপনারা হয়তো জানেন না যে এই বৃদ্ধ আমার জন্যে এক খণ্ড জমি পর্যন্ত পছন্দ করে রেখেছেন। আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই…'

পুলিসের লোকেরা আমার কথা শুনে হেসে বললো, 'বাছা, মনে হচ্ছে তুমি উন্মাদ। যদি নিজের ভালো চাও, তাহলে কোনো হিন্দুর মনে গিয়ে বোসো। তুমি কি দেখছো না, এই বৃদ্ধ একজন মুসলমান?'

আমি এ সমস্ত কথার কোনো অর্থই বুঝতে পারছিলাম না। তাই ব্যাপারটা একটু খোলসা করে নেবার প্রচেষ্টায় বললাম, 'কিন্তু উনি একজন ঈশ্বর-ভীরু, ন্যায়বান বৃদ্ধ। ওঁর ছেলেও কঠিন পরিশ্রম করে জীবিকা সংগ্রহ করে।'

পুলিসের লোকেরা এবারে স্রেফ আমাকে উপেক্ষা করে বৃদ্ধ এবং তার ছেলের হাত চেপে ধরে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো।

যাবার সময় বৃদ্ধ আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, 'পুলিস ঠিকই বলেছে। যে জায়গায় আমার জন্ম হয়েছে, আমি বড়ো হয়ে উঠেছি…যেখানে আমার ছেলে জন্ম নিয়েছে, বড়ো

হয়ে উঠেছে—সেই জায়গা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কাজেই তোমাকে দিয়ে আমি কি করবো? সব চাইতে ভালো হবে, যদি তুমি কোনো হিন্দুর মনে আশ্রয় নিতে পারো।'

বৃদ্ধকে ছেড়ে আসতে আমার খুব খারাপ লাগছিলো, বিশেষ করে তাঁর জীবনের এই শেষ পর্যায়ে। তাই আমি একগুঁয়ের মতো তাঁর মনের এক কোণে শান্ত হয়ে বসে রইলাম, এগিয়ে চললাম যাত্রীদলের সঙ্গে। কিন্তু সামান্য কিছু দূর যেতে না যেতেই যাত্রীদল আক্রান্ত হলো, খুন হয়ে গেলো বৃদ্ধের তরুণ ছেলেটি। কাতর আর্তনাদ করে বৃদ্ধ বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। যে মাটি আমার ছেলের রক্ত পান করেছে, সে মাটিতে আমি ঘর বাঁধতে চাই নে।' তারপর তিনি জোর করে নিজের চিন্তা থেকে আমাকে দূর করে দিলেন।

অন্য এক যাত্রীদল আমাদের উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছিলো। আমাকে বিষণ্ণ এবং নিতান্ত হতাশ হতে দেখে সদাশয় বৃদ্ধ আমার হাত ধরে বললেন, আল্লার নামে আমি তোমাকে ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সামনের ওই হিন্দু যাত্রীদলকে দ্যাখো—ওরা আমাদের মতোই ছিন্নমূল আর বিষণ্ণ। তুমি ওখানে গিয়ে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সত্তায় স্থিতু হও। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!'

আমি বৃদ্ধের উপদেশ উপেক্ষা করতে পারলাম না, তাই এগিয়ে গেলাম অন্য যাত্রীদলের দিকে। দেখলাম, একজন নিজের চারদিকে জমায়েত হওয়া মানুষগুলিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের সাহস হারালে চলবে না। আমরা যদি বেঁচে থাকি, তাহলেই আমাদের দুনিয়াটা নিরাপদ থাকবে। আমাদের মাথার ওপরে কোনো ছাদ থাকতে না পারে, কিন্তু কাজ করার জন্যে হাত দুটো তো রয়েছে!' আমি দ্রুত মানুষটার কাছে এগিয়ে তাঁর হাত দুটিতে চুমু দিলাম—সে হাতে কঠিন শ্রমের সুগন্ধ।

সূর্য অস্ত যেতেই যাত্রীদল অস্থির হয়ে উঠলো। লুটেরার দল এসে তাদের মধ্যে থেকে যতো জন মহিলাকে নিতে পারে, লুট করে নিয়ে চলে গেলো। আমার প্রভু, যিনি তখন পর্যন্ত সবাইকে সাহস দিচ্ছিলেন, এবারে উঁচু গলায় বিলাপ করতে শুরু করলেন। আমাকে তিনি বললেন, 'বন্ধু, যে মাটিতে আমার স্ত্রী লুট হয়ে গেলো, সে মাটিতে আমি ঘর বাঁধতে চাই নে···' তারপর তিনি আমাকে মৃত-সন্তানের মতো দু হাতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

আমি লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। এমন একজনের খুপরিতে গিয়ে হাজির হলাম, যে বেশি ভাড়া দিতে পারে না বলে বাড়িওলা রোজ তাকে গালাগালি করে। এমন একটা ঘরে গেলাম যে ঘরের ভাড়াটে একজন কবি—সকাল বেলা সে তার নতুন কবিতা রচনা করতে শুরু করলেই ওপর তলার মহিলা সশব্দে ঘরকন্নার কাজ শুরু করে দেন। এমন একজনের ঘরে গেলাম, যার প্রতিবেশী রাত্রি বেলা পুরো মাতাল হয়ে বাড়িতে ফিরে, ভদ্রলোকের ছোটো মেয়েটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে—ভদ্রলোক

তবু ঘরটা ছেড়ে দিতে পারেন না, কারণ এতো সস্তায় তিনি আর কোথাও ঘর পাবেন না। আরও একজনের ঘরে গেলাম, যার স্ত্রীকে একতলা থেকে বালতিতে করে জল তুলে আনতে হয় এবং এই কারণেই সময় পূর্ণ হবার ছ মাস আগে মহিলার গর্ভপাত হয়ে গেছে। ·· কিন্তু এদের মধ্যে কেউই আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো না।

এই ভীড়াক্রান্ত ঘরগুলোর মধ্যে একটি ঘরে এক সুদর্শণ তরুণ বাস করতো। খুব পড়াশুনো করতো ছেলেটি। শুনেছিলাম ছেলেকে ভালোভাবে পড়াশুনো করাবার জন্যে ছেলেটির মা নিজের সমস্ত গয়নাগাটি বিক্রি করে দিয়েছেন এবং ছেলেটি শীগগিরি একটা চাকরি পাবে। আমি আরও শুনেছিলাম, ছেলেটি তার কলেজেরই একটি মেয়েকে ভালোবাসে। আমার মতো ছেলেটিও এই গরীব মানুষগুলোর করুণ অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী। তাই সে স্থির করেছিলো, সে কোনোদিনও এমন কোনো ঘরে থাকবে না, যে ঘরের মালিক ভাড়াটেদের কুৎসিৎ ভাষায় গালিগালাজ করে। সে এমন কোনো ছাদের নিচে বাস করবে না, যেখানে ঠোঁটে মধুর গান নিয়ে সে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরার সময় ওপর তলায় কেউ সশব্দে গেরস্থালীর কাজ শুরু করবে। নিজের স্ত্রীকে সে এমন কোনো বাড়িতে রাখবে না, যেখানকার কোনো প্রতিবেশী রাত্রিবেলা মাতাল হয়ে ফিরে বেহায়ার মতো তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকবে। কোনো বাড়ির চারতলাতেও সে বাস করবে না, যাতে তার স্ত্রীর একতলা থেকে জল তুলতে গিয়ে গর্ভপাত না হয়।

অতএব এই তরুণের সঙ্গে দেখা হতেই সে আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে মা-কে বললো, 'মাগো এবারে আমাদের জীবনটা বদলে যাবে। বাবা আমাদের জন্যে যে জমিটা কিনে রেখে গেছেন, আমি সেখানে বাড়ি তুলবো। একটা চাকরি আমি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবো। তারপর সরকারের কাছ থেকে আমরা হাজার আষ্টেক টাকা ধার নেবো। শত হলেও, এ সরকার তো আমাদেরই!'·· কথাগুলো শুনে আমি শ্রান্ত পথিকের মতো ওই তরুণ-হৃদয়ের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে পড়লাম।

একদিন ছেলেটি একজন নকশা-আঁকিয়েকে ডেকে আনলো। তারপর তার হৃদয়ে আঁকা আমার রেখাগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে, ছোট্ট একটা বাড়ির নকশা আঁকার নির্দেশ জানালো।

এরপর সে বাড়ি তৈরি করার ঋণের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন জানালো। আর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটা চাকরি দেবার আবেদন জানিয়ে ডজন খানেক দরখাস্ত পাঠালো বিভিন্ন অফিসে।

এই প্রথম আমি একটা পেন্সিলকে চুমু খেলাম, এক খণ্ড কাগজকে জড়িয়ে ধরলাম। একটা নীল কাগজে আমাকে গোল করে জড়িয়ে নকশা-আঁকিয়ে আমার মালিককে এসে বললো, 'নকশা আঁকতে তিরিশ টাকা আর ম্যুনিসিপাল কমিটিকে দিতে হবে তিরিশ টাকা। তবে নকশাটাকে অনুমোদন করাবার জন্যে আরও তিরিশ টাকা যোগ করে রাখুন।'

আমার মনিব নকশা-আঁকিয়ের প্রাপ্য টাকাটা মিটিয়ে দিলো, কমিটির টাকাটাও মেটালো, কিন্তু ঘুষ দিতে রাজি হলো না। তার বদলে সে বললো, 'আমি একটা স্বাধীন দেশের সম্মানিত নাগরিক। নিজের দেশে বাড়ি তৈরি করাটা আমার অধিকার। নকশা যদি কমিটির নিয়ম অনুযায়ী সঠিক হয়ে থাকে, তা হলে কেউই ওটার অনুমোদন আটকাতে পারবে না।' নকশা-আঁকিয়ে বিষয়টার প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলো, কিন্তু আমার মালিক নিজের উঁচু মানের আদর্শবাদিতার জন্যে বড্ডো গর্বিত। ...আমি অবিশ্যি একটা ফাইলের সঙ্গে এবারে কমিটির অফিসে ঢুকে পড়লাম।

মাসের পর মাস কেটে গেলো। সমস্ত সময়টা অফিসে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমার দু পায়ে ব্যথা হতে শুরু করলো। তারপর একদিন একজন অফিসার আর একজনকে ফিসফিসিয়ে বললো, 'এ নকশাটা এখন থাক। কেউ যদি এটাকে সত্যি সত্যি অনুমোদন করাতে চায়, তাহলে সেজন্যে তাকে পয়সা খরচ করতে হবে।' এবং আমি একটা ভাঙা টেবিলের গভীরে জ্যান্ত কবরস্থ হলাম।

যখন আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে শুরু করলো তখন আমি ভাবলাম, 'এ কি নিয়তি আমার! কথা ছিলো এখন আমি কোদাল, লাল ইট আর ধূসর সিমেন্ট নিয়ে খেলা করবো...আস্তে আস্তে জেগে উঠবে আমার আকার, বেড়ে উঠবে আয়তন, হাওয়ায় উড়বে কামিনদের রঙীন ঘাঘরা, তাদের রূপোর কাঁকন ঠুমক ঠুমক আওয়াজ তুলবে আমার কানে, কাচের চুড়িগুলো ঘুরে বেড়াবে আমার চতুর্দিকে বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো...মজুরদের ঘামের গন্ধে ভরে উঠবে বাতাস...আর তারপর...তারপর একদিন আমার মালিক প্রেমিকার কোমরে হাত জড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে বলবে, 'ওই দ্যাখো সোনা, আমাদের বাড়ি...আমাদের নিজেদের বাড়ি'। তারপর সে তার বুড়ি মাকে হাত ধরে আমার কাছে নিয়ে এসে বলবে, 'মাগো, তুমি অনেক কষ্টে আমাকে বড়ো করে তুলেছো। দ্যাখো আমি তোমার জন্যে কেমন বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি'।...তারপর একটা ছোট্ট শিশু আমার মালিকের চোখে খেলা করতে শুরু করবে।'

অথচ জ্যান্ত অবস্থাতেও আমাকে এই ভাঙা টেবিলের কবরে পড়ে থাকতে হচ্ছে।...

তারপর একদিন মনে হলো, কে যেন আস্তে আস্তে আমার কবরটাকে খুঁড়ছে। আমি কান পেতে রইলাম, সমস্ত মনোযোগ একাগ্র করে তুলতে চেষ্টা করলাম। আশা করতে শুরু করলাম, এবারে নিশ্চয়ই একটা কিছু হবে। কিন্তু হায়, ওরা ইঁদুর...ওরা আমাব পায়ের পাতা দুটো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিলো। খুঁটছিলো আমার গোড়ালি, আমার হাঁটু। আর খুঁটে খুঁটে খেয়ে ফেলছিলো আমার সবটুকু আশাও।

তারপর এলো পুনরভ্যুদয়ের দিন। আমি এবং আমার মতো আরও কয়েকজনকে কবর থেকে টেনে তোলা হলো। কমিটির একজন অফিসার দেবদূত গ্যাব্রিয়েলের মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে একজন কেরাণীকে নির্দেশ দিলেন, নকশাগুলোকে যেন যার যার মালিকের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। শান্ত গলায় তিনি জানিয়ে দিলেন, 'এই নকশা-

গুলোকে অনুমোদন করা যাবে না, কারণ ইঁদুর এগুলোকে খেয়ে ফেলেছে।'

গুঁড়ি মেরে মেরে আমি মালিকের কাছে পৌঁছে গেলাম। অভিজ্ঞ মানুষের মতো গম্ভীর গলায় নকশা-আঁকিয়ে তাকে বললেন, 'আমি তো আপনাকে আগেই বলেছিলুম, রূপোর চাকা ছাড়া এ গাড়ি নড়ে না। আপনি এটাকে যতোগুলো খুশি উঁচু আদর্শের ইঞ্জিন দিয়ে গড়া বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু...'

আমার মালিকের চোখে জল এসে গেলো। আমি ফের তাকে মিনতি করে বললাম, 'এই পৃথিবীতে বাস্তব-রূপ নেবার ভাগ্য যদি আমার না থাকে, তাহলে অন্তত তোমার হৃদয়ে চিরদিন আমাকে থাকতে দাও। তোমার মনের মাঝে আমাকে থাকতে দাও, মালিক।'

'কিন্তু সেখানেও আমি তোমাকে রাখতে পারবো না।' একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে সে বললো, 'সেখানেও অনেকগুলো ইঁদুর জন্মেছে। তোমার শরীরের নিচের অংশটাকে ওরা ইতিমধ্যেই খেয়ে ফেলেছে। ওখানে থাকলে ওপরের অংশটারও ওই একই গতি হবে।'

'কি বললে? তোমার হৃদয় আর মনেও ইঁদুর?'

'হ্যাঁ, বন্ধু। কর্মিটি যেমন বাড়ির নকশাগুলোকে খাওয়াবার জন্যে ইঁদুর রাখে, আমাদের সমাজেও তেমনি অনেক ইঁদুর আছে, যারা মানুষের স্বপ্নের নকশাকে খুঁটে খুঁটে খায়।'

'তুমি যে ঋণের দরখাস্ত করেছিলে, তার কি হলো?'

'সরকার অনুসন্ধান করে দেখলেন আমার নিজস্ব কোনো বাড়ি আগে থেকেই ছিলো কিনা, আমার মার কোনো বাড়ি আছে কিনা, কিংবা আমার বাবার কোনো বাড়ি ছিলো কি না। যেহেতু হিন্দু পরিবারকে একান্নবর্তী পরিবার বলে মনে করা হয়, তাই তাঁরা আরও অনুসন্ধান করে দেখলেন যে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনের নিজস্ব কোনো বাড়ি আছে কি না বা আমার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা আমাদের পরিবারের কাউকে কোনো বাড়ি দান করে গেছেন কিনা। যদিও কর্তৃপক্ষকে আমি শেষ অব্দি বিশ্বাস করাতে পেরেছি যে, যেহেতু মানুষ বাঁদর থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে তাই আমাদের গুষ্ঠির কারুরই কোনোদিন নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিলো না—তবু তাঁরা কিছু করেন নি। আমার দরখাস্তটাকে তাঁরা এমন মাত্রায় আফিং খাইয়ে দিয়েছেন যে, সেটা যে কোন টেবিলের কোন দেরাজে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন।' ...

'আর তোমার চাকরির দরখাস্ত?'

'সেগুলোর অবস্থা ঠিক যেন বর খুঁজতে খুঁজতে বুড়িয়ে যাওয়া কুমারী মেয়ের মতো।'

'আর তোমার প্রেমের দরখাস্ত?'

'মেয়েটির বাবা বলেছেন, যার নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই, তার ভালোবসাবারও কোনো অধিকার নেই।'

তারপর আমার মালিক পরম শ্রদ্ধাভরে আমাকে এই আবর্জনার স্তূপের ওপরে রেখে, বাড়ির জ্বালানির সরবরাহ অটুট রাখার জন্যে জমিটাকে দরদাম করে বিক্রি করতে চলে গেলো।

ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে আমি তার পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলাম, 'আর আমি ? আমার কি হবে ?'

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে মালিক সদয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিজের ভাগ্য নিয়ে তোমার যখন এতোই দুশ্চিন্তা, তখন তোমার উচিত ছিলো কোনো ব্যবসায়ীর হৃদয়কে বেছে নেওয়া। তাহলে তুমি আর ছোট্ট বাড়ি নয়, একটা প্রাসাদ হয়ে উঠতে পারতে।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো, মালিক। আমি কোনো প্রাসাদ বা অট্টালিকার নকশা নই। যে মানুষের দশ নখে পরিপূর্ণতার আবাস, আমি তেমনি কোনো মানুষের একটা সাধারণ বাড়ির নকশামাত্র।'

নিজের আঙুলগুলোর দশটা নখের দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে আমার মালিক গলিটা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

রবির মনে একটা কবিতা ক্রমশ রূপ নিচ্ছিলো। পায়ে হেঁটে ঘোড়ায় চেপে যাবার রাস্তা পেরিয়ে এইমাত্র সে লক্করমণ্ডি থেকে কালাটোপিতে এসে পৌঁছেছে। ঘাসে ভরা সবুজ জমি মাড়িয়ে আসতে আসতে সে উপভোগ করেছে সবুজের ঘন প্রাচুর্য। তারপর মাইলের পর মাইল চড়াই ভেঙে নিজের কুঠিতে পৌঁছে হাতের বোঝা নামিয়ে রেখেছে। স্ত্রী ওকে এক পেয়ালা গরম কফি দিয়ে বিছানা পেতে দিয়েছে। কিন্তু রবির ঘুম পাচ্ছিলো না। একা একা কুঠি থেকে বেরিয়ে এলো সে। তার মনে হলো এতোক্ষণ যে অগাধ শ্যামলিমা সে আকণ্ঠ পান করেছে, তা যেন তার প্রাণের গভীরে একটা কবিতার রূপ নিয়ে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসছে—সেটা তাকে এক্ষুনি এক টুকরো কাগজে লিখে ফেলতে হবে। এবং লিখতে শুরু করে নিজেকে নেশার ঘোর কাটাবার উদ্দেশ্যে বড়ি খাওয়া মানুষের মতো মনে হলো তার।

সবুজ জমিতে, নিজের পায়ের তলায়, কাগজের টুকরোটা রাখলো রবি। কবিতাটা এখনও অসমাপ্ত: কাগজটা যাতে উড়ে না যায়, সে জন্যে ওটার ওপরে বড়োসড়ো এক টুকরো পাথর চাপা দিয়ে রাখলো সে। তারপর শুয়ে পড়লো ঘাসের ওপরে। সার্ত্রের কথাগুলো মনে পড়লো তার: 'লেখার সময় আমি হতাশার জালের মধ্যে কিছু সৌন্দর্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করি'। রবি ভাবলো, আমি যখন লিখি, তখন ব্যাপারটা ঠিক এর উলটো হয়। আমি সর্বদা সৌন্দর্যের জালের মধ্যে হতাশাকে ধরার চেষ্টা করি।

রবি বিষণ্ণ হয়ে চিন্তা করে, নিজের ভেতরটাকে আঁতিপাতি করে খুঁজে দ্যাখে। ওর হৃদয়ে কোথাও এতোটুকু হতাশা নেই। কিন্তু কাগজের বুকে ও যে শব্দগুলো লিখেছে, তা শুধুই হতাশার। এতে অস্বীকার করার কিছু নেই। নিজেকে সমাধিক্ষেত্রে জেগে থাকা একটা মানুষের মতো মনে হয় রবির। তার প্রেম একটা নিভে যাওয়া আগুন। তাতে প্রায় মরে আসা কোনো অঙ্গারের দীপ্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। প্রেমে অপূর্ণতার বেদনাটুকুও এখন চলে গেছে। অন্য কাউকে সে চেয়েছিলো, কিন্তু তাকে জয় করে নিতে পারেনি। যাকে বিয়ে করেছে, সে সুন্দরভাবে রবির বুদ্ধিবৃত্তির দাবী মিটিয়েছে—হয়তো সে জন্যেই অতীতের দিনগুলি রবির মনে কোনো বেদনা রেখে যায় নি। কিন্তু প্রতিবার, কোনো কবিতা লিখতে শুরু করলেই একটা বেদনা তার কলমের ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে। রবি এটাকে ঠিক বেদনা বলতে পারে না। এবং এই কারণেই নিজেকে, নিজের কবি সত্তাটাকে, সমাধিভূমির একজন পাহারাদার বলে মনে হয় তার।

সার্ত্রের কথা ফের মনে পড়ে রবির! সার্ত্রে স্বীকার করেছেন, প্রতিদিন সকালে তাঁর বাধ্যতামূলকভাবে কাগজ-কলম নিয়ে বসার মনোভাবের সঙ্গে বেঁচে থাকার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেবার একটা সাদৃশ্য রয়েছে। কথাটা রবির কাছে ভীষণ সত্যি বলে মনে হয়।

যে মেয়েটিকে নিয়ে সে লিখতো, সেই মেয়েটিকে তার লেখা দেখাবার জন্যে কোনোদিনই সে কোনো ব্যগ্রতা অনুভব করেনি আর কবিতার বিনিময়ে খ্যাতিও সে কিনতে চায়নি কোনোদিন। খ্যাতির সম্পর্কে সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সে একমত : খ্যাতি তখনই আসে, যখন মানুষটা আর থাকে না—খ্যাতি তখন তার সমাধি সাজানোর ফুল হয়। মানুষটা বেঁচে থাকতেই যদি খ্যাতি আসে, তবে প্রথমে তা মানুষটাকে শেষ করে—তারপর তার সমাধিকে সাজিয়ে তোলে। তাই রবি কোনো পুরস্কার মূলক প্রতিযোগিতায় তার কবিতা পাঠায়নি—কারণ তার ধারণায় ওগুলো 'মুরগী-লড়াই'র মতো মানুষের সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা দেখাবার জন্যেই আয়োজিত হয়. তারপর আসে প্রতিদ্বন্দ্বীদের আহত করে কবির পুরস্কার বিজয়ের মিছিল। রবি কোনো প্রেমিকা বা নিজের খ্যাতির জন্যে লেখে না। সে বাঁচার জন্যে খায় এবং বেঁচে থাকার পাপ স্খালনের জন্যে লেখে।

রবির মনে একটা বমনোদ্রেককারী উপমা জেগে ওঠে। কবিতা হচ্ছে কেঁচোর মতো। উষ্ণ মাটিতে কেঁচোরা জন্মায় আর কবিতা জন্ম নেয় উত্তপ্ত মনের গভীরে। নিজের উপমাটাতে রবির কিন্তু সত্যি সত্যি বমি পায় না। উপমাটাতে কেঁপে কেঁপে উঠে একটা কেঁচোর চটচটে শরীর যেন তার চোখের সামনে কিলবিলিয়ে ওঠে। কিন্তু বিষয়টা সত্যি, ভাবলো রবি। মুখ টিপে মৃদু হাসলো সে।

রবির মন এবারে একটা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চললো। প্রতিটা কবিতাই নৈঃশব্দ্যের সন্তান। মানুষ যখন কোনো কারণে হতবাক হয়ে যায়, বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন কাব্যিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে তাকে নিজের নীরবতা ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়।

এবং তখনই রবির মনে হয়, কবিতা লেখাটা যেন নন্দন কানন থেকে আপেল চুরি করার মতো ঘটনা। আদম আপেল চুরি করে চিরকালের মতো স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন আর যে মানুষ কবিতা লেখে, তার মনের একটা অংশও চিরদিনের মতো এই পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়।

কিন্তু না, রবির মনে হয়, আমার মনের দুটো অংশ সর্বদা একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ করে, একে অন্যকে ঈর্ষা করে, ঘৃণা করে। এই চিরন্তন বিরোধিতা ক্রমে আগ্রাসন হয়ে ওঠে। এবং কবিতা এই প্রতিটা আগ্রাসনের রায়। রবির এই চিন্তাধারা তার হাসির বুকে যন্ত্রণার ছুরিকাঘাত বয়ে আনে। কবিতা হয়তো এই যুদ্ধাঘাতেরই ক্ষতচিহ্ন।

বিভিন্ন রূপে নিজেকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্যে কবিতার ক্ষমতা রবিকে কবিতার গভীরতর প্রশাখাগুলোর সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে। মানুষ পৃথিবীর সামান্য একটু অংশ নিয়ে থাকে। তার চতুর্দিকে পাগলের আঁটো পোশাকের মতো পরিস্থিতি আর পরিবেশের এতো ঘন আঁটসাট বুনোট যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে পারে না। কিন্তু কবিতার নাগাল এতো বিরাট যে তা একই সঙ্গে নিজের এক পা মানুষের শৈশবভূমি আর এক পা মানুষের সমাধিভূমিতে রাখতে পারে।

চেতনার ধারা বয়ে চলে···বন্যার অশান্ত জলধারা নয়—দুকূলের সীমানা মেনে চলা

শান্ত জলধারা এবং রবি অনায়াসে গা ভাসায় তাতে।

'বীরাজী, তোমার কাগজটা এতোদূর উড়ে এসেছে আর তুমি তা লক্ষ্যও করো নি?' মোনা এগিয়ে এসে কাগজটা রবির হাতের কাছে রাখলো। বাতাস হালকা হয়ে এসেছিলো। কাগজটাতে চাপা দেবার মতো একটা নুড়ির খোঁজে চারদিকে তাকাচ্ছিলো মোনা। কারণ কাগজের ওপরে যে নুড়িটা ও রেখেছিলো সেটা বড্ড ছোটো বলে, বাতাস কাগজটাকে উড়িয়ে নিচ্ছিলো। কাগজের ওপরে মোনা ওর হাতটা রাখলো।

গোধূলির নরম আলোয় কাগজটার দিকে তাকালো রবি, তারপর তাকালো কাগজের ওপরে রাখা মোনার হাতখানার দিকে। পলকা আর স্বচ্ছ একটা হাত। পেপার-ওয়েটের মতো। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা হাত টেবিলের ওপরে একটা পেপার-ওয়েটের কাজ করছে, ভাবতেই কেমন যেন হতবিহ্বল হয়ে উঠলো সে। মনে পড়লো তার কোটটা একদিন তার স্ত্রী নিজের কাঁধের ওপরে রাখায়, স্ত্রীকে দেখে একটা সুন্দর হ্যাঙ্গার বলে মনে হয়েছিলো তার। প্রাণময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে দেখে কেন তার প্রাণহীন বস্তুর কথা মনে পড়ে, ভেবে অবাক হলো রবি। পরিপূর্ণ সটান কাঁধ দুটোকে সে হ্যাঙ্গার হিসেবে কল্পনা করে নিয়েছিলো। কেন তার মনে হয়নি ওই কাঁধ দুটিতে হাত রাখা যায়, আদর করা যায়, কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরা যায়? আর একখানা হাতকে তুলে ধরা যায় নিজের ঠোঁটের কাছে?···

স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার প্রচেষ্টার মতো নিজের খেয়ালি কল্পনাকে নিজের মনে জড়িয়ে রাখতে চেষ্টা করে রবি। কিন্তু প্রাণময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে অচেতন পদার্থ হিসেবে কল্পনা করে নেবার প্রবৃত্তিটাকে তার অরুচিকর বলে মনে হয়। সে অনুভব করে অন্যদের মধ্যে জীবন স্পন্দিত হচ্ছে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে কিছু একটা মরে গেছে। তাই অন্যদের স্পর্শ করার, ঘ্রাণ নেবার বা জড়িয়ে ধরার কথা তার মনে হয়নি। নিজের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মরে যাওয়া জিনিসটাকে সজীব করে তুলতে প্রাণপণে চেষ্টা করে রবি, টান-টান করে তোলে নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আর চোখের দৃষ্টি স্থির করে রাখে মোনার মুখের দিকে।

মোনা তার স্ত্রীর ছোটো বোন, বছর চোদ্দ-পনেরো বয়েস। আজ অব্দি রবি ওকে একটা শিশু হিসেবেই দেখে এসেছে। শিশু হিসেবেই ওকে চিরদিন বকুনি দিয়েছে। কিন্তু এখন সচেষ্ট প্রয়াসে নিজের চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে ওর দিকে তাকালো সে—যেন স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে কাটতে মাথা ঘোরাতে হলো তাকে। এই প্রথম রবি দেখলো, মোনা বড়ো হয়ে উঠেছে। যৌবন ওর বুক গলা আর গালদুটিকে ভরিয়ে তুলেছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গাঢ় লাল রঙের আভা ছড়িয়ে দিয়েছে ওর ঠোঁট দুটিতে। রবির মনে হলো, তার নিজের হৃৎপিণ্ডটার রং ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তার মনে হলো, মোনার ঠোঁটে নিজের ঠোঁটদুটো রাখলে সে আবার তার হৃৎপিণ্ডের ম্লান হয়ে ওঠা রঙটাকে সজীব করে তুলতে পারবে।

এমন একটা চিন্তা কোনোদিনও রবির মনে আসেনি। এর এমন আকস্মিক আবির্ভাব তাকে শঙ্কিত করে তুললো।...তার মনে হলো, চিন্তার যে শান্ত প্রবাহে সে এতোক্ষণ সাঁতার কাটছিলো, তাতে আচমকা একটা সরীসৃপ যেন ভেসে উঠেছে। সরীসৃপটাকে নিজের এতো কাছাকাছি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো রবি।

'বীরাজী, ওঠো! তুমি কি ঘোরের মধ্যে রয়েছো, নাকি ?' ঘাসের বুকে কাগজের টুকরোটার পাশে বসে প্রশ্ন করলো মোনা। রবি ওর মুখের দিকে তাকালো। সেই নিস্পাপ নিশ্চিন্ত মুখ, যা রবি চিরদিন দেখে এসেছে। ও মুখে যৌবনের প্ররোচনা জাগানো আলোর আভা নেই, কাউকে ও প্ররোচিত করছেও না। আরও একবার নিজের বহতা চিন্তাধারার দিকে চোখ ফেরালো রবি। সরীসৃপটা এখন আর সেখানে সাঁতার কাটছে না।

'তুমি এখানে কি করছো ?' মোনার গালে আলতো করে চাটি মারলো রবি, 'যাও, শুয়ে পড়োগে।'

'তোমার কাগজটা উড়ে গিয়েছিলো।' মোনা বললো, 'আমি ওটাকে তাড়া করে ধরে না ফেললে, তুমি হয়তো এখনও ওটাকে খুঁজে বেড়াতে। বাতাসেই উড়ে যেতো তোমার কবিতা।' কণ্ঠস্বরে রুক্ষতার স্পর্শ মিশিয়ে যোগ করলো ও।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এবারে তুমি ভেতরে যাও, আমি একটু পরেই আসছি।'

'তুমি এসো', রবির হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করলো মোনা। 'দিদি এতো ক্লান্ত ছিলো যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি একা একা ভেতরে থেকে কি করবো ?'

রবির হাতটা কেঁপে ওঠে। তার মনে হয়, জলধারার মধ্যে সরীসৃপটা তার কাছাকাছি এসে যেন তার নগ্ন শরীরটাকে স্পর্শ করে গেলো।

নিদারুণ বিক্ষোভে চোখ বন্ধ করে রবি। মোনার নিঃশ্বাস তার কপালে হাওয়ার স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। এক ঝলক আগুন ছুটে যায় তার শরীরের ভিতর দিয়ে। তারপর মনে হয়, মোনাকে সে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায়। তার আঙ্গুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর নরম পুরুষ্টু স্তন দুটিতে, ঠাণ্ডা ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপছে মোনার ঠোঁটের পাতায়। রবির মনে হয়, জলের মধ্যে সরীসৃপটা শুধু তাকে স্পর্শ করেই যায় নি—বিষদাঁত-গুলোও বসিয়ে দিয়েছে তার শরীরের গভীরে। তার সমস্ত শরীরে এখন বিষের প্রদাহ।

'কি হলো তোমার, বীরাজী ? তুমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ?' নির্দোষ ভঙ্গিমায় প্রশ্ন করে মোনা, নিজের আঙুল দিয়ে টেনে খুলতে চেষ্টা করে রবির বন্ধ চোখদুটোকে।

রবির মাথাটা ঘুরছিলো। দুকানে এক নিবিড় নৈঃশব্দ্য। বাইরের কোনো শব্দ তার মস্তিষ্কে গিয়ে ঢোকে না। শুধু নিজের ভিতরকার একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সে। প্রতি মুহূর্তে সরীসৃপটার বিষ ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত শরীরে। ক্রমশ বেড়ে ওঠা বিষের প্রভাবে রবির মনে হয়, সে মোনার ব্লাউজটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। অন্ধকারের মধ্যে মোনার অবারিত শরীরটা ঝলমল করছে মর্মর পাথরের মতো—বিজলীর চমকের মতো তা রবির চোখের সামনে ঝলসে উঠে রবিকে হতভম্ব করে তুলছে।

রবি দেখলো, সরীসৃপটার ছড়িয়ে পড়া বিষ তার শরীরটাকে শক্ত করে তুলেছে। আর তার অটুট, তখনও জীবন্ত মনটা লক্ষ্য করছে নিজের মৃত্যু-যন্ত্রণা আর মৃত্যু-সঙ্কোচ। তার মরনোম্মুখ শরীরটাতে কি এক অসহায়তা, আর দর্শক মনটাতে কি এক আতঙ্ক! এক রবি তখনও চোখভরা বাসনা নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মোনার দিকে, অন্য জন হাতের ইঙ্গিতে ওকে চলে যেতে বলছে বারবার।

মোনা এসবের কিছুই বুঝতে পারেনি। ও শুধু ইশারাটা দেখে তা পালন করেছে। কবিতাটা রবির হাতে তুলে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেছে ও।

রবির ইচ্ছে করছিলো, চিৎকার করে ওকে থাকতে বলে। কিন্তু তার নিজের কণ্ঠই নিজের কণ্ঠস্বরকে চেপে রেখেছে। ক্লান্ত নিঃশেষিত হয়ে ফের চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়েছে রবি।

কূলের সীমানা মেনে চেতনার ধারা তখনও বয়ে চলছিলো আগেকার মতো। এবারে স্রোতের কাছে আত্মসমর্পণ করলো রবি। এক ঝলক ঠাণ্ডা জলের মতো একটা দার্শনিক অনুশাসন মনে পড়লো তার—তোমাকে বাঁচতে হবে! জীবনকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না · রবি ভাবলো, এ এক অক্ষমতার দর্শন। আর কিছু করতে না পারলেও মানুষ কি জীবনকে অস্বীকার করার জন্যে, জীবনটাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে, অন্তত ঠোঁট দুটোকেও নাড়তে পারে না? রবি তার ঠোঁট দুটোকে নাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠাণ্ডা জলস্রোত তার ঠোঁট দুটোকে হিমায়িত করে বুজিয়ে দিয়েছে। রবির মনে হলো, সে স্রেফ একটা সাধারণ দুর্বল মানুষ। সে একজন মহাকাব্যীয় প্রেমিক, বীরোচিত প্রেমিক হবার চেষ্টা করেছিলো—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। বিয়োগান্তক প্রেমিক হতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু তাতেও সফল হয়নি। সে নিতান্তই একটা সাধারণ দুর্বল মানুষ, যার ঠোঁট দুটো স্বীকার বা অস্বীকার সূচক কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না। মনে হয়, নিজের ঠোঁট দুটোকে সে আদৌ নাড়াতেই পারে না। সে শুধু সৌন্দর্যের জালের মধ্যে ঠোঁটের হতাশাকেই ধরে রাখতে পারে।···

রবির হাত কাগজটাকে তুলে নিয়ে তাতে কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা লিখে ফেললো।

কবিতাটা যখন শেষ হলো, রবি তখন ক্লান্ত। যেন অত্যধিক সাঁতার কেটে তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিঃশেষিত হয়ে উঠেছে। দুই তীরের মাঝখান দিয়ে জলধারা তখনও বয়ে চলেছে শান্তগতিতে। · যে সরীসৃপটাকে সে দেখেছিলো, এখন সেটা তার দৃষ্টির অগোচরে। তার মনে এখন আর বিপদ সংকেত নেই, আছে শুধু ক্লান্তি।

আচমকা রবি অনুভব করে, তার শীত লাগছে। নদীর পারটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে গুঁড়ি মেরে উঠে আসে সে—মুছে ফেলে শরীর থেকে জলবিন্দুর মতো ঝরে পড়া চিন্তা-গুলোকে। তারপর এগিয়ে চলে কুঠির দিকে। কবিতাটা তার শরীর থেকে সমস্ত বিষ শুষে নিয়েছে। এখন সে আগের মতোই স্বাস্থ্যবান আর সম্পূর্ণ। এখন তার একমাত্র চিন্তা, দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে স্ত্রীর কবোষ্ণ শয্যায় আরামের আশ্রয় খুঁজে নেওয়া।

সুন্দরী মেয়ে হচ্ছে সুরের মতো।

অন্যদের কাছে সে মেয়ের অন্য কোনো নাম থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তার নাম 'সুর।' কি বললেন ? মেয়েটি আমার কি হয় ? দেখুন, একটা সুর কার কি হতে পারে, তা আমি ঠিক জানি না। না না, আমি আপনাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি না। আপনি আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন, আমি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করছি। যখন আমি কোনো সুর শুনি, তখন সুরটাকে কিন্তু মনের ভেতরে ঢোকার জন্যে কানের কাছ থেকে কোনো অনুমতি চাইতে হয় না। কানও সুরকে অনুমতি চাইতে বলে না। সুর শুধু কানকে স্পর্শ করে স্নায়ুর মাধ্যমে ভেতরে ঢুকে হৃদয়ে পৌঁছে যায়। তারপর সেটা হয়ে যায় প্রাণবায়ু…এবং সেভাবেই সেটা সেখানে থেকে যায়, চিরদিন।

মাঝে মাঝে সে কথা বলে। অনেক রাতে অন্ধকারের মধ্যে কিংবা অন্য কোনো সময়ে তা শোনা যায়। ওই ভাবে সে মানুষকে নিজের অস্তিত্বের কথাটা মনে করিয়ে দেয় এবং এই মনে করানোটাই দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কের অন্য কোনো নাম আমার জানা নেই। সম্ভবত এখন অব্দি এর কোনো নাম নেই।

আপনি হাসছেন দেখছি। এখনও অন্ধকার হয়নি, কিন্তু রাত আসছে। চারদিক আবছা হয়ে উঠছে…আমি আপনার মুখ দেখতে পাচ্ছি না। দিনের একটা ফালি এখনও আকাশের গায়ে লেগে রয়েছে। আপনি যখন এদিকে হেঁটে আসছিলেন তখন আপনি দেখতে পেয়েছিলেন, আমি আপনাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে এখানে বসতে বলছি।

ধ্বংসস্তুপের মধ্যেও মানুষ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে। নিজেদের নিঃসঙ্গতাকে বিদ্রূপ করার জন্যে তারা যে কেউই কাছ দিয়ে হেঁটে যায়, তার সঙ্গেই এক মিনিট কথা বলে নেয়।

না, আমি আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করবো না। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার মতো মানসিকতা আমার নেই। কাউকে কিছু বলার মতো মেজাজও নেই। কিন্তু আপনি এখানে এসে আমার কাছে বসেছেন…তা বসুন। না, আমি কিছু মনে করবো না। সত্যি বলছি…আপনার ইচ্ছে হলে বসুন না! আপনাকে অনুমতি চাইতে হবে না। ও, আপনি একা নন ? ওখানকার ওই লোকগুলো…ওঁরাও আপনার সঙ্গে আছেন ? ওঁরা এদিকেই তাকাচ্ছেন। না না, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না…ওঁরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করবেন।

কি বললেন ? ওঁরাও এখানে এসে বসতে চাইছেন ? বেশ তো, ডাকুন না ওদের। আমি কিছু মনে করবো না। কিন্তু একটা কথা। আমার কিন্তু সত্যিই মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনি যেভাবে হাসছেন, আমি তাতেই সেটা অনুভব করতে পারছি।

আপনি আমাকে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের এক ভেঙে পড়া প্রেমিক বলে ধরে নিয়েছেন। না, আমি কোনো উন্মাদ-প্রেমিক নই…উন্মাদতো কিছুতেই নই। আমার সমস্ত বোধশক্তিই অটুট।

আপনি ওই কবরটার দিকে দেখাচ্ছেন। ওখানে কাকে কবর দেওয়া হয়েছে জানতে চাইছেন? হ্যাঁ, ওটা সুরের সমাধি। সমাধি যে শুধু মৃতদেহেরই হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সমাধি নৈঃশব্দ্যের বা অজানার কিংবা বিষাদের বা হতাশার অথবা আরও অনেক কিছুরই হতে পারে…

একটা সুন্দরী মেয়ে হচ্ছে একটা সুরের মতো।

হ্যাঁ মশাই, আপনি ঠিকই বলছেন। সুর আবার মরবে কি করে? মাঝে মাঝে সুর এতো উচ্চকিত হয়ে ওঠে যে একেবারে পরিষ্কার শোনা যায়। আবার অন্য সময়ে এতো নিচু গ্রামে থাকে যে শোনাই যায় না।

আপনি মনোযোগ দিলে হয়তো শুনতে পাবেন…কিন্তু ভালো করে কান পেতে শুনুন। হয়তো বাতাস ওকে ডুবিয়ে দিতে পারবে না। কি বলছেন? কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না? দাঁড়ান…তাহলে একটা কাজ করে দেখি…

মন দিয়ে শুনুন। এখনও শুনতে পাচ্ছেন না? আপনি হাসছেন। ভাবছেন, আমি একটা পাগল। এখানে পাগলামির কিছু নেই, মশাই…আমি মাতালও নই। আপনি ভুল করছেন।

কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন, আমার একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। দেখি, কোথাও একটা আছে কি না।

একটা আছে…বেশি থাকলে আপনাকে দিতাম। কিন্তু আপনি তো আবার একা নন, কাজেই একটা সিগারেট আপনার পক্ষে যথেষ্ট হতো না। কি বললেন? আপনার কথা ভেবে আমি বিব্রত হবো না?…আপনার সিগারেটের দরকার নেই? তা বেশ…আপনাকে একটা সিগারেট দেবার ব্যাপারে এখন আমার করারও কিছু নেই। তাহলে আমি ধরেই নিচ্ছি যে এই শেষ সিগারেটটা আপনি চাইছেন না, কেমন?

…হ্যাঁ, আপনি যে কথাটা জানতে চাইছিলেন। নেশা কেটে গেলে সিগারেটের শেষ টানটা দুনিয়ার সব চাইতে সেরা জিনিস বলে মনে হয়। সারাদিনে আমি একটাও সিগারেট খাইনি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারছি, আমি মাতালও নই…আমি এখন স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছি। আর পাগলামির তো কোনো প্রশ্নই নেই…

সুর? হ্যাঁ, মন দিয়ে শুনুন। নিজের কানেই তো শুনতে পাচ্ছেন। আমি আর একথা বলার কে যে…না না, সুরটা আমি বাজাইনি। আপনি ঠিকই বলেছেন, কোনো সুর বাজাতে হলে একজন বাজিয়ে অবশ্যই থাকবে। কথাটা আমি অস্বীকার করছি না। আমি শুধু বলছিলাম যে এ সুর আমি গাইনি বা বাজাইনি।

কি বললেন ? আমি কে ? আমি কেউ নই। আমি শুধু বাতাসে ঝুলে থাকা একটা অনুভূতি...না না, অনুভূতিও না...শুধু এক টুকরো তার ··স্রেফ একটা আকাশ-তার।

আমি কক্ষনো কোনো শব্দলহরীকে বাধা দিতে পারি না···কোনো গানের লয় বা বাণী বদলাতে পারি না। যাঁর গলায় গান আছে অথবা যে গান অবশ্যই গাওয়া হবে, আমি তার মধ্যেও কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারি না। কেউ শুনতে না পেলে, আমি শুধু শব্দটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি—ধ্বনিকে বাঞ্ছিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ, সুরকে আমি নিজের হাতের মধ্যে ধরে রেখে তাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে পারি। একটা আকাশ-তার এর চাইতে বেশি আর কি করবে ?

কি বললেন ? শত হলেও মানুষ, মানুষই ? নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে কি করে একটা যন্ত্রকে বদলে দেবে ? গানের বোঝাকে বদলে দেবার জন্যে সে কি কাউকে উপদেশ দিতে পারে ? আপনি একটা দারুণ সাদাসিধে আর অদ্ভুত কথা বলে ফেলেছেন, মশাই। মনে হয় আপনি বেশি মানুষ দেখেন নি। দেখলেও, তারা নিশ্চয়ই জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার যন্ত্র।

পৃথিবীতে দুধরনের মানুষ আছে। মানে, সত্যিকারের মানুষ। আমি যন্ত্র বা ওই ধরনের অন্য কিছুর কথা বলছি না। এক ধরনের মানুষ ভালোবাসে, অন্যেরা ভালোবাসায়। শুধু এই দুটি শ্রেণী। এক ধরনের মানুষ যন্ত্র হয়ে যায়। হ্যাঁ, স্রেফ তারের যন্ত্র – যাদের টিপে, টেনে বা মুচড়ে যে কোনো সুর বের করা যায়। এদের বাজিয়ে আপনি যে কোনো রাগ শুনতে পাবেন। হ্যাঁ, আনন্দ আর হাসির সুর···আবার কান্নার সুরও। এই মানুষগুলোই প্রেমিক, এরা ভালোবাসে। আমি এদেরই 'সুর' বলি। ওই মেয়েটি ছিলো এদেরই একজন। এখন থেকে আমি এদের বাদ্যযন্ত্রই বলবো। কিন্তু প্রথমবার আমি যখন ওই মেয়েটিকে দেখি, তখন ও এতো ছিপছিপে আর সুন্দরী ছিলো যে কিছু না ভেবেই আমি ওকে 'সুর' বলে ডেকেছিলাম। ওর শরীরের হিল্লোল যেন তারযন্ত্রের ঝংকার। তার মানে আমি বলতে চাইছি যে ও শুধু একটা বাদ্যযন্ত্রই হতে পারে, কিন্তু বাদ্যযন্ত্র থেকে সুর বের করার মতো হাত হতে পারে না···বাদ্যযন্ত্র থেকে জন্ম নেওয়া 'ধ্বনি' হওয়ার ক্ষমতা ওর নেই।

ভারি সুন্দরী ছিলো মেয়েটি···আর বোকাও বটে। যারা ভালোবাসে, সাধারণত তারা বোকাই হয়। এরা নিজেদের ঐশ্বর্যের চাবিটা কোনো অপরিচিত লোকের হাতে তুলে দেয়। তারপর পাছে সেই লোকটা ওই ঐশ্বর্য থেকে ছোট্ট একটা মুদ্রা ব্যয় করে ফেলে, তাই চাবিটা অন্য কাউকে দেবার জন্যে মানুষ খুঁজে বেড়ায়। নিজেদের ঐশ্বর্যকে এরা কখনই ঐশ্বর্য বলে মনে করে না—এটাই এদের সৌন্দর্যের গোপন কথা···এই বোকামোর জন্যেই অন্যেরা এদের ভালোবাসে।

•

এক মিনিট আগেই আমি অন্য যে শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করেছি, তারা নিজেদের ভালোবাসায়। এরা অন্যদের ঐশ্বর্য নিয়ে নিজে সম্রাট। কথাটা এতো নরম করে বলতে

না চাইলে, আমি স্রেফ তিক্ত সত্যটুকুই বলে ফেলতে পারতাম—এরা হচ্ছে সত্যিকারের সাপ···ঐশ্বর্যের ওপরে বসে থাকা সাপ। এরা কারুর দেহ বা মনের ঐশ্বর্যকে ব্যয় করে না, অন্যদেরও করতে দেয় না। মেনে নিচ্ছি, এটাই প্রকৃত সত্য এবং ভারি তিক্ত সত্য। আপনি হয়তো আঘাত পাবেন, তাই ব্যাপারটা আমাকে একটু অন্যভাবে বলতে দিন। হ্যাঁ মশাই, এই অন্য ধরনের মানুষরাই হচ্ছে হাত যা বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধে। এদের যখন ইচ্ছে হয় তখন যন্ত্রগুলোর ধূলো ঝেড়ে হাতে তুলে নিয়ে সুর বাঁধে। আলতো আঙুলের ছোঁয়ায় যন্ত্রগুলো থেকে সুন্দর সুমিষ্ট সুর বের করে। ইচ্ছে হলে আনন্দের সুর বের না করে বিষাদের সুর সৃষ্টি করে। আবার যদি ইচ্ছে হয় তাহলে বছরের পর বছর যন্ত্রগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখে না। স্রেফ কোনো ধুলি ধূসরিত কোণে ওদের ফেলে রাখে, ভুলে যায় ওদের কথা। আর দুর্ভাগা যন্ত্রগুলো···ওরা তখন মৃতদেহের মতো পড়ে থাকে। তবে সাধারণ মৃতদেহের সঙ্গে এই যন্ত্রগুলোর একটা প্রভেদ আছে। শত কান্নাতেও সাধারণ মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসে না। কিন্তু এই মৃতদেহগুলো ভারি দুর্ভাগা। দুর্ভাগা তার কারণ, এদের মৃত্যু শুধুমাত্র একবারের জন্যে নয়—এদের মরতে হয় বারবার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছরও অবহেলায় পড়ে থাকার পর মালিক দয়া করে এদের স্পর্শ করলেই এই মৃহদেহগুলোতে আবার প্রাণ ফিরে আসে।

দুধরনের মানুষ আছে বলতে আমি কি বলতে চেয়েছি, তা এবারে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। মাঝে-মধ্যে এই মানুষগুলো যে নিজেদের ভূমিকা বদলে নেয় কিংবা নিয়তি যে ওদের ভূমিকাগুলোকে বদলে দেয়—তা কিন্তু আলাদা ব্যাপার। কি বলছেন? আমি? আমি এদের কোনো দলেই নেই। আমি কোনো বাদ্যযন্ত্র নই বা বাদ্যযন্ত্রকে স্পর্শ করার মতো হাতও নই। আপনি বা আমি তাহলে কি? অন্য অসংখ্য যন্ত্রের মতো আমরা মানুষ : আপনি, যিনি নিজের অবসর সময়ে অন্য একজনের অতীতের কাহিনী শুনছেন আর আমি, যে অন্য কারুর স্বরকে শোনার উপযোগী-করে-তোলার বা বাড়িয়ে তোলার স্রেফ একটা আকাশ-তার মাত্র। আমি ঠিকই বলেছি—আপনি আর আমি আলাদা ধরনের যন্ত্র, মানুষের মতো···আপনি অবসর সময়ে কারুর স্মৃতিচারণ শোনেন আর আমি কোনো বাদ্যযন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা শব্দকে শোনানোর উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করি। আমি ঠিকই বলেছি—নানান ধরনের যন্ত্রের মতো আপনি আর আমি মানুষ-যন্ত্র।

একজনের কাহিনী শুনতে শুনতে আপনি হয়তো বিষণ্ন হয়ে উঠবেন। অথবা আজকের রাতটা হয়তো আপনাকে না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে। কিন্তু আসছে কাল আপনি আবার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। এই পুরো কাহিনীটা ভুলে যাবার জন্যে আপনি একটা ঝাড় দেওয়া জামার মতো এটাকে ছেড়ে ফেলবেন। আর আমি...আপনার বা অন্য কারুর যখন ইচ্ছে হবে, তখন কাহিনীটা আপনাদের শোনাবার জন্যে আমি স্বরগ্রামের পর্দাটা উঁচু করে দেবো। কিন্তু কাহিনীর শেষটুকু আমি কিছুতেই বদলাতে পারবো না। আপনি যখন কাহিনীটা শুনে চলে যাবেন বা অন্য কেউ যখন কাহিনীটা শুনে চলে যাবে—তখন

এই সুরটা স্বরগ্রামের এই পর্দাগুলোকে আলিঙ্গন করার পর নিশ্চুপ হয়ে যাবে। আর আমি বাতাসে ঝুলে থাকবো একটা আকাশ-তারের মতো…

ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন। তাহলে দয়া করে শুনুন, সুরটা কি বলতে চাইছে। …এতে আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে?…

এক ছিলো অ্যানি আর এক ছিলো আনোয়ার। একদিন অ্যানির কালো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আনোয়ারের মনে হলো, অ্যানি তার জীবন-সমুদ্রের বেলাভূমি। বেলাভূমি সব সময়েই নিরাপদ জায়গা…মানুষ রোদের মধ্যে বেলাভূমির ভিজে বালিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারে, ঝিনুক নিয়ে খেলতে পারে, ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বাঁশের একটা খুঁটি পুঁতে মাথার ওপরে একটা ছাদও বানিয়ে ফেলতে পারে। বেলাভূমিটা তার স্ত্রী, ছাদটা তার বাড়ি আর ঝিনুকগুলো তার সন্তান।

আনোয়ারের এ সব কিছুই ছিলো। অ্যানি তার স্ত্রী, বম্বের ওরলিতে তার তিন ঘরের ফ্ল্যাট আর সাত বছরের ছেলে সালাম। কিন্তু জীবন-সমুদ্রে সে আরও কিছু দেখতে পেয়েছিলো এবং সেটা তাকে এমন রোমাঞ্চের অনুভূতিতে ভরিয়ে তুলেছিলো যে বেলাভূমির কাছে আসতে বাধ্য হলেও সে সেখানে যেতে চাইছিলো না।

আনোয়ার তার সচিব লিজের বিছানা থেকে উঠতে যেতেই লিজের দু-চোখের নীল রঙ এমনভাবে ঘরের পর্দাগুলোতে ছড়িয়ে পড়লো যে এক বিচিত্র অনুভূতিতে আনোয়ারের সমস্ত চেতনা ভরে উঠলো। তার মনে হলো, সে যেন এক মহাসমুদ্রে সাঁতার কাটছে আর ডুবে যাচ্ছে—তাকে ঘিরে এক ভয়ংকর অতলান্ত জলরাশির নিতল গভীরতা।

লিজের বিছানায় শুয়ে আনোয়ারের কখনও মনে হয় নি, সে কোনো রমণীর শয্যায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। লিজের ছিপছিপে ফর্সা বাহু অথবা ওর উন্নত স্তন দুটির স্পর্শে তার মনে হয়েছে, সমুদ্রে সাঁতার-কাটা নরম মাছেরা তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই মাছগুলোকে সে কোনো বেলাভূমিতে নিয়ে যেতে চায়নি—হয়তো সচেতন অথবা অচেতন মনে সে জানতো, মাছ ডাঙায় উঠলে মরে যায়।

অ্যানির কাছে থাকলে আনোয়ার তীরভূমিকে ঘৃণা করতো না, কিন্তু ঈর্ষা করতো সামান্যই। তখন তার মনে হতো, যদিও সে তীরের দিকে এগিয়ে চলেছে, তবু সে তীরে যেতে চায় না। তখন তীরভূমি স্পর্শ করতে যাওয়া মানুষের মতো সে সমুদ্রের জলে দাঁড়িয়ে রহস্য করতো—তার মানে, অ্যানিকে জিগেস করতো: 'ধরো, আমি যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই…'

নিশ্চল বেলাভূমির মতো অ্যানি তখন নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকতো। আনোয়ারের মনে হতো, অ্যানি ওর কথাগুলো শোনেনি। কিংবা শুনলেও গুরুত্বটা বুঝতে পারেনি।

আনোয়ার নিজেকে যুক্তি দেখায়: তীরভূমিতে ভয় নেই, কিন্তু তীরভূমি পেরিয়ে গেলে

ভয় আছে। কিন্তু সে জানে, আসল সত্যটা তার এ যুক্তির চাইতে বড়ো। আসল সত্য হচ্ছে : মেয়েরাই জীবনের তীরভূমি···যে সব মুসাফির তীরে আশ্রয় নিতে চায়, তীরভূমি তাদের ভয় পায়···মুসাফির ততোটা ভয় পায় না, যতোটা ভয় পায় তীরভূমি।

জীবনের দশটা বছর অ্যানির সঙ্গে কাটিয়েছে আনোয়ার। অ্যানি যখন তার প্রেমে পড়ে তখন ওর বয়েস পনেরো বা ষোলো। আনোয়ার তখন সাধারণ এক সুদর্শন যুবক, কলেজে-পড়া ছাত্র। কিন্তু অ্যানির প্রেম তাকে অসাধারণ করে তুলেছিলো, তার ছেলেমানুষীকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলো পূর্ণ পৌরুষত্বে। আনোয়ার জানতো, অ্যানির বড়োলোক বাবা-মা তাকে কোনোদিনও মেনে নেবেন না। তাই সে অ্যানির প্রেমকে সরাসরি আক্রমণ করে বলেছিলো, 'বাবা-মাকে ছেড়ে চুপিচুপি আমার কাছে চলে আসার মতো সাহস তোমার কোনোদিনও হবে না।' অ্যানির মনটা ওর দৈহিক সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে এতো দূর এগিয়ে গিয়েছিলো যে ও কখনও সে আক্রমণের মুখে নিজেকে গুটিয়ে নেয়নি কিংবা স্বীকার করে নি যে ও কোনো বিপদকে বরণ করে নিতে পারবে না।

তারপর একদিন রাত্রিবেলা অ্যানি আনোয়ারের ছাত্রাবাসের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলেছিলো, 'আনোয়ার, তুমি বলেছিলে আমি কোনোদিনও আসতে পারবো না।' তখন অ্যানি নয়, আনোয়ারই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলো। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিলো অ্যানি। আর আনোয়ার তখন এতোই বিভ্রান্ত যে সে অ্যানির মুখের ওপরেই দরজাটা অর্ধেক বন্ধ করে একটা কুর্সির হাতলে নিজের মাথাটা নামিয়ে রেখেছিলো। প্রচণ্ড বিচলিত হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো সে। শত হলেও, অ্যানিকে নিয়ে তোলার মতো তার কোনো ঘর-দোর নেই—রোজগার করার মতো নেই কোনো চাকরি।

এক বন্ধু তখন সাহায্য করেছিলো আনোয়ারকে। ওদের ভালোবাসার ব্যাপারটা সে প্রথম থেকেই অনুমান করে নিয়েছিলো। অ্যানিকে সে তখন ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়, আনোয়ারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে, তারপর অ্যানির মা-র সঙ্গে দেখা করে এ বিয়েতে অনুমতি দেবার জন্যে বারবার করে তাঁকে অনুরোধ জানায়। অবশেষে বিয়েটা হয়ে গেলো, অ্যানির বাবা-মা আনোয়ারের পড়াশুনোর সমস্ত খরচ জোগাবেন বলে কথা দিলেন। শীঘ্রিই আনোয়ারের পড়াশুনো শেষ হলো। নিজের সংসার সে নিজেই চালাতে শুরু করলো। কিন্তু আনোয়ারের জন্যে অ্যানি এবং ওর বাবা-মার মধ্যে যে ফাটলের সৃষ্টি হলো, তা আর কোনোদিনও মিলিয়ে গেলো না। নিজেদের জন্যে অ্যানি বাবা-মার কাছ থেকে যেটুকু সাহায্য নিয়েছিলো, তা সবই যেন তাঁদের কাছে ওর ঋণের পরিমাণটাকে বাড়িয়ে তুললো। আনোয়ারের সঙ্গে ওর বিয়ের অর্থ হলো, অনেক মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা। এখন আনোয়ার স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এখন আনোয়ার শুধুমাত্র ওর একার —এখন ও আর কিছুতেই বাবা-মার কাছে সাহায্যের হাত পাতবে না।

বহুবার নিজের বাহুবন্ধনে লীন হয়ে থাকা অ্যানিকে আনোয়ার ঠাট্টা করে জিগেস

করেছে, 'আচ্ছা, আমি যদি ভালো-মানুষটি না হতাম, যদি বিয়ের ঠিক পরেই তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম, তাহলে তুমি তখন কি করতে ?'

প্রথমে একটা ভিজে বেড়ালের মতো, তারপর আনোয়ারের আলিঙ্গনের গভীরে একটা ফুলের তোড়া হয়ে উঠে অ্যানি জবাব দিয়েছে, 'তাহলে আমি মরে যেতাম।'

যে অ্যানি পৃথিবীর সব কিছুকে পেছনে ফেলে রেখে তার ছাত্রাবাসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলো, তাকে আনোয়ার ভয় করতো। কিন্তু সে অন্য অ্যানিকে ভালোবাসতো—যে অ্যানি ভিজে বেড়ালটির মতো, যে অ্যানি তার বাহুবন্ধনে একটা ফুলের তোড়া হয়ে ওঠে। হয়তো মাঝে মাঝে সে ভাবতো, যে মেয়ে স্বেচ্ছায় তার স্ত্রী হয়েছে তাকে ভয় করা অথচ তার দুর্বলতাগুলোকে ভালোবাসা, কোনো পুরুষমানুষের পক্ষে খুবই আশ্চর্যজনক। অ্যানি যখন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো, তখন নিজের মনের গভীরে সে হয়তো এটাই চিন্তা করেছিলো। তখনকার সেই পরিস্থিতিটাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আর এখন সেই লজ্জাজনক মুহূর্তটাকে ভোলার জন্যে কিংবা লুকিয়ে রাখার জন্যে সে এই সমস্ত অদ্ভুত প্রশ্ন তুলে নিজের সাহসিকতার প্রমাণ দিতে চায়।

হয়তো আজও নিজের কাছে লজ্জা লাগছিলো আনোয়ারের। সে অন্য এক নারীর সঙ্গে শুয়ে অ্যানির কাছে তার বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করেছে, যদিও এখন পর্যন্ত সে জন্যে তার কোনো অনুতাপ নেই। তবু মনের গভীরে কোথায় যেন লজ্জার একটা তীব্র দংশন। হয়তো সেই লজ্জাকে ভুলে যাবার জন্যেই, কিংবা সেটাকে লুকোবার জন্যেই আনোয়ার ওকে জিগেস করলো, 'আমি যদি তোমাকে ছেড়ে চলে যাই, তাহলে তোমার কি হবে ?'

আনোয়ার ভাবছিলো, অ্যানি তার আলিঙ্গনের মধ্যে ফের একটা ফুলের তোড়া হয়ে উঠবে···তার গলায় নিজের উষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শ বুলিয়ে ও আকুল উদ্বেগে বলবে, 'তাহলে আমি মরে যাবো !' তখন আনোয়ার দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরবে, ওর ঠাণ্ডা ঠোঁট দুটিতে চুমু দেবে, ওর অসাড় হাত দুটোকে ধরে রেখে ওকে মরতে দেবে না.. এবং...এবং মৃত্যু ও জীবন-রক্ষার এই দ্বন্দযুদ্ধের মাঝখানে যখন অ্যানির চোখের গভীরে সে নিজের গুরুত্বকে ফুটে উঠতে দেখবে, তখনই তার এই কলঙ্কটুকু উধাও হয়ে যাবে।

ফের ওর কালো চোখ দুটির দিকে তাকালো আনোয়ার। কিন্তু অ্যানির চোখ দুটি আনত বা বিহ্বলতায় ভরা নয়।

সামান্য আতংকিত হয়ে আনোয়ার ফের বললো, 'আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সত্যি সত্যিই কথাটা চিন্তা করছি।' আনোয়ারের মনে হলো, সে যতোটুকু বলেছে তা যথেষ্ট হয় নি। তাই অ্যানিকে বিষয়টার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে সে আবার বললো, 'আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, সত্যি। কিন্তু সেটা ছিলো স্রেফ একটা ছেলেমানুষী···বাল্যপ্রেম··· এখনও আমি ··'

কথাটা শেষ করলো না আনোয়ার। কারণ সে কি বলবে তা ভেবে পাচ্ছিলো না।

সে কি বলবে যে এখনও সে ওকে ভালোভাসে ? না কি বলবে যে এখনও সে একজন দায়িত্বশীল স্বামী ? আনোয়ার অনুভব করলো তার জিভটা জড়িয়ে গেছে। না, জিভটা নয় —জড়িয়ে গেছে তার চিন্তাগুলো।

'যা-ই হোক না কেন, আমি মরে যাবো না।' অ্যানির জবাবটা একেবারে স্পষ্ট এবং সরাসরি। তবু আনোয়ার যেটুকু শুনেছে তা বিশ্বাস করতে পারলো না। বিবর্ণ হয়ে অ্যানির দিকে তাকালো সে।

'কি বললে ?'

'যা-ই হোক না কেন, আমি মরে যাবো না,' পুনরাবৃত্তি করলো অ্যানি।

'কিন্তু তখন তুমি করবে-ই বা কি ?' আনোয়ারের মুখ থেকে একটা বিচিত্র প্রশ্ন বেরিয়ে আসে। অ্যানির জবাবটা তাকে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড বিচলিত করে তুলেছিলো। তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার পর অ্যানি যদি না মরে, তাহলে আর কি করবে ?

অ্যানির দিকে তাকিয়ে আনোয়ারের মনে হলো, গত দশ বছর ধরে যে অ্যানিকে সে দেখছে, এ অ্যানি সে নয়। তার সামনে এখন এক ভিন্ন অ্যানি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারপরেই তার মনে হলো, এই অ্যানিকে সে আগেও দেখেছে—একবার—যখন পনেরো ষোলো বছর বয়সে একদিন রাত্রিবেলা ও তার কাছে এসে হাজির হয়েছিলো। হয়তো এই অ্যানিকে তার জানার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তবু মনে মনে সে সুনিশ্চিত ভাবে জানতো, তার কাছে এসে অ্যানি যে সাহস দেখিয়েছিলো, সেটা তাকে ছেড়ে যাবার প্রয়োজনেও ওর কাজে লাগতে পারে।

অ্যানির সৌন্দর্যটা একটু অদ্ভুত ধরনের। ওর গায়ের রঙ ফর্সা নয়, কিন্তু প্রতিটি অঙ্গই সুগঠিত। কপালের ওপরে লুটিয়ে থাকা গুঁড়োগুঁড়ো চুলগুলো কোনো শাসন মানে না। আয়ত কালো চোখ দুটিকে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন মাথার চুল থেকে নেমে আসা উজ্জ্বল দুটি আধখানা চাঁদ। আনোয়ারের ভারতীয় আর বিদেশী বন্ধুরা অ্যানিকে দেখে অবাক হয়ে যায়। অনেকেই মন্তব্য করেছে, 'ঐতিহাসিক রূপ।' এবং এই মন্তব্যটাই অ্যানির অন্য একটা নাম হয়ে গেছে।

অ্যানির দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা আর উত্তেজনায় টানটান হয়ে থাকা শরীরটার দিকে তাকিয়ে ওকে সেই নামেই ডাকতে ইচ্ছে করলো আনোয়ারের। 'ঐতিহাসিক রূপ।' মৃদু হাসলো আনোয়ার। তার মনে হলো, বাইরের পৃথিবীর চাপে এখানকার সমস্ত উত্তেজনাই উধাও হয়ে যাবে।

'ঐতিহাসিক নয় ..প্রাগৈতিহাসিক', জবাব দিলো অ্যানি।

আনোয়ার অনুভব করলো, প্রথম নামটার যতো মূল্যই থাক না কেন, দ্বিতীয়টা আরও ব্যাপক। এই শেষ নামটা উত্তেজনাকে কমায় নি, বরং তার একটা অংশ হয়ে গেছে।

অ্যানির মুখ থেকে এমন কথা এই প্রথম শুনলো আনোয়ার। তার মনে হলো, অ্যানির

বয়েস যেন দশ বছর কমে গেছে। ও সত্যিই প্রতিটা ছোটোখাটো প্রাত্যহিকতা আর রীতিনীতি থেকে মুক্ত এক প্রাগৈতিহাসিক নারী।

'অ্যানি…' ওকে ডাকার জন্যে নয়—ওর নামটা নিজের সামনে রেখে, কথাটা বোঝার জন্যে ওর নামটা উচ্চারণ করলো আনোয়ার। কিন্তু খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলো না। তার মনে হলো, সমস্ত বোঝাপড়াই অর্থহীন।

তার মনে পড়লো, দশ বছর আগে অ্যানি এক স্বাস্থ্যবান সুদর্শন আনোয়ারের প্রেমে পড়েছিলো। সেই আনোয়ার আজও এখানে আছে—এখন তার শরীর আরও সুগঠিত, আরও পুরুষালি। তাই সে ভেবেছিলো, আজ এই মানুষটাকেই সে অ্যানির কাছে তুলে দিয়ে দুজনের শরীরের মিলিত উত্তাপে সবকিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

কিন্তু আনোয়ার উদ্বিগ্ন হয়ে অনুভব করলো, অ্যানিকে কাছে টেনে নেবার কোনো আকাঙ্ক্ষাই তার নেই। উষ্ণতাটুকু কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। এক ধরনের অসাড়তা তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শীঘ্রই সেটা তার মনেও পৌঁছে যাবে।

নিভে-যাওয়া-আগুনে ইন্ধন জোগানোর মতো আনোয়ার অতীতের সেই সমস্ত প্রহরগুলোর কথা মনে আনার চেষ্টা করলো, যখন পোশাক ছাড়ার সময় অ্যানির অনাবৃত শরীরটা তাকে লোভাতুর করে তুলতো। আনোয়ারের শিল্পী সত্তাটা জেগে উঠতো তখন। ছবি-আঁকাটা ছিলো তার পাগলামো। সেই সমস্ত মুহূর্তে কাগজের বুকে পেন্সিল বুলিয়ে সে রেখাচিত্রে অ্যানির শরীরটাকে ধরে রাখতো। তারপর শিল্পের উত্তাপ তার বাসনার উষ্ণতাকে জাগিয়ে তুলতো। কাগজ-পেন্সিল ফেলে রেখে তখন অ্যানিকে জড়িয়ে ধরতো আনোয়ার। সেই সময়গুলোর কথা মনে করে এখনও সেই একই বাসনা অনুভব করলো সে। কিন্তু মুশকিল হলো, আজ কোনো কিছুই তার ভেতরে কোনো চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলতে পারছে না।

আনোয়ারের মনে পড়লো কতো সময় সামান্য একটু অবহেলা, সামান্য রাগারাগি, অলস্বল্প উত্তেজনা, এমন কি সন্ধ্যার সময় বাড়িতে ফিরতে একটু দেরি হলেও অ্যানি এতো উতলা হয়ে উঠতো যে ও তখন প্রায় একটা ফুলের তোড়া হয়ে তার পাশে শুয়ে থাকতো। সেই সমস্ত মুহূর্তের কথা মনে করে আনোয়ার আবার উত্তেজনা অনুভব করলো।

অ্যানির দিকে তাকালো সে। অ্যানি রাঙা হয়ে ওঠে নি, ওর বাহুদুটিও তাকে জড়িয়ে ধরার জন্যে উদগ্রীব বলে মনে হয় না। সামান্য একটু জল ছিঁটিয়ে দিলেই যেমন আগুনের উত্তাপ কমে যায়, তার ভেতরকার উষ্ণতাটুকুও তেমনিভাবে মরে গেছে। ঘরের দেয়ালগুলোর দিকে তাকাতে শুরু করলো আনোয়ার।

দেয়ালগুলো শূন্য। ওখানে কিছু থাকলে তা কিছুক্ষণের জন্যে আনোয়ারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতো। কিন্তু শূন্য দেয়াল বড়ো ভয়ংকর জিনিস। শূন্য দেয়ালে এতো

অজস্র ভাবনা জেগে ওঠে যে তা দর্শককে উন্মাদ করে তোলে। নিজের চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে আনোয়ারও তাই চোখ ফিরিয়ে অ্যানির দিকে তাকায়। অ্যানি কখনও এমনটি ছিলো না। ও এখন নিজেই নিজেকে সামলে রেখেছে। একটা চকিত ঘৃণার উষ্ণ ঝলক এসে আঘাত করেছে আনোয়ারকে।

এই প্রথম অ্যানির প্রতি ঘৃণা অনুভব করলো আনোয়ার। না, সম্ভবত দ্বিতীয়বার। তার মনে হলো, তার আহ্বানের জবাবে অ্যানি যখন তার ঘরে এসে হাজির হয়েছিলো, তখনই সে প্রথম এটা অনুভব করেছিলো। হয়তো তখন নিজেকে সামান্য হতচকিত বলে মনে হয়েছিলো তার। কিন্তু এখন তার মনে হয়, সেদিনের সেই বিভ্রান্তির মধ্যে ঘৃণাও মিশে ছিলো অনেকখানি।

মানুষ অযৌক্তিকভাবে কাজকর্ম করলেও তাতে সর্বদাই কোনো না কোনো ভাবে কিছু যুক্তি জড়িত হয়ে থাকে। আনোয়ারও সেটা অনুভব করে নিজেকে প্রশ্ন করে, কেন তুমি অ্যানিকে ঘৃণা করো, কেন?

নিজের কাছ থেকে আনোয়ার সর্বদাই জবাব পায়—তার ঘৃণা অ্যানির প্রতি নয়… অ্যানির যে অংশটুকু দুর্বল নয়, তার ঘৃণা সেই অংশটুকুর প্রতি। ওর যে অংশটুকু দুর্বল, তাকে সে চিরদিনই ভালোবেসেছে, আজও বাসে। অথচ আনোয়ার জানে না, তার এ জবাবটা ঠিক না বেঠিক।

এবং এই সমস্ত কিছু অসহায়তার মধ্যে অ্যানির সেই দুর্বল অংশটুকুকে উত্তেজিত করে তোলা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই—যে দুর্বলতা অ্যানিকে তার কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য করেছিলো। আনোয়ার ভালোভাবেই জানে, অ্যানিকে সে যদি আদর-সোহাগে ভরিয়ে তোলে, তাহলে ও আবার সেই আগেকার অ্যানি হয়ে উঠবে। তখন সে ওর মনে প্রত্যয় জাগিয়ে তুলবে, অনেক কিছু প্রতিশ্রুতি দেবে আর মার্জনা চেয়ে নেবে ওর কাছ থেকে।

শক্তি ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্বলতাও ঘুমিয়ে পড়ে। তাই এই দুয়েরই ঘুম ভাঙানো শক্ত। আনোয়ার অনেক বারই এ সব কথা চিন্তা করেছে। তারপর কিছুক্ষণ ভাবনা-চিন্তা করে অ্যানিকে জিগেস করেছে, 'আচ্ছা অ্যানি, তোমার কি মনে হয়? একজন পুরুষ কি একটি মাত্র নারীকেই ভালোবাসতে পারে? এবং তা-ও কি শুধু একটি বারের জন্যে? এমনও তো হতে পারে যে সে অন্য এক সময়ে অন্য একটি নারীকে ভালোবাসতে শুরু করলো?'

'হতে পারে…মূল্যবোধ বদলে যায়…সমতাও…'

'ধরো, আমি যদি সত্যি সত্যি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে শুরু করি…'

'আমি তোমার পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবো না।'

'কিন্তু তুমি…'

'আমি তখন শুধু তোমার বন্ধুই হতে পারি, বাধা নয়।'

আনোয়ারের মনে হলো, অ্যানির এই জবাবগুলো নেহাতই এক ধরনের গতানুগতিক আদর্শবাদীতার ফলশ্রুতি। এটা অ্যানি নয়—কোনো এক উপন্যাসের একটা চরিত্র এই কৃত্রিম সংলাপগুলোকে আউড়ে চলেছে।

আনোয়ার ওকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো, জাগাতে চাইলো জীবন্ত অ্যানির স্পন্দিত হৃদয়টাকে। আরও গম্ভীর হয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'আমি যদি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করি?'

'সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, তোমার সেটাই করা উচিত।'

'কিন্তু একটা কথা…'

'বলো—'

'বাচ্চাটাকে আমি নিজের কাছে রাখবো।'

আনোয়ার ভেবেছিলো, তার এই শেষ কথাটা অ্যানির সব চাইতে কোমল অংশে একটা সুচের মতো বিঁধবে। সে স্থির নিশ্চিত ছিলো, সে এমন একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছে যেখান থেকে সে ওকে ভেঙে ফেলতে পারবে।

'ও যদি ওর বাবার কাছে একটা নিরাপদ আশ্রয় পায়, তাহলে আমি খুশিই হবো.' কথাটা বলেই অন্য ঘরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো অ্যানি। ও উঠে দাঁড়াতেই আনোয়ার সন্ধানী চোখে ওর দিকে তাকালো। অ্যানির মুখে আবেগের কোনো চিহ্ন নেই, অশ্রু নেই, অভিযোগ নেই—শুধু অবসাদের ক্ষীণ ছায়া।

আনোয়ারের ফের মনে হলো, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে সে ভুল পথে এগিয়েছে। একে একে তার সেই সমস্ত অসংখ্য মুহূর্তের কথা মনে পড়লো, যখন অ্যানির কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবার বাসনায় সে বারবার ওকে পীড়াপীড়ি করেছে। অথচ নিজের ইচ্ছে-গুলোকে অ্যানি চিরদিনই চেপে রেখেছে, কোনোদিনই মুখ ফুটে কিছু বলেনি। আজ কোনো কারণে আনোয়ারের যদি রাগ হয়ে থাকে, তবে অ্যানিই প্রথমে সে রাগটাকে জাগিয়ে তুলেছে। আনোয়ারের মনে হলো, মাঝে-মধ্যে মেয়েদের কথাও শোনা উচিত। তাহলে সে-ও অ্যানির উদ্ধত মানসিকতাকে তরল করে দিতে পারতো।

এক দুর্বল মুহূর্তে অ্যানির হাতটা শান্তভাবে চেপে ধরলো আনোয়ার।

'আমি এতোটা খারাপ ছেলে নই, অ্যানি।'

'জানি।'

'আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে আঘাত দিতে চাই না।'

'আনোয়ার, তুমি কোনোদিনও আমাকে আঘাত দাও নি', উষ্ণ আর আন্তরিক সুরে বললো অ্যানি।

আনোয়ারের মনে হলো, অ্যানি এখন যা কিছু বলছে তা সবই বলছে অনেক দূর

থেকে—অনেক দূর থেকে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও এবং সে নিজে যা, হয়তো তার চাইতেও ভালোভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছে অ্যানি।

আনোয়ার নিজেকে চেনাতে চাইছিলো—কিন্তু শুধু একটা পাশ থেকে, সমস্ত দিক থেকে নয়। তাই সে বিরক্ত হয়ে উঠলো। একটু পেছিয়ে গিয়ে বললো, 'তুমি কাঁদছো না বা ঝগড়া করছো না বলে আমি খুশি হয়েছি।' অতীতে অ্যানির কান্নাকাটি এবং ঝগড়া-বিবাদকে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই কথাটা বললো সে।

'আমি যখন কাঁদতাম, তখন নিজেকে আমার ভালো লাগতো না। পরে আমি সর্বদাই সে জন্যে নিজেকে ঘৃণা করেছি। এখন নিজেকে ঘৃণা করতে চাই নে।' অলক্ষিতে আনোয়ারের চোখের দিকে তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো অ্যানি।

আনোয়ার ভাবছিলো, অবসাদের চিহ্ন মুছে গিয়ে ওঘরে এখন হয়তো অ্যানির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। আনোয়ারের ধারণা, ঝলমলে উজ্জ্বল মুখের অ্যানিকে সে কোনো-দিনই ভালোবাসেনি—বাসবেও না কোনোদিন। সে শুধু সেই অ্যানিকেই ভালোবেসেছিলো—যে একদিন চুপিচুপি তার কাছে এসে হাজির হয়েছিলো, বাবা-মার নিষ্ঠুর ব্যবহারে যে কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো, বাবা-মাকে রাগিয়ে দিয়ে যে তাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতো, তাকে হারাবার ভয়ে যে ভীরু হয়ে থাকতো সর্বক্ষণ।

আনোয়ারের মনে হলো, কয়েক মুহূর্ত আগেই সে অ্যানির কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছিলো। হয়তো অনুযোগ জানাবার জন্যেই তখন সে কথাটা তুলেছিলো, কিন্তু এখন সে সত্যি সত্যিই ওর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চায়। অথচ অ্যানি বলেছে, আনোয়ার সে সুযোগ পাবার আগে অ্যানি নিজেই বিয়ে ভেঙে দিতে চায়। তাই আনোয়ার যা বলেছে, ঠিকই বলেছে।

সেদিন রাতে স্বাভাবিকের চাইতে আরও বিশদভাবে খাওয়া-দাওয়া সারা হলো। সঙ্গে ছিলো ফুল আর মোমবাতি। আনোয়ারের মনে হলো, আজ তার ব্যভিচারের উৎসব পালন করা হচ্ছে। একটা ফরাসী উপন্যাস থেকে কথাটা তার মনে হলো। ওই উপন্যাসের নায়িকা একটা বিশেষ কেক কিনে এনে স্বামীকে কেকের খানিকটা অংশ খেতে বলে এবং জানায় এটা তার প্রথম ব্যভিচারের উৎসব-অনুষ্ঠান।

এক টুকরো কাবাব নিজের মুখে পুরে দিলো আনোয়ার। তারপর আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললো, 'শুধু এক ফরাসী মহিলা কিংবা একটি অ্যানিই এ ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে। তবে ফরাসী মহিলাটির সঙ্গে তোমার একটা পার্থক্য রয়ে গেছে, অ্যানি। ফরাসী মহিলা নিজের ব্যভিচারের উৎসব পালন করতে পারে, আর অ্যানি পারে স্বামীর। পার্থক্য দীর্ঘজীবী হোক! অ্যানি এক ভারতীয় নারী!'

অ্যানি কোনো জবাব দেয় না। আনোয়ার লক্ষ্য করে ও কি প্রচণ্ড আকর্ষণীয়া। হয়তো

দীর্ঘদিন বাদে এই প্রথম এটা সে লক্ষ্য করলো। তারপর কিছুক্ষণ আগেকার মন্তব্যটা পুনরাবৃত্তি করলো সে, 'ঐতিহাসিক রূপ।'

'প্রাগৈতিহাসিক,' নরম গলায় বললো অ্যানি। যেন লাল পেন্সিলে শুধরে দিলো কথাটাকে।

আনোয়ারের মনে হলো সে ওই কাল্পনিক লাল পেন্সিলটাকে তুলে নিয়ে তার অবিশ্বস্ততার প্রথম বর্ণটাকে কেটে দেবে, যাতে সে চিরদিন অ্যানির বিশ্বস্ততা দাবী করতে পারে। কিন্তু এটা এক ধরনের বিলাসমাত্র। এ ধরনের আবেগ সে কখনই অনুভব করে না। তার মনে হয়, এ ধরনের আবেগ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নিজের পা দুটোকে কোনো শক্ত পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখবে। পাথরটা তার সংলাপ, 'অ্যানি তুমি কিন্তু জানতে চাও নি, অন্য মেয়েটি কে।'

আনোয়ার ভেবেছিলো অ্যানির জিজ্ঞাসু চোখের সামনে সে নিজের অসাধারণ রূপের ছবিখানা তুলে ধরবে। ভাবছিলো, ওকে স্পর্শ করার অনুভূতিটাও সে বর্ণনা করবে কি না। কিন্তু কিছুই বললো না।

অ্যানি উদাস চোখে তার দিকে তাকালো, 'আমার সত্যিই কোনো আগ্রহ নেই।'

আনোয়ার একটা পাথরের সাহায্য চেয়েছিলো, এখন পাথরটার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। আনোয়ারের মনে হলো, শুধু একটা মহাসমুদ্রই পারে এই পাথরকে ভাসিয়ে নিতে—তার নিজের সে ক্ষমতা নেই। তারপরেই মনে আসে নিজের কথা…ওর দুটি নীল চোখ, যার ভেতর থেকে সমুদ্র-নীল রঙ উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের পর্দাগুলোতে।

সেই রাতটা আনোয়ার বাড়িতে কাটায়নি, কাটিয়েছিলো নিজের কাছে। শুধু সেই একটা রাত। তারপর থেকে নিজই আনোয়ারের বাড়িতে আসতে শুরু করে। কারণ ওর সঙ্গে সেই একটা রাত কাটাবার পর বাড়িতে ফিরে এসে আনোয়ার দেখতে পায়, অ্যানি তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

কোনো চিঠি বা খবরের মাধ্যমে আনোয়ার কথাটা জানতে পারেনি, কারণ অ্যানি তেমন কিছু রেখে যায়নি। তবে বাচ্চাটাকে রেখে গিয়েছিলো, যেটা এক ধরনের চিঠিই বটে…এক বিচিত্র চিঠি, যার বিষয়বস্তু আনোয়ারের কাছে একেবারে নতুন, যা তাকে প্রতিদিন পড়তে হবে। অ্যানির ঠোঁট বাচ্চাটার গালে একটা নরম চিহ্ন রেখে গিয়েছিলো, ওর চুমুর চিহ্ন। চিহ্নটা বাচ্চাটার তন্দ্রায়, স্বপ্নে, এতো গভীরে চলে গিয়েছিলো যে আনোয়ার সে গভীরতার তল খুঁজে পায়নি। সেদিনই সে বাচ্চাটাকে স্কুলের ছাত্রাবাসে পাঠিয়ে দেয়।

গুজব যতো দ্রুত ছড়ায়, রাস্তার মানুষ ততো দ্রুত কথা বলে না। আনোয়ার শুনতে পেলো, অ্যানি কর্মরতা মেয়েদের একটা ক্লাবে বাস করতে শুরু করেছে, ও একটা অফিসে চাকরি করে এবং তারপর শুনলো, সে চাকরি ও ছেড়ে দিয়েছে। বাবা-মা ওকে ফিরিয়ে নিতে

এসেছিলেন, কিন্তু অ্যানি তাঁদের ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর এক ভাইও ওকে লণ্ডনে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। আনোয়ার আরও শুনলো, অ্যানি গভীর রাত অব্দি নৈশ ক্লাব-গুলোতে বসে থাকে। তারপর শুনলো, কে একজন ওকে একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে।

আনোয়ারের বিশেষ অনুরোধে একদিন তার মাসতুতো বোন সুলতানা তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। অ্যানির সঙ্গে ওর বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো। সুলতানা কিন্তু অ্যানির সম্পর্কে কিছুই বললো না। অতএব তিরস্কারের ভঙ্গিতে আনোয়ারকেই প্রসঙ্গটা তুলতে হলো। কারণ সে সন্দেহ করেছিলো, সুলতানা নিয়মিত অ্যানির সঙ্গে দেখা করে।

'হ্যাঁ, আমি ওর সঙ্গে দেখা করি। গতকালও দেখা করেছি।' খানিকটা অসতর্ক ভঙ্গিমায় কথাটা বলে সুলতানা ফের নিশ্চুপ হয়ে রইলো।

'লোকে ওর সম্পর্কে নানান কথা বলে,' বিরক্ত হয়ে ফের আলোচনাটা শুরু করলো আনোয়ার।

'বলতে দাও,' সুলতানা নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় জবাব দিলো।

আনোয়ার নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না। সুলতানা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, সে ওকে আরও খানিকক্ষণ থাকার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগলো। আনোয়ার যখন বললো, 'দোহাই তোমার, কেন তুমি আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছো না ?'—তখন স্পষ্টতই সে খুব বিরক্ত।

সুলতানা হাসলো, 'ওকে বোঝানো যায় না রে ,ওকে বুঝতে হয় !'

আনোয়ারের মনে হলো, কে যেন তাকে সপাটে চড় মেরেছে। সুলতানা নয়, মেরেছে সময়। নিজের মাথাটা সে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিলো। হয়তো করুণা-পরবশ হয়েই সুলতানা তখন ফের বসলো। বললো, 'বলো তুমি কি জানতে চাও। তুমি যা জানতে চাও আমি তার যতোটুকু জানি, তোমাকে বলতে চেষ্টা করবো।'

'ও কি মেয়েদের ক্লাবটাতে থাকে ?'

'কিছুদিন ছিলো, এখন আর থাকে না।'

'ও কি কোনো চাকরি করে ?'

'হ্যাঁ, করতো। এখন করে না।'

'কেন ?'

খানিকক্ষণ আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকে সুলতানা। তারপর মৃদু হেসে বলে, 'আমি ওকে তা জিগেস করিনি। তবে অফিসের বড়োকত্তার সঙ্গে ও সম্ভবত কোনো নিজের ভূমিকায় অভিনয় করতে চায় না।'

আনোয়ার এখানেই বিষয়টাকে শেষ করে দেয় না। সুলতানার জবাবটাকে নিঃশব্দে গিলে নিয়ে বলে, 'সম্ভবত কোনো ধনী ব্যক্তি ওকে কোনো ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলেছে, তাই ও চাকরি করছে না।'

'ধনী ব্যক্তি নয়...মহিলা। ওর দিদিমা ইন্দোরের বাড়ি বিক্রি করে বম্বেতে একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। তিনি ওটা অ্যানির নামেই উইল করে দিয়েছেন।'

'কিন্তু ওতো ওর বাবা-মার সঙ্গে থাকে না। একা থাকার ব্যাপারটাকে ও সমর্থন করবে কি করে?'

'কারণ ও জিজ্ঞাসু চোখ আর জিভের মাঝখানে বেস্টিত হয়ে থাকতে চায় না। তা ছাড়া ওর বাবা-মা ওর জন্যে কি-ই বা করতে পারবেন? তাঁরা শুধু ওকে উপদেশ দিতে আর যুক্তি দেখাতে পারেন। অ্যানি কোনো উপদেশ, যুক্তি, করুণা, আশ্রয়—কিছুই চায় না!'

'সারাটা দিন একা একা ও কি করে?'

'একদিন ওর টেবিলের ওপরে ওর ডাইরীটা খোলা অবস্থায় পড়ে ছিলো. আমি চুরি করে একটা পৃষ্ঠার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েছিলাম। তাতে অনেকটা এই ধরনের কিছু লেখা ছিলো: 'আজ অব্দি এমন কোনো সত্যিকারের ব্যক্তিবিশেষ জন্মায় নি, যে বাঁচতে এবং মরতে পারে'। সম্ভবত ও একটা গবেষণা করছে—বিষয়টাকে বলতে পারো, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ'।'

আনোয়ারের মনে হলো, সে যেন অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেলেছে। আধো জাগা অবস্থায় সে সুলতানাকে প্রশ্ন করলো, 'কিন্তু লোকে যে বলে, ও প্রতি রাতে নাইট ক্লাবে গিয়ে বসে থাকে?'

'থাকে বই কি! একটা নাইট ক্লাবে ওর হাতে ছাপা ব্লাউজ আর শালের প্রদর্শনী চলছে। ও নিজের বাড়িতেও একটা ছোটখাটো দোকান গড়ে তুলছে…অ্যানি এম্প্যারিয়ম।'

আনোয়ার অ্যানির সম্পর্কে অন্য কিছু শুনবে বলে আশা করেছিলো। কিন্তু সুলতানা যা বললো, তা সে শুনতে চায়নি। এর চাইতে বরং কিছু না জানাও ছিলো ভালো। কারণ তা হলে গুজবের সত্যতা সম্পর্কে সে সর্বদা মনে মনে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো।

সুলতানা হাসলো, 'এবারে প্রতিবাদী পক্ষের বিশ্রাম। আমি যেতে পারি?'

আনোয়ার নিশ্চুপ হয়ে রইলো। তারপর প্রশ্ন করলো, 'আমাদের আলাদা থাকার ব্যাপারটা ও অন্যদের কিভাবে বোঝায়?'

'হে ঈশ্বর!' সুলতানা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়, 'সে কথা ওকে জিগেস করবে কে? ও সবাইকে একটা ঠাণ্ডা কথায় থামিয়ে দেয়, 'আমি কারুর কাছে কোনো কৈফিয়তের ধার ধারি না'।'

জবাবটা শুনে আনোয়ার গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়। 'ও যদি তোমাকে নিজের ব্যাপারটা না বলে থাকে, তা হলে তুমি তা জানলে কি করে?'

'সে কথা তোমার চাকর-বাকরদের জিগেস করো। জিগেস করো, কেন তারা এই সমস্ত জিনিস নিয়ে বাইরে আলাপ-আলোচনা করে। অ্যানি সম্ভবত নিজের ব্যাপারটা

কিছুই জানে না। অন্তত আমি ওকে এ ব্যাপারে কিছু বলি নি, এটা ঠিক। আজকাল ও শুধু কথা বলাই বন্ধ করেনি, কথা শোনাও বন্ধ করে দিয়েছে।

সেদিন রাতে লিজ যখন আনোয়ারের বাড়িতে এলো, তখন ওর গায়ে ছিলো সুন্দর একটা ছাপানো ব্লাউজ। ব্লাউজটায় হরেক রকমের রঙ, যা ওর নীল চোখ দুটির ঠিক বিপরীত। আনোয়ার ওর দুচোখের নীলে সাঁতার কাটতে চায়নি, চেয়েছিলো নিজেকে ডুবিয়ে দিতে। তার ইচ্ছে ছিলো, লিজকে নিয়ে সে ডুবে থাকবে।

লিজ ওর ব্লাউজটা খুলে পাশের টেবিলে রাখতেই আনোয়ারের দৃষ্টি ব্লাউজের কলারে লাগানো লেবেলটাতে গিয়ে পড়লো : অ্যানি এম্প্যারিয়ম। নিজের আলিঙ্গনে ধরে রাখা শরীরটাকে সে প্রায় ফেলেই দিলো। খাটের ধারে আঘাত খেয়ে লিজের হাঁটুতে চোট লাগলো। হাঁটুতে হাত ঘষতে ঘষতে আনোয়ারের দিকে তাকালো লিজ, চেষ্টা করলো উঠে দাঁড়াতে। আনোয়ার তখনও ওর দিকে তাকায়নি, তাকিয়েছিলো ব্লাউজটার দিকে। লিজ শপথ করে জানালো, ব্লাউজটা ও অন্য কোনো পুরুষমানুষের কাছ থেকে উপহার পায়নি—ওর ভাই ওকে ব্লাউজটা দিয়েছে। কোনো এক প্রদর্শনী থেকে ব্লাউজটা কিনেছিলো সে। কিন্তু আনোয়ার ওর কোনো কথাই শোনেনি, সে শুধু তাকিয়েছিলো লেবেলে লেখা নামটার দিকে। নামটা ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছিলো। বড়ো হতে হতে সেটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত ব্লাউজটাতে, তারপর টেবিলের ওপরে, তারপর ভাসিয়ে দিলো খাট আর দেয়াল-গুলোকে।

'আমার শরীরটা ভাল নেই,' আচমকা লিজকে বললো আনোয়ার। হাত নেড়ে ওকে চলে যেতে বললো সে।

ব্লাউজটা গায়ে পরে, চলে গেলো লিজ। চলে গেলো লিজ আর ওর ব্লাউজ—দুজনেই। কিন্তু আনোয়ারের মনে হলো, অ্যানির নামটা ব্লাউজের লেবেল থেকে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছে তার সমস্ত ঘরে…

দু-একটা দিন…না, চার দিন কেটে গেলো। অফিসে না গিয়ে বাড়িতেই বসে রইলো আনোয়ার। খবরটা শুনে সুলতানা দেখা করতে এলো তার সঙ্গে। অ্যানি এখানে থেকে তার সেবা-সুশ্রুষা করলে তার যে অনেকটা ভালো লাগতো—তা সুলতানকে বলার কথা মনেও হলো না আনোয়ারের।

মাত্র তিন দিনের মধ্যে একটা লোক কি করে এতোটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে, দেখে অবাক হলো সুলতানা। আহত ভঙ্গিমায় আনোয়ার ওকে ফের বললো, 'কি হয়েছে না হয়েছে তা তুমি খর্বদার ওকে বলবে না। শুধু এই কারণের জন্যে ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে কি লাভ ?'

সুলতানা চলে গেলো। কিন্তু আনোয়ারের মনে হলো, ওর এভাবে আসার জন্যে তার

ভেতরকার কিছু দুর্বলতা নিজের কাছেই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। দুর্বলতাগুলো দগদগ করছে কাটা-ঘায়ের মতো।…আনোয়ার আর সহ্য করতে পারলো না। চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করলো সে।…সেদিন ঘুমের মধ্যে সে আশ্রয় খুঁজে পেলো, আর দেখা পেলো এক স্বপ্নের—সেই স্বপ্নে অ্যানি বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ওষুধ দিচ্ছিলো তাকে।

স্বপ্ন দীর্ঘায়িত হয়ে ওঠে। ঘুমিয়ে আছে কি না বোঝার জন্যে চোখের পাতা দুটো বারবার খোলার আর বন্ধ করার চেষ্টা করে আনোয়ার। কিন্তু ঘুম তাকে অধিকার করে নেয়, স্বপ্নটা যের জ্বালাতে থাকে তাকে। স্বপ্নের মধ্যে আনোয়ারের রাগ হয় না। কিন্তু শেষ অব্দি যখন সে বুঝতে পারে যে সে সম্পূর্ণ জেগে আছে, অ্যানি দাঁড়িয়ে আছে তার বিছানার কাছে—তখন রেগে ওঠে আনোয়ার। অ্যানির উপস্থিতির জন্যে তার রাগ হয়নি। কিন্তু তার রাগের কারণ, সুলতানাকে সে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলো, ও যেন তার অসুস্থতার কথা অ্যানিকে না জানায়।

'তোমার আসার কারণ যদি আমার…' পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাঁটুতে হাত রেখে উঠে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টার মতো অসহায়তা কণ্ঠে নিয়ে বলতে শুরু করে আনোয়ার।

'আনোয়ার, আমার এখানে আসার মধ্যে যদি কোনো অন্যায় না থাকে, তাহলে তোমার দিক থেকে আমাকে ডাক পাঠানোর মধ্যেই বা অন্যায় কোথায় ?'

'আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে, অ্যানি।'

'সেটা কি ?'

'তোমার অহংকার—কারণ তুমি কোনোদিনও আমার সঙ্গে প্রতারণা করো নি…'

'প্রেম বা আনুগত্য এতো ভঙ্গুর নয় যে অন্য কারুর দেহের স্পর্শে তা নষ্ট হয়ে যাবে। চরম দুর্দশা পেরিয়ে এলে পুরুষ-মানুষের মন যেমন আরও শক্ত হয়, অন্য কারুর শরীরে আশ্রয় নিতে গেলে প্রেম বা আনুগত্যও হয়তো তেমনি করে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই নিয়ে আর কোনো কথা নয়, আনোয়ার—তোমার শরীরটা সুস্থ নয়।'

'হয়তো তোমার সঙ্গে কথাটা আলোচনা করে নিলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো…তুমি বলো…যা-ই ঘটে থাকুক না কেন…তুমি কি বলতে চাইছো যে সে জন্যে তুমি কিছু মনে করো নি ?…'

'না, আমি কিছুই মনে করি নি।'

'হয়তো তুমি করুণার বশে এ কথা বলছো।'

'তোমাকে করুণা করার কোনো অধিকার আমার নেই। আমিও কাউকে আমার প্রতি করুণা দেখাবার কোনো সুযোগ দিই নি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ভবিষ্যতেও তা দেবো না।'

'কিন্তু অ্যানি তুমি বুঝতে পারছো না—তুমি একটা উঁচু বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছো বলেই এ কথা বলছো।'

'কিসের বেদী ?'

'এমন একটা উঁচু বেদী যাতে কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না—আমিও না।'

'আনোয়ার!'

'আমাদের মধ্যে কিছুই মিটে যাবার নয়, অ্যানি।'

'তোমার যদি ভালো বলে মনে হয়, তাহলে তুমি যেখানে আছো বলে মনে করছো, আমি সেখানেই নেমে আসতে পারি।

'তার অর্থ?'

'আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবো। তাতে আমি কিছু মনে করবো না। তাহলে তুমি যে স্তরে রয়েছো বলে মনে করছো, আমিও হয়তো সেখানে গিয়ে পৌঁছবো।'

'অ্যানি!'

আনোয়ার বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে অ্যানির দিকে তাকালো। সুলতানার একটা কথা মনে পড়লো তার…ওকে বোঝানো যায় না, ওকে বুঝতে হয়। ওকে বোঝার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আনোয়ারের কাছে ও যেন দুর্বোধ্যই রয়ে গেছে। অন্য কারুর সঙ্গে ওর প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও, ওর গুরুত্ব কমে যাবার নয়।

'অ্যানি,' ফের ডাকলো আনোয়ার। 'তুমি কেন আমার কাছে ফিরে এলে?'

'আমি স্ত্রী হিসেবে ফিরে আসি নি…এসেছি স্রেফ একটা মানুষ হিসেবে।'

'তার অর্থ তুমি…তুমি আমার সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে থাকতে পারো না?'

'আমি একটা ভগ্ন-নারী হিসেবে তোমার সঙ্গে থাকতে পারি না, এটা ঠিক। তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী বা তোমার যা-ইচ্ছে হয় তা-ই বলতে পারো। কিন্তু এ সম্পর্কে আমার ধারণা এদেশে 'স্ত্রী' বলতে সাধারণ অর্থে একটা ভগ্ন-নারীকেই বোঝায়।'

'কবে থেকে তোমার এমন ধারণা হয়েছে?'

'যেদিন রাতে আমি তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, সেদিন থেকে। আমাকে দেখে তুমি ভীষণ বিচলিত হয়ে উঠেছিলে, আমার মুখের ওপরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে। আর আমি ওই ভাবে একা একা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। তখনই কথাটা আমার মনে হয়েছিলো, কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি…বুঝতে আমার দশটা বছর সময় লেগেছে।'

'তুমি বদলে গেছো! সেই আগেকার অ্যানি…'

'আমি তাকে ঘৃণা করি।'

'কিন্তু আমি তাকেই ভালোবেসেছিলাম।'

'তুমি কোনোদিনও তাকে ভালোবাসো নি, আনোয়ার। তুমি তাকে শুধু পছন্দ করতে, তাকে তোমার ভালো লাগতো।'

'বেশ, তবে তাই! তাকে আমার ভালো লাগতো।'

'কিন্তু সে সত্যিকারের অ্যানি নয়, আনোয়ার। সে শুধু একটা ভাঙাচোরা অ্যানি।'

'আমি সেই ভাঙাচোরা অ্যানিকেই ফিরে পেতে চাই।'

কথাগুলো ঠোঁট থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই আনোয়ারের মনে হলো, ওটা তার বলা উচিত হয়নি। অ্যানির ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, 'আমি দুঃখিত, আনোয়ার। কিন্তু তুমি আর কোনোদিনও তাকে খুঁজে পাবে না।'

আনোয়ারের মনে হলো, অ্যানির হাত থেকে সে ওষুধ—এমন কি চা-টুকুও গ্রহণ করতে পারবে না।

'আমি কি চলে যাবো ?' অ্যানি জিগেস করে।

'হ্যাঁ·· আমারও সেটাই মনে হচ্ছে'··· জবাব দেয় আনোয়ার।

অ্যানি ওর মুখটা এক পাশে ঘুরিয়ে নেয়। একটা স্বপ্নের মতো ও এসেছিলো···চলে যায় পরম সত্যের মতো।

দিন যায়। অনেক মেয়েই হার মানতো, কিন্তু অ্যানি তবু হার মানে না। এক ধরনের উন্মাদনা পেয়ে বসে আনোয়ারকে। অর্থ দিয়ে, প্রতিষ্ঠা দিয়ে, এমন কি শক্তি দিয়েও, সে সব কিছুকে ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে চায়।

বছরের পর বছর কাটে। নুড়ি আর ভাঙা পাথর জমে ওঠে আনোয়ারের চতুর্দিকে। তবু তার অসহায়তা যেমনটি ছিলো, ঠিক তেমনিই থেকে যায়। অটুট অভঙ্গ অ্যানি তার কাছ থেকে মুক্তি পায় না। তবু এভাবে ওকে মেনে নিতেও পারে না আনোয়ার।

অ্যানি যদি হার মানতো তাহলে ওই নুড়ি পাথরগুলোর স্তূপের নিচে ও বাঁধা হয়ে থাকতো। যতোই দিন যায়, আনোয়ার ততোই ওই স্তূপগুলোর আকার বাড়িয়ে চলে আর ভাবে, অ্যানি এখনও তার নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। প্রতিটি দিন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে আনোয়ার শীর্ণ হয়ে ওঠে, সমস্ত কিছু ভেঙে ফেলার ব্যাপারে তার উৎসাহটা থিতিয়ে আসে ক্রমশ।

তারপর অ্যানি নিজেই নিজের কবর খোঁড়ে···অন্তত আনোয়ারের দিক থেকে ঘটনাটা তা-ই। চিরদিনের মতো সমাধীস্থ হয় অ্যানি। চিরকালের মতো দেশ ছেড়ে চলে যায় ও—প্রথমে লণ্ডনে ভাইয়ের কাছে, তারপর অন্য কোথাও···হয় একা আর নয়তো অন্য কারুর সঙ্গে।

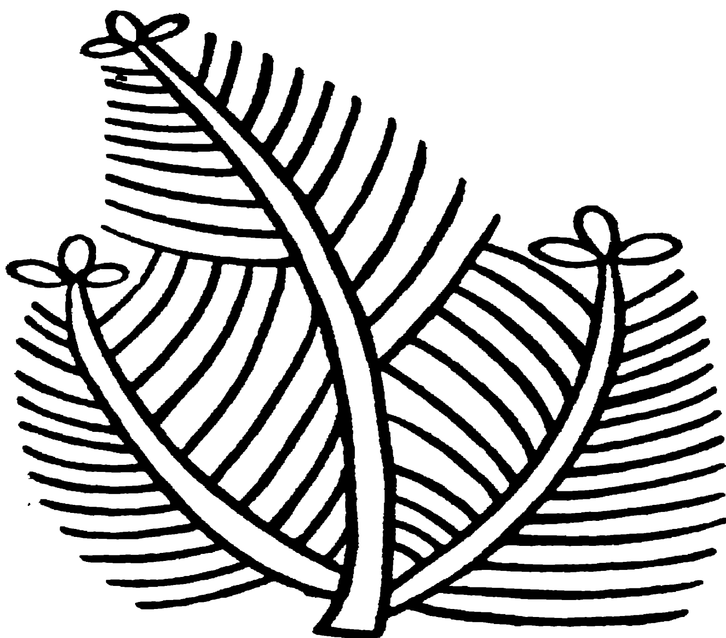
আনোয়ারের ছেলে, সালাম, সমস্ত কিছুই জানে। এখন সে একজন তরুণ যুবক। প্রতি বছর দুমাসের জন্যে সে বাইরে যেতো—কোথায়, তা আমি জানি নে। আনোয়ার ভাবতো, হয়তো সে অ্যানির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—কিন্তু কোনোদিনই কিছু জিগেস করতো না। একদিন জানার চেষ্টা করেছিলো আনোয়ার, কিন্তু ছেলেটা তাকে কিছু বলতে চায় নি। শুধু বলেছিলো, 'বাপি, উনি যেমন, আমি ওকে তেমনি বলেই ভালোবাসি।'

ও যেমন। ছেলের ওপরে ভীষণ রাগ হয় আনোয়ারের। না, রাগ নয়—স্রেফ হিংসে। শুধু ছেলের ওপরে নয়—যারা অ্যানিকে ভালোবাসতে পারে, যারা ওকে মেনে নিতে আর

মানিয়ে নিতে পারে—তাদের সকলের ওপরে।

ও যেমন।·· মাঝে মাঝে আনোয়ারের মনে হয় সে অন্য কারুর মতো হতে পারলে, তার ছেলের মতোই হতো। কিন্তু এখন আর অন্য কেউ হবার মতো সময় নেই। চোখের সামনে নিজের সমাধি-ফলকটা দেখতে পায় সে···সেটা শুধুমাত্র ধুলোমাটির ফলক নয়।

সুরটা শুনলেন? কেন শুনলেন? আজকাল শুনে আর কারুর কোনো লাভ হয় না। আমি কি করে এই কাহিনীটা শুনলাম? এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি। আপনি মশাই নেহাতই সাদাসিধে, তাই জানতে চাইছেন আমি কি করে আনোয়ারের মনের খবর জানতে পারলাম। দেখুন, প্রতিটা মানুষের মধ্যেই কি অন্য একটা মানুষ থাকে না—যে মানুষটা কোনো কাহিনীর চরিত্র নয়, কিন্তু প্রতিটা ঘটনারই দর্শক মাত্র? একটা আনোয়ার এই কাহিনীর চরিত্র—যে এই সুরটা গেয়েছে, যে এই সুরটাকে নীরব করে দিয়েছে। আর অন্য আনোয়ার·· সে শুধু একটা আকাশ-তার।



কবিতাগুচ্ছ

অনুবাদ / অসিত সরকার

চিঠি

সারাটা রাত তোমারই কথা ভেবে ভেবে
আর আকাশকুসুম রচনা করে
এই সবে আমি উঠলাম জেগে।

রাত্রি আমায় জানালো অজস্র আশীর্বাদ
আমারই মাঝে পরিপূর্ণ করলো
তোমার আপন প্রতিশ্রুতি।

একঝাঁক পাখির মতো স্বপ্ন গেলো ভেঙে
আর আমার পিয়াসী ঠোঁট
পান করলো তোমার মুগ্ধ প্রাণের সৌরভ।

আলোহীন উত্তুঙ্গ প্রাচীর
আর আমাকে কিছু না জানিয়ে
আমারই অলক্ষ্যে রাত্রির সাথে স্বপ্নের খেলা।

আমার প্রতিটা গান তোমায় লেখা এক একটা চিঠি
অথচ আশ্চর্য
যার একটা কলিও পৌঁছোয় না তোমার কাছে।

রচনা করলাম আমার গান

ভালোবাসা আমার পরেছে স্বপ্নের অবগুণ্ঠন।
সাত আকাশ ছিঁড়ে সে খুঁজছে তোমার স্মৃতিমুখ।
যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক না কেন প্রতিবন্ধকতা, প্রাচীর কিংবা দূরত্ব—
কেউ যেন না বলে
এ জীবনে বাঁচার কোনো অধিকার নেই।

এই আমি রচনা করলাম আমার গান।

সারাটা জীবন উদ্বিগ্ন-ব্যাকুল কামনায়
সুপ্ত ছিলো আমার দুঃখের রহস্য।
হয়তো একদিন ডাক দেবো,
সে ডাক আমার প্রতিধ্বনিত হবে হাজারো মানুষের ডাকে।
থাক তাদের দুঃখ আমার আপন দুঃখের অন্তরালে।

যদিও ভালোবাসা আমার অপূর্ণ, তাই থাক,
তবু সে যেন বহন করতে পারে আমার হৃদয়ের বাণী।

আঃ, গান আমার, মিটিয়ে দাও ভালোবাসার দান
যেন তোমার প্রতিটা কলি সবার কাছে গান হয়ে ফেরে।

আহা, ভালোবাসার দীপ্ত শিখা আমার
প্রজ্বলিত করো নিকষ কালো রাত্রি,
আহা, রক্তের গান আমার, ভেঙে ফেলো যত নিষ্ঠুর অনুশাসন।

দেখো, কারো সম্মান যেন না বিকোয়,
না কারো ভালোবাসা।
কোনো যুদ্ধ যেন কোনোদিন বাঁধা না দেয় কৃষককে মাথা তুলতে
কোনো দস্যুর পায়ে যেন দলিত না হয় প্রস্ফুটিত যৌবন।
কোনো লেলিহান শিখা যেন না গ্রাস করে এ পৃথিবীর আকাশ।
কেউ যেন না ছড়ায় বিষ মুকুলিত ফসলের ক্ষেতে।
কেউ যেন না পুনরাবৃত্তি করে অতীত খুনের কাহিনী।
কোনো রূপ-লাবণ্য যেন না বিকোয় হাটের নীলামে।

আমার কলমের বর্শার সঙ্গে দুঃখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।
এই আমি রচনা করলাম আমার গান।
এর পর কেউ যেন আর রচনা না করে দুঃখের গান।

মানসসরোবর

হৃদয় আমার যেন কাণায় কাণায় ভরা হ্রদ,
আহা, তোমারই জন্যে ভাবনা আমার
জলের বুকে আলতো ভেসে চলে, যেন এক সারি রাজহাঁস।

যদিও আমার চারদিকে অজস্র পথ
তবু সব পথই নিশ্চিহ্ন
কোরকের আশ্চর্য উত্তাপে ঢাকা এক নিবিড় স্বপ্নে।
মৃদু হেসে আমার হৃদয়ে বসন্ত আসে
যেন শ্রান্ত মুসাফির হ্রদের জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে
চকিতে চলে যায় দূরে।

স্বর্ণধনু হতে ছোঁড়া বাতাসে বিদ্ধ সূর্যের প্রথম আলোকে
তণ্বী রাত্রি বাঁধে তার কালো বেণী ঃ
নিশান্তিকা যতই ছড়াক না কেন হেনার স্নিগ্ধ সৌরভ
নববধূ, লজ্জায় রক্তিম সে হবেই
বাসরসজ্জা যখন তার জীর্ণ মলিন।

অলক্ষ্যে প্রতারিত ভালোবাসা আমার চারদিকেই ছড়ায় মোহ
অথচ ক্লান্ত হাতে
বালির বুকে সদ্য প্রস্ফুটিত অলীক চাঁপার সংগ্রহে
আমি বিষণ্ণ ম্লান।

আমি শুনতে পাই না তোমার কণ্ঠস্বর
খুঁজে পাই না তোমার প্রিয়মুখের অস্পষ্টতমও কোনো চিহ্ন,
অথচ হৃদয় আমার যেন ভরা হ্রদ !
আহা দেখ দেখ, তোমারই জন্যে প্রতিটা ভাবনা আমার
যেন রাজহাঁস
দু ঠোঁটে তুলে নেয় আমার চোখ থেকে
অবিরাম টুপটাপ ঝরে পড়া অশ্রুর মুক্তোবিন্দু।

প্রত্যাশা নিজেই এক গভীর ক্ষতচিহ্ন
যা অলক্ষ্যে কেবলই বিন্দু বিন্দু ঝরিয়ে চলে রক্তপাত।

বিচ্ছেদে বন্ধুত্বে

আমাদের চোখের জলের ঝরনাধারায়
প্লাবিত এই কঠিন উপত্যকা
যে উপত্যকায় কোনোকিছুই জন্মায় না।

সব প্রেমিক-প্রেমিকারাই আজ অভিশপ্ত
কোনো সৌন্দর্যই বিজয়ী নয়
প্রতীক্ষা-উন্মুখ, নির্নিমেষ চোখে
নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকা সব রাত্রিই নীরব সাক্ষী।

যদিও এ নাটকের কুশিলবরা পালটে গেছে,
তবু ওরা মঞ্চস্থ করে চলেছে একই নাটক
অতীতের সেই একই বিয়োগান্ত কাহিনী।

এ সবই আমার জানা, তবু আমি চাই
তোমার ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হোক আজীবন
ফিরে পাক কিছু প্রীতি
তোমার কণ্ঠস্বর যেন না হারায় নিঃশব্দে।

আমরা কোনোদিনই ছিলাম না বিচ্ছেদে, না বন্ধুত্বে
আমরা দুজনে ছিলাম এক সাথে
সুসংবদ্ধ অশ্রুর নিবিড় আলিঙ্গনে।

শপথ

যন্ত্রণার রেখায় খোদাই করা আমার করতলে
সযত্নে লালিত একটা শপথ ঃ
প্রত্যয়ের রেখা ছাড়িয়ে যায় সময়ের সীমারেখা।

তুমি দেখো কত দীর্ঘ আমার ভালোবাসার আয়ুষ্কাল
তাকে শিখিও না বাধা বুলি
কেননা কে শিখেছে কেমন করে শুনতে হয় তার কথা ?
ভালোবাসা শব্দের প্রাচুর্যে সুখী।

দেহোৎসারিত আমার এই যে স্পন্দন
তা যেকোনো মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে,
অথচ সময়ের বুক থেকে কোনোদিনই মুছে ফেলা যাবে না
আমাদের ভালোবাসার সাক্ষর।

হির যেমন নয় লয়লার প্রতিচ্ছবি,
তেমনি মজনুও নয় রনঝার হুবহু প্রতীক।
ভালোবাসা পুনরাবৃত্তি করে না তার অতীত কাহিনী
প্রতিটা অধ্যায়ই তার অনন্য, আশ্চর্য নতুন।

যন্ত্রণার তীরে বিদ্ধ আমার করতল, আমার নখাগ্র ঃ
অথচ কখনো বিদীর্ণ আঙ্গুলেও
জেগে ওঠে জীবনের আশা।

ভোরের আরক্ত আলায় এ আমার অঙ্গীকার—
চিনারের ঊর্মিমালাই আমার জীবনের চরম পরিসমাপ্তি নয়

যন্ত্রণার রেখায় খোদাই করা আমার করতলে
সযত্নে লালিত একটা শপথ ঃ
প্রত্যয়ের রেখা ছাড়িয়ে যায় সময়ের সীমারেখা।

পথ

কি দুর্লভ মন্ত্রমুগ্ধকর এই পথগুলো
এড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য এদের আকর্ষণ
আহা, কি অন্তহীনই না এদের জাদু !

আমি জানি না এরা কোথা এসেছে
কোথায়ই বা গেছে ।
পায়ের নিচে এরা পড়ে রয়েছে অন্তহীন জাদুর রেখার মতো,
পায়ের পাতায় প্রতিটা বাঁকের ক্ষতচিহ্ন আঁকা
পাছে পাকদণ্ডীতে এরা নিঃশব্দে হারিয়ে না যায় ।
আহা, কি দুর্লভ মন্ত্রমুগ্ধকরই না এই পথগুলো !

হৃদয়ের চাইতে ভঙ্গুর, জীবনের চাইতে দীর্ঘ
কাঁটায় আকীর্ণ এইসব পথ ।
তবু ক্লান্ত পায়ের গভীর ক্ষতচিহ্নগুলো প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপ্ত
কে আর কবে ভেবেছে রক্তাক্ত পায়ের কথা
একবার যে নেমেছে পথে ?
আহা, কি দুর্লভ মন্ত্রমুগ্ধকরই না এই পথগুলো !

জানি না ওরা কত দূরে গেছে
কোথায় গিয়েই বা বাঁক নিয়েছে,
আমার পা যেন এইসব পথেরই একটা কেউ
চিরটা কাল আত্মীয়তার নিবিড় সূত্রে বাঁধা ।
আহা, কি দুর্লভ মন্ত্রমুগ্ধকরই না এই পথগুলো !

বেলা শেষের সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে
তবু যাত্রা আমার এখনও হয়নি শেষ ।
প্রলুব্ধ পা আমার আকণ্ঠ মজেছে পথের জাদুতে,
যেন পথেরই বেদিতে আমি উৎসর্গ করেছি নিজেকে ।
আহা, কি দুর্লভ মন্ত্রমুগ্ধকরই না এই পথগুলো !

ওয়ারিশ শা

আমি চাই, কবরের অতল থেকে তুমি কথা বলো, ওয়ারিশ শা,*
এবং আজ তোমার প্রেমগাথায় সংযোজিত হোক
আর একটি নতুন পাতা।
একদিন পাঞ্জাবের কোনো মেয়ের কান্নায়
তোমার কলম ঝরিয়ে ছিলো হাজারো মেয়ের ক্রন্দন.
আজ হাজারো মেয়ে কাঁদে
তোমারই দিকে ওরা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে, ওয়ারিশ শা।
জাগো. নির্যাতীতের সঙ্গে যন্ত্রণাবিদ্ধ তুমিও তাকিয়ে থাকো পাঞ্জাবের দিকে
মাঠে মাঠে আজ শবের পাহাড়, চিনাবে রক্তস্রোত.
পাঁচ নদীর ঊর্মিমালা বিষাক্ত. পঙ্কিল তার জলস্রোত.
অরণ্যের মধ্যে দিয়েও যে বাতাস বয় তা বিশুদ্ধ নয়
শাখায় শাখায় গান হয়ে ফেরে না কোথাও।
নাগিনীর ফণায় ফণায় স্তব্ধ মানুষের কণ্ঠস্বর.
বিষে নীল পাঞ্জাবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
মাকুর শব্দে নামে না মেয়েদের গলায় গানের ঝরনা।
বিশাল মহীরুহ থেকে শাখারা লুণ্ঠিত.
নোঙর থেকে খুলে দেওয়া নৌকাগুলো পশুর মতো ভারাক্রান্ত।
ভালোবাসা আর সৌন্দর্য ছিনিয়ে নেওয়া
প্রতিটা মানুষই এখন যেন সেই কেদু।**
আজ আর কোথায় খুঁজবো ওয়ারিশ শার মতো অন্য কাউকে ?
কেবল তুমিই কবরের অতল থেকে কথা বলতে পারো. ওয়ারিশ শা,
এবং আজ তোমার প্রেমগাথায় সংযোজিত হোক
আর একটি নতুন পাতা।

* 'হির-রনঝা'-র অমর স্রষ্টা ওয়ারিশ শা পাঞ্জাবের জাতীয় কবি, যিনি পাঞ্জাবের শিখ' ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আশ্চর্য জনপ্রিয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় অমৃতা প্রীতম এই কবিতাটি রচনা করেন।

** কেদু হিরের কাকা, যিনি প্রেমিক রনঝার সঙ্গে তাকে মিলিত হতে দিতেন না।

ক্ষতচিহ্ন

১৯৪৭ সালে, ভারত ও পাকিস্থান স্বাধীনতার প্রাককালে, ধর্ষিতা কোনো নারীর শিশুর উক্তি।

মানব-সমাজের আমিও একজন—
আমার মায়ের বুকে
যুগসন্ধিক্ষণের সংঘর্ষ হেনেছে যে চরম আঘাত
আমি তারই ক্ষতচিহ্ন,
সেই দুর্ঘটনার জ্বলন্ত প্রতীক।

আমি অভিশাপ
যা আজ প্রতিটা মানুষের বুকে।
আমার জন্ম সেই অশুভ মুহূর্তে
যখন নক্ষত্রেরা খসে খসে পড়ছিলো
সূর্যটা নিভে আসছিলো
আর চাঁদটা ঢাকা ছিলো গাঢ় অন্ধকারে।

আমি সেই গভীর ক্ষতচিহ্ন
যার চরম অপমান
অমানুষিকতার বোঝা
অনিচ্ছায় আমার মাকে বইতে হয়েছে মাসের পর মাস,
পূতিগন্ধে ভরে উঠেছে তাঁর সারা বুক।

কে আর বুঝবে তাঁর সেই দুঃসহ যন্ত্রণা
যখন নিজেরই সত্তায়
লালন করতে হয়েছে রক্ত-মাংসের নিষ্ঠুর বর্বরতা!
আমি সেই অশুভ মুহূর্তের শিশু—
স্বাধীনতার পুষ্পিত শাখাগুলো যখন মেলছিলো
তাদের দীপ্ত কোরক।

প্রতিশ্রুতির রাত

এ নিশান্তিকা আমার অনেক আশার নিশান্তিকা
এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।
আমি পৃথিবীর কণ্ঠস্বর
আমি এ পৃথিবীর সেই অতীত কাহিনী।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

প্রতিটা পাতার স্নিগ্ধ গন্ধে স্পন্দিত আমার নিঃশ্বাস
প্রতিটা শস্যকনায় উদ্ভাসিত আমার যৌবন।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

বহুদিন, হাজার বছর কেটেছে কালের জোয়াল টেনে
বহুদিন, হাজার বছর কেটেছে যুগের চাবুক খেয়ে,
আর নয় ভাইয়ের মুখে গ্রাস কেড়ে খাওয়া।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

চোখ থেকে ফেলেছি অনেক অশ্রুবিন্দু
ঠোঁট থেকে বিদায় জানিয়েছি যত করুণ আকুতি.
আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ. স্বাভাবিক।
এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

এখন হাসো আমার গ্রীষ্ম, আমার শীতের ফসল
এখন হাসো আমার অনবগুণ্ঠিত মুখ. আমার স্বর্ণাভ দিন
এখন হাসো গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাস. শীতের স্তব্ধ অরণ্য
হাসো হিমেল বৃষ্টির ঋতু।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

আমি নিজে হাতে লাঙল চষেছি, বীজ বুনেছি
আজ এ গম আমার, এ ধান আমার।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

এ পৃথিবী আজ যত মেহনতি মানুষের
আর মেহনতি মানুষও এ পৃথিবীর একান্ত আপন,
তন্বী তরুণীরা আজ রাঁধো, কানায় কানায় পূর্ণ করো পাত্র।
আজ এ রাত আমার অনেক প্রতিশ্রুতির রাত।

বাতাস

আমার হৃদয়ের প্রতিটা স্ফুলিঙ্গকনাকে প্রজ্বলিত করে
অলিতে গলিতে বয়ে গেলো যে বাতাস,
হয়তো সে ছুঁয়ে গেছে তোমার শহর।

আজ আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস যেন অশান্ত
প্রতিটা পথেই অতিক্রম করে গেছে ভালোবাসা,
হয়তো সে ছুঁয়ে গেছে তোমার পথ।

যদিও পরিত্যক্ত, নির্জন
তবু তা কানায় কানায় পরিপূর্ণ,
হয়তো সে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে গেছে তোমার দুয়ারে

আশা-নিরাশায় কেটেছে সারাটা জীবন
কিন্তু আজ বাতাস, আমারই মতো,
হয়তো ছুঁয়ে গেছে প্রেমের সেই প্রান্তসীমা।

আস্বাদন করেছে সে সময়ের প্রতিটা শিখা
এখন স্তিমিত নিথর,
হয়তো সে নির্জন নিভৃতে বসে কাঁদছে।

ভাংরা

তোমার জন্যে নিয়ে আসবো
সোনার মাকড়ি, প্রিয়তমা আমার,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

এখন তুমি আর আমি
আমরা দুজনে ক্ষেতের মালিক,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

জনার পেকেছে মাঠে
ভালো বীজ হবে,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

তাঁতে বোনা তোমার
সূক্ষ্ম রেশমী ওড়না,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

মাঠে মাঠে
পাকা ফসলের কানাকানি,
ওই শোনো ডুগ-ডুগরি বাজনা।

মিষ্টি গন্ধে
ভরে যাবে তোমার দুহাত,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

কাঁচা ছোলার হাত ছানি
ছুঁয়ে যাবে কাস্তের আগা,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

তোমার জন্যে একটা
প্রাসাদ তুলবো, প্রিয়তমা আমার,
ওই শোনো ডুগ-ডুগির বাজনা।

রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যায়

—পলিন লুমুম্বাকে

কার নিপুণ হাতের ছেনিতে
কুঁদে-তোলা নিটোল কৃষ্ণাঙ্গী মূর্তি
যার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ক্রোধের ফুটন্ত লাভা ?

নির্যাতনে শতছিন্ন যার আরক্ত কামিজ
ঘাগরায় শুকিয়ে-যাওয়া কালো রক্তের দাগ
নগ্ন বুক, রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে যায় সুদীর্ঘ পথ।

কালো স্তন থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে দুধ
আরক্ত চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ে অশ্রু
হায়, সে খোঁজে কালো আগুনের একটা মৃতদেহ।

সাদা কফন কি তার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখতে পারবে
গাঢ় রক্তের অগ্নিপিণ্ড ?

গুরু গুরু গর্জনে কাঁপে তাম্র-তপ্ত আকাশ
কৃষ্ণ অরণ্যের বুক
উন্মুক্ত হয়ে যায় পাথরের গুহামুখ—
ছায়াবৃতা মহাদেশের অতল থেকে উঠে আসে একটা প্রশ্ন
যেন ধরিত্রীর রক্ত-জিহ্বা লেহন করে চলেছে আকাশের বুক।

একটি ছিন্ন কবিতা

যন্ত্রণা
যাকে আমি
নিঃশব্দে পোড়া একটা সিগারেটেরই মতো
গ্রহণ করলাম আমার সত্তায়।
সিগারেট থেকে ঝেড়ে ফেলা ছাইয়ের মতো
ঝরিয়ে দিলাম
কয়েকটা গান।

স্মৃতিকথা

বহুকাল আগেই নির্বাসিত হয়েছে তোমার স্মৃতি,
এত বছর আগে
যে আমি আজ স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি না
সে মৃত না এখনও জীবিত

অথচ একবার
নিঃশব্দ স্মৃতির এক অন্ধকার রাতে,
এমন নৈঃশব্দ্য
যে গাছের শাখার বাতাসও সময়কে চমকে দিতে পারে,
হঠাৎ শুনতে পেলাম
আমার হৃদয়ের দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ।
চোরের মতো চুপি চুপি কেউ উঠেছে
আমার ঘরের আকাশ-জানলায়।
আমি দেওয়ালে শুনতে পাচ্ছি তার নখের আঁচড়।

তিনবার শুনলাম তার সাংকেতিক ধ্বনি।
ক্ষতবিক্ষত
আমি কেঁপে উঠলাম।
ক্লান্তিতে গুঙিয়ে উঠলো অন্ধকার।

শুনতে পেলাম একটা অস্ফুট কণ্ঠস্বর,
তারপরেই নিশ্চুপ।
আবার শোনা গেলো সেই আর্তনাদ
যেন কেউ কথা বলার চেষ্টা করছে।

অবশেষে,
স্পষ্ট শুনতে পেলাম সেই কণ্ঠস্বর ঃ
'হ্যাঁ, প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি পালিয়ে এসেছি।
অসম্ভব ক্লান্ত।

আমি জানি আজ তোমার হৃদয়ে রয়েছে অন্য কেউ,
কিন্তু তুমি কি অন্ধকার কোনো কোণে
আমাকে একটু জায়গা দিতে পারো
যাতে লুকতে পারি আমার মুখ ?'

না, হৃদয় আমার পূর্ণ নয়
এখনও শূন্য
এবং সম্পূর্ণই নিঃসঙ্গ।
কিন্তু তুমি যেহেতু পলাতক
তোমার জন্যে আমার এখানে কোথাও কোনো জায়গা হবে না।

এই শুনে কেঁপে উঠলো অন্ধকার
ফিরে গেলো কণ্ঠস্বর
কিন্তু চলে যাবার আগে
আর একবার সে ফিরে এলো
মৃদু স্পর্শ করলো আমার গহন সত্তা
যেমন কেউ স্পর্শ করে তার দেশের মাটি

আমার ঠিকানা

আজ আমি বাড়ির নম্বরটা ঘষে ঘষে তুলে ফেলেছি
পালটে ফেলেছি বাইরের রাস্তার নামটাও
মুছে ফেলেছি প্রতিটা পথের নিশানা।
তবু
তুমি যদি কখনও আমাকে খোঁজো
প্রতিটা দেশের প্রতিটা শহরে প্রতিটা রাস্তার
প্রতিটা বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ো –
যদি মুক্ত-হৃদয় কখনও কাউকে খুঁজে পাও
জেনো সেটাই আমার বাড়ি।

আমার বন্ধু, আমার অচেনা

হঠাৎ একদিন তুমি এলে,
স্তব্ধ বিস্ময়ে সময় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আমার ঘরে,
অস্ত যেতে গিয়ে সূর্যটা থমকে গেলো
ভুলেই গেলো তার ফেরার কথা,
মহাজাগতিক বিশ্ব জানাতে শুরু করলো নালিশ।

সেই মুহূর্তটার দিকে ফিরে তাকাতেই
সময় চমকে উঠলো,
লাফিয়ে পড়লো আমার ঘরের জানলা দিয়ে।
ওই ঘটনার কথাটা মনে পড়লে
আজও আমরা অবাক হয়ে যাই
হয়তো সময় এমন হঠকারিতা আর কখনও করবে না।

এখন সূর্যটা প্রতিদিনই ঠিক সময়ে অস্ত যায়
প্রতি রাত্রেই অন্ধকার প্রবেশ করে আমার হৃদয়ে।
কিন্তু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার সেই মুহূর্তটা ছিলো সত্যিই—
তা তুমি আর আমি স্বীকার করি বা নাই করি।
সেদিন সময় যখন লাফিয়ে পড়েছিলো।
আমার ঘরের জানালা দিয়ে
তার হাঁটুদুটো ছড়ে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো।
সেই রক্তের দাগ
আজও রয়েছে আমার জানলায়।

রাস্তার একটা কুকুরের মৃতদেহ

বহুকাল আগেই তুমি আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি
তার জন্যে আজ আর কোনো অনুতাপ নেই
কেবল একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না
আমরা যখন পরস্পরকে বিদায় জানাচ্ছিলাম
আমাদের বাড়িটার তখন বিক্রির তোড়জোড় চলছিলো—
রান্নাঘরের খালি বাসনকোসন সব ছড়ানো ছিলো উঠোনের চারপাশে
হয়তো ওরা তাকিয়ে ছিলো আমাদের দিকে
কিছু ওলটানো বাসন হয়তো লজ্জায় ঢেকে রেখেছিলো তাদের মুখ
বিশীর্ণ একটা লতা তখনও আঁকড়ে ছিলো দরজার কপাট
বুঝি আমাদের কিছু বলতে চাইছিলো
কিংবা জলাভাবের বিরুদ্ধে ছিলো তার তীব্র অনুযোগ
এসব কিছুও এখন আমার আর তেমন মনে নেই
কেবল একটা জিনিস আজও আমার স্মৃতিতে হানা দিয়ে ফেরে—
কি ভাবে যেন রাস্তার একটা কুকুর ঢুকে পড়েছিলো আমাদের খালি ঘরটাতে
আর ঘরটা বন্ধ ছিলো বাইরে থেকে
তারপর
দিন তিনেক বাদে
বাড়িটার বিক্রির ব্যবস্থা যখন পাকা হয়ে গেলো
আমরা টাকার সঙ্গে চাবিগুলোকে পালটাপালটি করে নিলাম
প্রতিটা ঘরের দরজা খুলে দেখালাম বাড়ির নতুন মালিককে
একটা ঘরে দেখলাম পড়ে রয়েছে কুকুরের মৃতদেহটা
অথচ আশ্চর্য আমি কোনোদিন তার ডাক শুনিনি
কেবল বিশ্রী দুর্গন্ধেই তার অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম
যাকিছু স্পর্শ করি
আজও সেই বিশ্রী গন্ধটা আমার স্মৃতিতে হানা দিয়ে ফেরে